উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নববিধান-মণ্ডলী

শ্রীপদপঙ্কজেষু—

মহাবাক্য,

দীনেশ-চরিত আপনাদের পিতৃপুষ্পোদ্যানের একটী সুন্দর ফুল। মনের সাধে ফুলটী তুলিয়া আপনাদের হাতে দিলাম, গ্রহণ করুন, দেখিয়া জীবন সার্থক করি।

দীন দাস

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

সূচনা।

শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন আমার পার্থিব জীবনের সহায় ছিলেন, ইহা আমি বেশ বুঝিতাম। কিন্তু তাঁহার পবিত্র জীবন যে গূঢ়রূপে আমার অনন্ত উন্নতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগবন্ধনে চির দিনের তরে বাঁধা রহিয়াছে, ইহা পূর্ব্বে আমি টের পাই নাই। মহাযাত্রার সময় যে দিন "মাটির পুতুল" আমার "সোণার পুতুল" হইল, সেই দিন চক্ষু খুলিয়া গেল, দেখিলাম, এই সুন্দর পবিত্র জীবনের ঘটনারাজি এখন আমার যোগপথের সম্বল। তবে কিনা আমার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টিও নির্জীব নীচ জ্ঞান-দৃষ্টি বৈ আর কিছুই নহে—এ দৃষ্টিতে কত দিন আর সেই চরিত্রের সৌন্দর্য্য অব্যাহত থাকিবে? তাই ঘটনাগুলি লিখিয়া রাখিতে হইল। এতদ্ব্যতীত জীবনী লিখিবার গুরুতর একটী কারণ এই:—দীনেশ-চরিতে সমবিশ্বাসী নববিধানমণ্ডলী স্বর্গের শোভা দেখিবেন, তাহাতে আমার বিশ্বাস বাড়িবে, আমি ধন্য হইব।

কলিকাতা।
১লা জুন, ১৮৯৭।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

নির্ঘণ্ট।

স্বর্গারোহণ।

১। আবতরণিকেয়
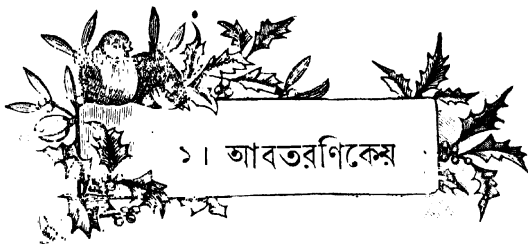
পরলোক।

স্বর্গারোহণসঙ্গে পরলোকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে পরলোক সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা উচিত। পরলোকের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলেই পরলোক কি, অগ্রে তাহা ঠিক করিতে হয়। মৃত্যুর পর মানবাত্মা যে অবস্থায় থাকে, তাহাকেই পরলোক বলে। পরলোকের অবস্থা জানিবার জন্য সকলেরই প্রবল ঔৎসুক্য রহিয়াছে; অথচ ভগবানের সুমঙ্গল ব্যবস্থানুসারে সেই

অজ্ঞাত, অপরিচিত দেশের সমাচার কেহই আনিয়া দিতে পারে না। কেন না সে দেশে যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। তাহাই যদি হইল, তবে আর পরলোক আছে বলিয়া কেন বলিব? সত্য বটে পরলোক দেখি নাই, পরলোকের সংবাদও জানি না; অথচ পরলোকে বিশ্বাস না করিয়াও থাকিতে পারি না। পরলোকে বিশ্বাস করা মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ। তবে বলিতে হইবে, ইহার মূলে সার বস্তু অবশ্যই কিছু আছে। আছে তা ঠিক, কিন্তু তাহা বুঝিতে হইলে একটুকু ভিতরে যাইতে হইবে। আমরা যে পরলোকে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না, তাহা অন্য ভাষায় বলিতে হইলে বলিব, ইহ-লোকের সঙ্গে পরলোকের ভাব অনুস্যূত। সুতরাং যে ইহলোকের সংবাদ আমরা জানি, অগ্রে তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে, পরলোকসমালোচনার পথ পরিষ্কার হইবে। অতএব ইহ-লোক কাহাকে বলে, এখন তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

ইহলোক।

জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত মানবের যে জীবন তাহাকেই ইহলোক বলা যায়। মানবের জীবন শারীরিক ও মানসিক কতকগুলি ক্রিয়ার সমষ্টি। আহার, পরিপোষণ, শ্বাসকার্য্য, স্রবণকার্য্য প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি শারীরিক; দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা সংবেদ (sensation), স্পন্দন, চিন্তা, ভাব এবং ইচ্ছা মানসিক ক্রিয়া।

শারীরিক ক্রিয়া।

শারীরিক ক্রিয়া দ্বারা বাহিরের কতকগুলি বস্তু শরীরের ভিতরে নীত হয় এবং শরীর হইতে আর কতকগুলি পদার্থ বাহিরে বিক্ষিপ্ত হয়। শরীরের মধ্যে এই অন্তর্গম (ingress) এবং বহির্গম (egress) কার্য্য অনবরত চলিতেছে। ভোজন কার্য্য দ্বারা ভোজ্য দ্রব্য দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুই, তিন কি চারি বার শরীরে প্রবিষ্ট হয়। শ্বাসকার্য্য দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ ভূবায়ু এক-মিনিটকালমধ্যে ষোড়শ হইতে বিংশতি বার দেহাভ্যন্তরে নীত হয়। এতদ্ব্যতীত ত্বক্‌পথেও কোন কোন সামগ্রী শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে মল, মূত্র, স্বেদ, প্রশ্বসিত বায়ু (expired air) ইত্যাদির আকারে আর কতকগুলি বস্তু শরীরের ভিতর হইতে বাহিরে অহরহ পরিত্যক্ত হইতেছে। যে সকল সামগ্রী অন্তর্গন্তৃ (ingesta) রূপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া দৈহিক সর্ব্ববিধ বিধান—যথা শোণিত, পেশী, অস্থি, স্নায়ু প্রভৃতি—বা ব্যূহতন্তুর (tissues) পরিপোষণ বা পরিপূরণ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। আবার বহির্গন্তৃ (egesta) রূপে যাহা দেহ হইতে পরিত্যক্ত হয়, সেগুলি আর কিছুই নয়,—ব্যবহৃত দৈহিক ব্যূহতন্তুর অপচিত (effete) ভগ্নাবশেষ ও স্বল্পাংশ অব্যবহৃত অন্নমাত্র। দৈহিক এই অন্তর্গম ও বহির্গম কার্য্যের রহস্যমধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, দেহ

একটা সুবৃহৎ পণ্যশালার ন্যায় দ্রব্য-বিনিময়ের কেন্দ্র বৈ আর কিছুই নহে। এই বিনিময়কার্য্য দ্বারা শরীরটা, অন্ততঃ শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি মুহুর্মুহুঃ একবার নূতন, একবার জীর্ণ বা জরাগ্রস্ত হইতেছে, অর্থাৎ জীবদ্দশায় মানব-দেহ অনুক্ষণ এক-দিক্ দিয়া জরাগ্রস্ত এবং ক্ষয় ও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে; আর এক দিক্ দিয়া বাহির হইতে উপযুক্ত সামগ্রী লাভ করিয়া ক্ষতিপূরণ এবং তন্তুবিন্যাসের পূর্ণত্বসংরক্ষণে সুসমর্থ হইতেছে। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে এরূপ বলিতে হয় যে, কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে শরীরের রচনাবলী (tissues) মধ্যে যে সকল উপাদান (elements) দৃষ্ট হয়, তাহার অব্যবহিত পরক্ষণে আর ঠিক সেইগুলি তথায় অবস্থিতি করে না। এই সকল শারীর বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্ব; অথচ এই প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনসম্বন্ধে আমাদের সামান্য অকৃষ্ট জ্ঞান কোন সংবাদই রাখে না। যাহা হউক জীবিত শরীরকেই যদি বাহ্যজগতের উপর এত দূর নির্ভর করিয়া তৎসঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-পাশে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তবে মৃতদেহের কথা আর কি বলিব? প্রাণ শেষ হইতে না হইতেই জড় রাজ্যের সৈন্য-সামন্ত-সকলকে—ভৌতিক শক্তিনিচয়কে আর নরদেহের আজ্ঞাবহ অনুচরগণের ন্যায় উহার পরিচর্য্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যস্ত দেখা যায় না। ফলে উহারা এখন প্রভু হইয়া দৈহিক নির্ম্মাণসমূহের অণুকে অণু হইতে বিচ্ছিন্ন করত অঙ্গার-

জন (carbonic acid), এমোনিয়া (ammonia) এবং কয়েক প্রকারের লবণে পরিণত করে। জন্মজন্মান্তরে আত্মার দেহভ্রমণ অপেক্ষা এই পদার্থগুলির পর্য্যটন-বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা বহুল পরিমাণে আয়াসসাধ্য। যাহা হউক, সময়ে মৃতদেহের অঙ্গারজন প্রভৃতি অন্ততঃ আংশিকরূপে উদ্ভিদের আকার ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার জীবনকার্য্যের রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিবেই করিবে। অনেক উদ্ভিদ পশুপক্ষীর ভক্ষ্য সামগ্রী; এবং উদ্ভিদ ও পশুপক্ষী এতদুভয়ই মানবের আহার্য্য। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এক সময় যাহা গর্ব্বিত মানবের মাস্তিষ্কেয় অণুরূপে কত উন্নত চিন্তা, কত উন্নত ভাবের ক্রীড়ার সহিত সংলিপ্ত থাকে, কালে তাহাই আবার তুচ্ছ শৃগাল কুক্কুরের পদধূলি কিংবা পদপেষিত তৃণ যবসাদিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে মৃত্তিকা, ধাতু, লতা, পশ্বাদিও নরশরীরের উচ্চতম বিধান-সংগঠনে ব্যবহৃত হয়।

মানসিক ক্রিয়া।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্ দ্বারা বাহ্যজগতের সহিত মনের সম্বন্ধ; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দর্শন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ, জিহ্বা দ্বারা রসন এবং ত্বক্ দ্বারা স্পর্শানুভব কার্য্য সম্পাদিত হয়। এ স্থলে জানা উচিত যে, মস্তিষ্ক মানসিক ক্রিয়ার রঙ্গভূমি, এবং উহা কতকগুলি মাস্তিষ্কেয় স্নায়ু দ্বারা প্রাগুক্ত পঞ্চ

প্রকারের বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত। আলোক, শব্দ প্রভৃতি কোন বাহ্য প্রভাব (stimulus) চক্ষুঃ শ্রোত্রাদিতে সংলগ্ন হইলে সেই সকল প্রভাব (stimulus) উহাদের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত সংক্রন্ত বিশেষ চৈতনিক (sensory) স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। এইরূপে বাহ্য প্রবর্ত্তন (stimulus) মস্তিষ্কে পৌঁছিলে, এক এক বহিরিন্দ্রিয়ের এক এক নির্দ্দিষ্ট মাস্তিষ্কেয় কেন্দ্রে দর্শনাদির সংবেদ (sensation) জন্মে। তৎপর প্রবর্ত্তন-গুলি প্রকৃত মস্তিষ্কে নীত হয় এবং তথায় উহা উচ্চতর মানসিক ক্রিয়া অর্থাৎ ভাব, চিন্তা এবং ইচ্ছা উৎপন্ন করে।

জড় ও আত্মার একত্ব।

সংবেদ (sensation), ভাব (emotion), চিন্তা (idea-tion), এবং ইচ্ছা (will) যে শারীরিক ক্রিয়ানিচয় হইতে এক বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপার, তাহা বলা বাহুল্য। বাস্তবিক শরীর জড় এবং মন আত্মিক বস্তু। সুতরাং জড় বস্তু এবং আত্মাতে যে পার্থক্য, শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়াগুলিতেও সেই পার্থক্য। এই পার্থক্য কি তাহা সকলেই জানেন। বাস্তবিক এ দুইয়ের পার্থক্য নয়, নৈকট্য বা একত্ব প্রদর্শন করাই লেখকের উদ্দেশ্য। জড় এবং আত্মার সম্বন্ধে অধ্যাপক টিণ্ডেল বলিয়াছেন যে, উহারা উভয়েই তুল্যরূপে গৌরব ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ। তিনি আরো বলেন যে, জড় ও আত্মাকে সেই একই প্রাচ্ছন্নের

(Mystery) দুই বিভিন্ন গুণযুক্ত প্রদেশমাত্র বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। বিশ্বপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে যুগপৎ তিনটী বিষয় উপলব্ধি হয়। (১) জড়; (২) আত্মা; এবং (৩) এক অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় প্রাচ্ছন্না (Mystery)। সামান্য জ্ঞানে জড় ও আত্মার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বটে; কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে এ দুইয়ের মধ্যে যে কি প্রভেদ রহিয়াছে তাহা অবধারণ করা অসাধ্য। জড়সম্বন্ধে আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি উহা সাকার বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—অর্থাৎ জড়বস্তু চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা কিংবা ত্বক্ দ্বারা অনুভূত হয়। কিন্তু প্রশ্ন এই, উপলব্ধির অর্থ কি? দর্শন, শ্রবণাদি তো মানসিক বা আত্মিক ব্যাপার বৈ আর কিছুই নহে। তবে কি মায়াবাদীর সঙ্গে এক হইয়া আমরা বলিব যে, জড় বা বাহ্যজগৎ আত্মারই ভাবমাত্র? ঠিক তাহা না হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, জড় এবং আত্মার মধ্যে একটা পারম্পর্য্য সম্বন্ধ বা আনু-ষূ্্যত্য (correlation) বিদ্যমান রহিয়াছে; অর্থাৎ একের ভাবের সঙ্গে অপরের ভাব এমনি অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে যে, একের চিন্তাতে আর একের চিন্তা মনোমধ্যে অবশ্য-স্তাবিরূপে উদিত হইবেই হইবে। যেমন একগাছি যষ্টির এক প্রান্তের সঙ্গে সঙ্গেই অপর প্রান্তের বিষয় ভাবিতে হয়। হ্রস্ব দীর্ঘ, অপূর্ণ পূর্ণ, লঘু গুরু ইত্যাদির ভাবও অনুষ্যূত ভাব।

লোক যখন আপনার বিষয় চিন্তা করে তখন আর শরীর ও মনকে পৃথক্ করিয়া ভাবে না—আমি, তুমি, তিনি এই সকল শব্দ শরীর মন উভয়কেই বুঝায়। বাহ্য জগৎসম্বন্ধেও কথা তদ্রূপই। জল, বায়ু, মৃত্তিকা, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, পশু, ইত্যাদি আপাত দৃষ্টিতে আমাদিগের হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, এগুলির সহিত আমাদের পারম্পর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। জল, বায়ু ইত্যাদি বলিতে সেই জল, বায়ু প্রভৃতিকেই বুঝায়, যাহা মানুষ জানিয়াছে কিংবা জানিতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষ বলিতে যে শরীরকেও বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; এবং শরীর যে বাহ্য জগতের সঙ্গে একত্বসম্বন্ধে আবদ্ধ, তাহা বাহ্যান্নগ্রহণ এবং ভূবায়ুনিশ্বসন কার্য্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। বাহ্য জগৎ বলিতে এস্থলে জড়কেই বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে; কারণ জড় ছাড়া বাহিরে জীবন, ও আত্মার কার্য্য যাহা পরিলক্ষিত হয়, তাহার সহিত মানবাত্মার আনুস্থ্যূত্য অনুভব করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

অনুস্যূততাসম্বন্ধে জড় ও আত্মার একত্ব স্থির হইল। এখন ভিন্ন ভিন্ন জড় এবং ভিন্ন ভিন্ন আত্মা যে ক্রমান্বয়ে পরস্পরের সঙ্গে এক, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলা বিধেয়।

জড় এক।

রাসায়নিক উপাদানের আকারেই হউক কিংবা ভৌতবৈজ্ঞানিক পরমাণুরূপেই হউক, জড়ানুভূতি আমাদের নিকট বাধা-

বোধ (feeling of resistance) ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই বাধাবোধ যে গত্যবরোধমাত্র তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং জড়ানুভূতি মূলতঃ শক্ত্যনুভূতির নামান্তর মাত্র, অর্থাৎ আমাদের যে জড়ের জ্ঞান তাহা শক্তিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু ভৌতবিজ্ঞানের এই একটী প্রমাণিত সত্য যে, শক্তির বিকাশ নানা আকারে হইলেও মূলে তাহা একই। সুতরাং আমরা জড়কেও এক বলিতেই বাধ্য।

আত্মা এক।

জড় এক বলিলেই আত্মা যে এক, তাহাও বলা হইল; এবং জড় যে এক তাহা যখন প্রমাণিত কথা, তখন আত্মার একত্বও প্রমাণিত বিষয়। কারণ জড় ও আত্মার পারম্পর্য্য বা আনুষঙ্গিত্যে যখন বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারা যায় না, তখন এক জড়, এক আত্মা এই কথাই ঠিক। যাহা হউক, আত্মার একত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রমাণ রহিয়াছে। বিচিত্র বিশ্বরাজ্যের যে দিকেই কেন দৃষ্টি করা যাউক না, চিন্তাশীল লোকমাত্রের নিকট একটী গূঢ় গভীর সত্য নিশ্চয়ই উপলব্ধ হইবে। লতাগুলির অবস্থা মনে হইলে উহাদিগকে নিতান্ত নিঃসহায়, নিরুপায় বলিয়াই মনে হয়; অথচ আশ্রয়তরুতে উহারা যে ভাবে জড়াইয়া থাকে, তাহা দেখিয়া কে না মনে করিবে যে উহাদের ভিতরে আমাদের বুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে? কারণ লতাগুলিকে বাঁচা-

ইয়া রাখিবার ভার যদি আমাদের উপর ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে এতদপেক্ষা আমরা আর কি বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে পারিতাম? মাকড়সা যে কৌশলে জাল বিস্তার করিয়া আহারের জন্য মশা মাছি ধরে, তাহা কি ঠিক আমাদের বুদ্ধি-নিষ্পন্ন কাজের ন্যায় নয়? সহজে বোধগম্য বলিয়া আমি এ স্থানে কেবল এই দুইটী উদাহরণমাত্র প্রদান করিলাম। কিন্তু অতি সামান্যমাত্র প্রচ্ছন্নতার আড়ালে কত কোটি কোটি ঘটনারাজি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে, যাহার ভিতরকার শিল্প-নৈপুণ্য এবং বুদ্ধি-কৌশল এতদপেক্ষা অনেক বিস্ময়কর। বাস্তবিকই ভগবানের বিশ্বরাজ্য অতি পরিষ্কার একখানি দর্পণের ন্যায়—ইহার মধ্যে আমরা আমাদিগকে দেখিতে পাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দর্পণের ভিতর সকলেই এক ছবি দেখিয়া থাকেন। যেখানে আমি সত্যের অনুসন্ধান পাই, সেখানে সকলেই সত্য দেখেন—সেখানে আমি জ্ঞান দেখি, সেখানে অন্যেও সেই জ্ঞান দেখেন—যেখানে আমি সৌন্দর্য্য দেখি, সেখানে অপরেরাও তাহাই দেখেন। প্রকৃতি আত্মারই প্রতিকৃতি, আত্মারই সুন্দর একখানি ফটোগ্রাফ। যদি তাহাই হইল, তবে আর আত্মায় আত্মায় পার্থক্য রহিল কোথায়? ফলে, জড়ের ন্যায় আত্মাও এক বস্তু—সকল মনুষ্য একই পদার্থ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

জড়ের একত্ব এবং মনুষ্যাত্মার একত্ব সপ্রমাণ হইল বটে, কিন্তু পরলোকের সঙ্গে এ কথার সম্বন্ধ কি? জীবিতাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের শরীর এক একটী স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক ঘটনা তাহা নয়—সত্য সত্যই সমস্ত লোকের দেহ এক। আত্মাও যে এক তাহা এই মাত্র বলা হইল। মৃত্যুর পর একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় বটে—কিন্তু শরীরও থাকে, আত্মাও থাকে। কিন্তু শরীর থাকিলই বা—উহা তো আর 'আমার' শরীর থাকে না। তা নয় কেমন করিয়া? এই কথাগুলি লিখিতে লিখিতে আমার শরীরটা কতবার খণ্ড খণ্ড হইয়া একবার বাহিরে যায়, আবার ভিতরে আইসে। 'আমার' শরীর বলিয়া যে আমি উহাকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিতে চাই, সে তো তাতে সম্মত হইতেছে না, সে তো প্রমুক্তভাবে বেড়াইতেছে। 'আমি' বলিয়া আমি আমাকে যে সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখি তাহা মোহ, তাহা ভ্রম। এই মোহ, এই ভ্রম দূর হইলেই শরীর মুক্ত—মৃতাবস্থায় যেমন মুক্ত, জীবিতাবস্থায় ঠিক সেইরূপ মুক্ত। আত্মার সম্বন্ধেও কথা ঠিক তদ্রূপ। 'আমি', 'তুমি', 'তিনি', এ সকল ভেদজ্ঞান সেই ভ্রম বা মোহেরই ছলনা। যাহার জন্য আমরা শরীরটাকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া ভাবিয়া থাকি। কিন্তু

স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে শরীরের ন্যায় আমাদের আত্মাও সঙ্কীর্ণ, বদ্ধ কোন বস্তু নয়—আকাশব্যাপী, এক, অখণ্ড, প্রমুক্ত পদার্থ। যদি তাহাই হইল, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ইহ পরকালের মধ্যে অত্যল্প মাত্রই প্রভেদ—ঠিক প্রভেদ নয়, মোহ আসিয়া একটা কল্পিত পার্থক্যবোধ জন্মাইয়া দেয়। ফলতঃ ইহপরকালের বাস্তবিক একতা বিজ্ঞানের প্রমাণিত কথা।

কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত হইলেও, ইহপরলোকের একত্বে বিশ্বাস করিবার জন্য আমরা হৃদয়ের সায় প্রাপ্ত হই না। এই আর একটী স্বতন্ত্র এবং গুরুতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসা বিধানালোচনা ব্যতীত কখনই হইতে পারে না। সুতরাং সংক্ষেপে বিধান-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

বিধান-প্রসঙ্গ।

গীতার মত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত হইয়াছে :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

অন্বার্থঃ—হে ভারত, যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি আমাকে প্রকাশ করি।৭ সাধুগণের সংরক্ষার জন্য, দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।৮

গীতাকারের মতে ধর্ম্মরাজ্যে একটা পার্য্যায়িকতা আছে—সময় সময় এমন এক একটা অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহার জন্য কালবিশেষে ধর্ম্ম সজীব, উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়া মানবসমাজকে স্বর্গের দিকে উত্তোলন করে। এই সত্য সনাতন ধর্ম্মের প্রভাবে পৃথিবী পুণ্যের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হয়, পাপ মোহ দূরে চলিয়া যায়। কিন্তু ক্ষণপ্রভার ন্যায় ধর্ম্মের প্রভা অচিরস্থায়ী। পুণ্যশান্তির অধিষ্ঠানে ধরাধাম আবার কিছু-কালের জন্য পবিত্র বেশ ধারণ করিয়া পাপান্ধকারে আস্তে আস্তে সমাচ্ছন্ন হয়। লোক কেবল কুচিন্তা, কুকামনা, কুকথা ও কুকর্ম্মে অনুরক্ত, বিশ্বাসপরিশূন্য, নিজ হিতচিন্তায় পরাঙ্মুখ এবং পরদ্বেষপরায়ণ হয়। এইরূপে সমাজ যখন পাপের স্রোতে ডুবিয়া যায়, স্বপ্রকাশ ভগবান্ পাপ এবং দুরাচার বিনাশের জন্য নর-লোকে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করেন। ধর্ম্ম এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে পাপপুণ্যের ভিতর দিয়া উন্নতি হইতে উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া থাকে।

ঐতিহাসিক প্রমাণ।

গীতাকারের এই মত ধর্ম্মজগতের ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয়। বৈদিক ঋষিদিগের উচ্চ এবং সুপবিত্র ধর্ম্ম সেই স্মৃতির অতীত কালীয় লোকসমাজের অভ্যোন্নতিসাধনে কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহা ঋগ্বেদে অবগত হওয়া যায়। ঋগ্বেদের এই উচ্চ ধর্ম্ম কতকাল লোকের পরিত্রাণ সাধন করিয়াছিল, ইতিহাস তাহা লিখিয়া যায় নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, সময়ে সেই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদি বাহ্য ক্রিয়াকলাপের আকার ধারণ করিয়া বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রকৃত ধর্ম্মের শাসন চলিয়া গেলে উপধর্ম্ম আর মানবের চিত্তকে প্রশমিত অবস্থায় রাখিতে পারে না। সুতরাং পাপচিন্তা অচিরে লোকের মনকে বিকারগ্রস্ত এবং কলুষিত করিয়া ফেলে। তাহাতেই সমাজের বন্ধন শিথিল এবং নানা প্রকারের অনিষ্ট উৎপাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া সেই পুরাকালীয় সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলে; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার আয়োজনও হইতে থাকে।

বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে না হইলেও তাহার কিছু কাল পরে যখন যাগ যজ্ঞাদি বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইতে লাগিল, তখন বেদের জ্ঞানকাণ্ডের দিকে ধার্ম্মিক লোকদিগের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। বাস্তবিক বৈদা-

ন্তিক ধর্ম্ম বহুদিন পর্য্যন্ত ভগবানের বিধানরূপে কার্য্য করিয়া অবশেষে তাহাও আবার শুষ্ক জ্ঞানের ধর্ম্ম হইয়া পড়িল। বেদান্ত দর্শনের মত উপনিষদের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম হইতেই সমুৎপন্ন। বেদের মন্ত্রভাগ বিকৃত হইয়া এক দিকে যেমন ক্রিয়াকলাপাদি ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর বাহুল্যরূপে অবলম্বিত হইল, তেমনই উপনিষদ্‌ভাগ বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক জটিলতায় পরিপূর্ণ বেদান্ত দর্শনে পরিণত হইল। ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান তখন অনিবার্য্য। পাপনিপীড়নে লোকসমাজ আবার যখন লণ্ড ভণ্ড হইয়া পড়িল, তখন ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবনকে লীলাক্ষেত্র করিয়া তদানীন্তন নব ধর্ম্মবিধান প্রকটন করিলেন। শাক্যসিংহের প্রতিভাসিত উচ্চ জীবনের দীপ্তি অনতিকালমধ্যে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইল। দলে দলে লোক সকল তাঁহার অনুগামী হইতে লাগিল। পুণ্যের সুগন্ধ বায়ুহিল্লোলে পাপীর পরিতপ্ত হৃদয় শীতল হইল। বিভু-গুণ-কীর্ত্তনের ধ্বনিতে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। দুঃখ তাপ নাশ হইল এবং লোকের মনে শান্তি আসিল। কিন্তু যে নির্ব্বাণের ধর্ম্ম লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী, অসংখ্য অসংখ্য লোককে নব জীবন প্রদান করিল, কালে তাহারও তেজোহ্রাস হইতে লাগিল—সময়ে তাহাও উপধর্ম্মে পরিণত হইয়া আবার ধর্ম্মের গ্লানি উৎপাদন করিল। এইরূপে যখন অধর্ম্মের স্রোত প্রবহমাণ হইল, তখন ভগবান্ পুনর্ব্বার নব ধর্ম্ম-

বিধানবিরচনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরাণ এবং তৎপর তন্ত্রের ধর্ম্ম যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়া ভারতের দুর্গতি দূর করিল এবং ভগবান্ তাঁহার কৃপার বিজয়-নিশান চিরদিনের জন্য পৃথিবীবক্ষে উড্ডীন করিলেন।

ভগবানের কৃপা কেবল যে ভারতবর্ষেই নিরুদ্ধ ছিল এমত নহে। এসিয়ার অন্যান্য দেশসমূহেও এই কৃপার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যে জোরোয়েষ্ট্রীয়, এবং চীনদেশে কন্‌ফিউ-শীয়েন্ ধর্ম্ম, আরব্যে ইস্লাম্, জেরুজালমে ইহুদীয় এবং খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম জগতে সুপ্রসিদ্ধ। মুসা, এব্রাহেম্, দাউদ্, সলমন্ নামক ধর্ম্মবীর-দিগের ধর্ম্ম একসময় ইহুদী জাতিকে স্বর্গীয় জীবন দান করিয়া, কালে তাহাও ফেরেসী এবং স্ক্রাইব্ আখ্য ধর্ম্মযাজকদিগের হাতে পড়িয়া মৃত ক্রিয়াকলাপ এবং অর্থহীন অথচ আড়ম্বরপূর্ণ বাহ্যানুষ্ঠানে পরিণত হইল। এরূপে সত্য ধর্ম্ম বিকৃত হইল বটে; কিন্তু ইহাতেই আবার খ্রীষ্টের পুত্রধর্ম্ম দ্বারা ধরা ধন্য হইবার সূত্রপাত হইল। ইহুদী সমাজ ধর্ম্ম-জগতের অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের প্রভাবে ধীরে ধীরে নির্জীব ভাব ধারণ করিল। ধর্ম্মের বেশ পরিধান করিয়া অধর্ম্ম পাপাচার শীঘ্রই ইহুদীদিগকে দুর্গতির পথে আনয়ন করিল। ব্যভিচার, ভ্রষ্টতা, কাপট্য, অন্তঃসারশূন্যতা ইত্যাদি-নিপীড়নে সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। এইরূপে ইহুদীজাতির মধ্যে যখন অধর্ম্ম পাপাচারের একাধিপত্য বিস্তৃত

হইল, তখন ধর্ম্মজগতীয় পারম্পরিকতার নিয়মানুসারে স্বর্গের সুসমাচার আসিয়া নিরাশ্বাস ইহুদী-সমাজে আশার উদ্রেক করিল। নেজারতের যোসেফ্ পত্নী রত্নগর্ভা মেরি একটী রত্ন জগৎকে প্রদান করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ যীশুর ত্রৈবার্ষিক ধর্ম্ম-জীবন ইহুদী সমাজকে কিরূপে অজেয় বল সহকারে আমূল বিকম্পিত করিয়াছিল,তাহা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পতনোন্মুখ, অসার, অপভ্রষ্ট ইহুদী-ধর্ম্মের ক্রিয়ামার্গী পুরোহিত-দলের প্রজ্বলিত ক্রোধানল ক্রুশে নিহত যীশুর পবিত্র শোণিতে নির্ব্বাপিত হইলে পর, প্রেমের বিজয়-নিশান আকাশে উড্ডীন হইল, পৃথিবী পাপভারবিমুক্ত হইল, সূক্ষ্মগতিতে ধর্ম্মের স্রোত মলিন মানবের অন্তরে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আরবা দেশের অবস্থা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়ে। কোরেশ জাতীয় লোকেরা পৌত্তলিকতার আবর্ত্তে পড়িয়া ভয়ানক পাপাচারে নিমগ্ন হয়। সে দেশের খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বীরাও পৌত্তলিকতার দূষিত বায়ুপ্রভাবে যারপর নাই মলিন জঘন্য হইয়া পড়িয়াছিল। সামাজিক অবস্থা সাতিশয় হীন ও কলঙ্কিত হইয়াছিল। সমাজ-সংস্কারের একান্ত প্রয়োজন। ভগবান্ তাঁহার অসীম দয়াগুণে স্বর্গীয় তেজের অবতার হজরত মোহম্মদকে রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান করিলেন। ভিতরে স্বর্গীয় বল, মুখে একমেবাদ্বিতীয়ম্ নামের সিংহনাদ, এ বলের কাছে

পাপের কি আর দাঁড়াইবার শক্তি আছে? পৃথিবী কাঁপিল, পৌত্তলিকতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া গেল, কিছুকালের জন্য ধরা শান্তি লাভ করিল। কিন্তু সে শান্তিও কেবল পরিমিত সময়ের জন্যই। ঐশ নিয়মের অব্যর্থ শাসনে আজ সেই বজ্রনির্ঘোষোপম একমেবাদ্বিতীয়ম্ নামের বিজয় শব্দও নিস্তব্ধ।

তান্ত্রিক ধর্ম্ম কুৎসিত আকার ধারণ করিয়া পাপের ভীষণ গর্জ্জনে যে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়াছিল, তাহার একটী লীলাস্থল আধুনিক নবদ্বীপ। নবদ্বীপ যখন ধর্ম্মের অপব্যবহারের এক সীমায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যদেব ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। গৌর নিতাইর প্রেমের স্রোতের টানে পড়িয়া কত পাপী নরাধম যে পরিত্রাণ পাইল, কত জগাই মাধাইর পরিবর্ত্তিত জীবন যে পাপবিদগ্ধ আত্মাসমূহের আশাস্থল হইল, তাহা আমরা আজিও বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু এ প্রেমের উত্তাল তরঙ্গও আবার সাম্যভাব ধারণ করিল! শ্রীগৌরাঙ্গের শিষ্যদল আবার উপধর্ম্মের স্রোতে নিমগ্ন হইল।

পৃথিবীতে, বিশেষতঃ এসিয়াখণ্ডে কন্‌ফিউসস্, জোরোয়েস্তার, প্রভৃতি আরো কতকগুলি ধর্ম্মবীরের ভিতর দিয়া ভগবান্ ধর্ম্মের আলোক সময়ে সময়ে বিকীর্ণ করিয়াছেন। সে সকল সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

উত্থান পতনের বিধি কেন ?

গীতাকারের বাক্যসমর্থনার্থ যাহা বলা হইল তাহাই প্রচুর। এখন প্রশ্ন এই :—ভগবান্ কেন ধর্ম্মজগতে পর্য্যায়ক্রমে উত্থান পতনের বিধি ব্যবস্থা করিলেন? অগম্য ভূমা ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ের মধ্যে প্রবেশ করা অপূর্ণ কীটসদৃশ মানবের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর নহে। তবে এইমাত্র বলা যায় যে মানবসমাজের অপরবিধ উন্নতির অবস্থানুসারে ধর্ম্মও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বৈদিক সময়ে যখন মানবজাতি সভ্যতার প্রথম সোপানে সমারোহণ করিয়াছিল, তখনকার ধর্ম্মও ঠিক সেই সমাজের উপযুক্তই ছিল। দূরস্থ আকাশ, বায়ু, সূর্য্য, মেঘ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের দেবতাকে পূজা করাই সেই সময়ের লোকের সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। বেদান্তের সময় সমাজ উন্নতির পথে আরও অগ্রসর হইলে ধর্ম্মও উন্নতির উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হইল। প্রকৃতির ঈশ্বর তখন মানবের অন্তরাত্মা হইয়া প্রাণেশ্বর হইলেন। ইহুদীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম আর এক পদ অগ্রসর হইল। ঈশ্বর প্রভুরূপে, রাজারূপে জনসমাজের কল্যাণের জন্য নানা প্রকারের বিধি ব্যবস্থাতে নিজের ইচ্ছা এবং আদেশ প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার পর যখন আবার খ্রীষ্টীয় বিধান সমাগত হইল, তখন ধর্ম্মও নববেশ ধারণ করিয়া উন্নতির নিদর্শন দেখাইল। যে ঈশ্বর বৈদিক সময়ে দূরের

ঈশ্বর ছিলেন, যিনি উপনিষদের সময় প্রাণের প্রাণ হইলেন, এবং যিনি মুসার বিধানে তাঁহার সঙ্গে আমাদের রাজা প্রজা সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন, তিনিই খ্রীষ্টীয় বিধানে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ জগতে প্রচার করিলেন। এইরূপে জগতে যে সকল ধর্ম্মবিধান ভগবান্ প্রকটন করিয়াছেন, তাহার সমুদায়গুলিতেই তিনি ধর্ম্মের নূতন নূতন অঙ্গ সকল সংযোজনা করিয়া তাহার পূর্ণতা বিধান করিয়া আসিতেছেন।

এদেশে "অধর্ম্মের অভ্যুত্থান"।

পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিলে গীতাকারের "ধর্ম্মের গ্লানি" এবং "অধর্ম্মের অভ্যুত্থানের" কথা যুগপৎ স্মরণ হয়। এদেশের দুর্গতির দিকে দৃষ্টি করিলে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে, এই সেই অবস্থা, যে অবস্থায় পৃথিবীতে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইয়া যুগধর্ম্ম সমাগত হয়। বর্ত্তমানকালীয় নব বিধানের অভ্যুদয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হন, তখন এদেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। অন্তঃসার-শূন্য অনুষ্ঠান দ্বারা কল্পিত দেবদেবীর উপাসনা করাই জীবনের একমাত্র এবং উচ্চতম লক্ষ্য ছিল। মৃত পুস্তক ও শাস্ত্র এবং স্বার্থপর পুরোহিত ও ধর্ম্মগুরুগণ সমাজের নেতা হইয়া মানুষকে বিপথগামী করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়াছিল। নিজ হিতচিন্তায় অক্ষম হইয়া ধর্ম্মের নামে

লোক কতই না কুকর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত ছিল! সহমরণ-প্রথা, গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দ্বারা নির্দ্দোষ শিশুর প্রাণ হনন, মৃত্তিকা, ধাতু প্রস্তরাদি নির্ম্মিত পুত্তলপূজা এবং নরপূজা, পরহিংসা এবং পরদ্বেষ প্রভৃতি কত জঘন্য পাপাচরণ এ দেশকে কলঙ্কিত করিতেছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে একতার বন্ধন ছিন্ন হওয়াতে, সমাজভঙ্গ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পরিবারমধ্যে পিতা মাতার আর প্রকৃত আধিপত্য নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায় এবং ভ্রাতাতে ভগ্নীতে আর পূর্ব্বের ন্যায় মিল নাই। সমাজে সমাজপতি হইয়া আর কেহ দাঁড়াইতে পারে না, গুরুপুরোহিত ভিন্ন কেহ আর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ নয়। দেশে যেমন প্রকৃত রাজা কেহ নাই, তেমন কিছুমাত্র উদার পবিত্র রাজভক্তিও নাই—যাহা কিছু দেখা যাইত তাহার মূল্য পৌত্তলিকের পুতুল পূজাপেক্ষা এক কপর্দ্দকও অধিক নয়। যে দেশে সর্ব্বপ্রকারের অলীকতা—যেখানে ধর্ম্মের শাসন কৃত্রিম, যেখানে রাজনৈতিক শাসন অবাস্তবিক, যেখানে সামাজিক শাসন নামমাত্র, যেখানে পারিবারিক শাসন অপ্রাকৃতিক—সে দেশের লোক যে আত্ম-শাসনে সুসমর্থ হইবে তাহার প্রত্যাশা কি? এ জন্যই এ দেশে তখন এবং এখন এত স্বেচ্ছাচারিতা, এত পাপ-ব্যভিচার।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের অবস্থা।

এদেশে যেমন, অন্যত্র ঠিক সেইরূপ না হইলেও, সে সকল

স্থানের অবস্থা অবনতির প্রথম সোপানে নিশ্চয়ই পদ বিক্ষেপ করিয়াছে। যে ইউরোপ ও এমেরিকা উন্নতির উচ্চতম মঞ্চে অধিরূঢ় বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে, তাহাদেরই অবস্থা কি? পাশ্চাত্য দেশের অবস্থাও ঠিক সেই প্রকার নয় যাহা হইলে বলা যাইতে পারে মানবসমাজ সময়োচিত দৃঢ় ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইউরোপ ও এমেরিকার গৌরব কিসে? বিজ্ঞান এবং বাহ্য সভ্যতার জন্য কি তাহাদের অভিমান নয়? বিজ্ঞান এবং বাহ্য সভ্যতা যে ভাল জিনিষ তাহাতে বিন্দু-মাত্র সংশয় নাই। কিন্তু এ সকল কোন্ শ্রেণীস্থ ভাল বস্তু? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং সভ্যতার মূল্য অন্য দিক্ দিয়া যতই কেন অধিক হউক না, মানবের উচ্চতম অধিকার সম্বন্ধে উহার গৌরব অতি অল্পই। বিজ্ঞান এবং তাহার ফল যে বাহ্য-সভ্যতা, তাহা মানবচরিত্রের একাঙ্গমাত্রে পরিব্যাপ্ত এবং সাক্ষাৎ ভাবে কার্য্য-কর। সেই অঙ্গও আবার উচ্চাঙ্গ নয়, নিকৃষ্টাঙ্গ মাত্র। যাহা-হউক, প্রকৃত বিজ্ঞান—যে বিজ্ঞান অসত্য, মূলশূন্য সত্য, অপ্রমাণিত মত, সমাদৃত এবং প্রতিষ্ঠিত কুসংস্কার ইত্যাদির সহিত সন্ধিসংস্থাপনে জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে একবারে অসম্মত, সেই আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উচ্চতম সিদ্ধান্ত অপরিজ্ঞেয়ত্ব-বাদ (agnosticism)। দৈব সাহায্য ব্যতিরেকে যাঁহারা কেবল জ্ঞান দ্বারা সকল বিষয়ের বিচার করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা

জানেন যে মানববুদ্ধি স্বরূপ বা চরম জ্ঞানলাভে একবারে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে অপরিজ্ঞেয়তাবাদে (agnosticismএ) উপনীত হওয়া একান্ত অপরিহার্য্য। আপেক্ষিক জ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ ইন্দ্রিয়াধিকারের সীমারেখার মধ্যেই বুদ্ধিকে পরিচালিত করিতে কৃতসংকল্প। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান এবং কার্য্যক্ষেত্র এই সীমামধ্যে নিরুদ্ধ থাকাতেই ইউরোপ এবং এমেরিকার বাহ্য সভ্যতা ও উন্নতির এত গৌরব, এত সমৃদ্ধি। ধর্ম্মের সঙ্গে এই বিজ্ঞানের, সত্যমূলক প্রকৃত বিজ্ঞানের, আর যে কোন প্রকারের সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, তৎসঙ্গে ইহার এই একটী বিশেষ সম্বন্ধ যে এই বিজ্ঞানের প্রভাবে জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত, উন্নতমস্তক, পাশ্চাত্য দেশসমূহে একটী অস্থৈর্য্য এবং ত্রাসের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, ঈশ্বরবাদী, নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী, ভাববাদী, কম্‌ট্‌-শিষ্য, লুথার শিষ্য, রোমকমণ্ডলী কিংবা একতাবাদী, সর্ব্বসম্প্রদায়স্থ লোকের মধ্যে এমন একটা চিত্তচাঞ্চল্য আসিয়া পড়িয়াছে যে, তাহা মুখে কেহ বলিতেও পারে না এবং ভিতরে লুকাইয়া রাখিতেও পারে না। কি জন্য কি হইতেছে কেহ কিছু বুঝে না, কেহ কাহাকে জিজ্ঞাসাও করে না। সকলেই সশঙ্কিত, সমাজভয়ে বিকম্পিত। এ অবস্থায় কি সমাজবন্ধন অব্যাহত থাকিতে পারে? তবে যে এখনও সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই, তাহার

কারণ আছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের নৈতিকভাগ এতই ইচ্ছা প্রধান, এতই জ্ঞানগর্ভ, এতই উন্নত, এতই হৃদয়গ্রাহী, এবং এতই সামাজিক একতার উপযোগী, যে অন্য দিক্ দিয়া সমাজ ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইলেও সহসা এই উচ্চ নীতির বন্ধন শিথিল হইবার নয়। যাহা হউক, আবশ্যিক এই অনুকূলতা সত্বেও পাশ্চাত্য সমাজ নিরুপদ্রব নহে। বাহিরের শ্রী ও সৌষ্ঠব এক রকম পরিপাটীর হইলেও আভ্যন্তরীণ অশান্তির স্রোত বড় সুবিধাজনক নহে। নীতির প্রভাব স্বচ্ছন্দ থাকিলেও তাহা একপ্রকার যন্ত্র বা কলের কার্য্যের ন্যায়। বাহ্যভাবে ধর্ম্মের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা দেখা যায় বটে; কিন্তু সে শ্রদ্ধা খ্রীষ্টের নৈতিক স্ফূর্ত্তা-নিবন্ধন। কিন্তু প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্মের দুর্ভেদ্য জটিলতা, দুরপনেয় আত্মনিষ্ঠতা (dogmatism), এবং লোকাতীত ঘটনাবলী (miracles) ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে কোন মতেই মিশ খায় না। মানুষ আর যন্ত্রের ন্যায় কত কাল থাকিতে পারে? সুতরাং বিপদ আসন্ন, ধর্ম্মবিপ্লব সমুপস্থিত, সমাজভঙ্গ আগত প্রায়।

নববিধানের আবশ্যকতা।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যখন এইরূপ অবস্থা, তখন নববিধানের শুভাগমনও অনিবার্য্য। বাস্তবিক তাঁহার আগমন সংবাদ বিঘোষিত হইয়াছে। কোথায়? বিধানজননী এশিয়ার পুণ্যভূমিতে, বহুবিধান-প্রসবিনী ভারতমাতার সুকোমল বক্ষঃস্থলে।

বাস্তবিক আমরা এখন তাঁহার মধ্য দিয়াই চলিয়াছি। আমরা কিসে জানিলাম যুগধর্ম্ম সমুপস্থিত? ইহার পূর্ব্বলক্ষণের কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সমাগত বিধানেরও কতকগুলি লক্ষণ আছে, যাহা বলিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিকই বিধান আসিয়াছে। এখন সেই গুলি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে।—

বিধান আসিলে কি হয়?

ভগবানের নববিধান সমাগত হইলে ধরাতলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। জরাজীর্ণ পৃথিবীর সেই প্রাচীন সাম্যভাব আর দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দিকে কেবলই উদ্যম, কেবলই পরিবর্ত্তন। নিদ্রিত জগৎ অকস্মাৎ চেতনা লাভ করিয়া চমকিত হয়। সর্ব্বত্রই বিপদের আশঙ্কা। কেহ দেখেন সর্ব্বনাশ। যাঁহারা শান্ত, শিষ্ট, সরল—রক্ষণশীলতার সুদৃঢ় দুর্গের ভিতরে নিরুদ্বেগ, তাঁহারা দেখেন সব গেল। রক্ষণশীলতার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাদের অল্পই হউক, আর অধিকই হউক, কোন অংশে কিছু ক্ষমতা আছে,—যাঁহারা ক্ষমতার বলে সমাজ রক্ষার গুরুভার নিজ নিজ স্কন্ধে লইয়াছেন, তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য রণসজ্জায় সুসজ্জিত। যাঁহাদের ক্ষমতার অভাব তাঁহারা কি হইল বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছেন। আবার যাঁহারা বিধান প্রবাহের প্রবল স্রোতে ভাসমান, তাঁহাদের অবস্থাও বিপদসঙ্কুল। তাঁহা-

দের ভিতরে অগ্নিকাণ্ড, বাহিরে হিমানীর শৈত্য; অন্তরে উৎসাহ, বাহিরের সকলই প্রতিকূল। তাঁহাদিগকে সাহায্য করে, সহানুভূতি দেয় এমন বন্ধু কেহ নাই। সকলেই খড়্গহস্ত—কেহ বুঝিয়া, কেহ না বুঝিয়া, অনেকে রোষপরবশ হইয়া। কিন্তু তাঁহারা ভীত হইবার লোক নন। নবভাব, দেবভাবে হৃদয়, মন, আত্মা, ইচ্ছা উত্তেজিত, কার্য্যের জন্য শরীর মন একান্ত প্রস্তুত—কেবল প্রভুর আজ্ঞাসাপেক্ষ। বাহিরের লোকে দেখে বাধা রাশি রাশি, বিপদ চারিদিকে। তাঁহাদের অন্তর কেহ দেখে না, কথা কেহ বুঝে না, বুঝিলেও বিপরীত অর্থে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? ভিতরে যে আগুন জ্বলিতেছে তাহা তো আর নির্ব্বাপিত হইবার জিনিষ নয়। সত্যের জ্বলন্ত বহ্নিশিখা কি কখনও প্রাচীন মতরূপ ছিন্ন বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায়? কে সাধু ইচ্ছার প্রবল প্রবাহ হাত দিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে? নবভাবের উপাসকগণ বিধানের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সত্যের বিজয়নিশান আকাশে উড়াইতে চলিলেন। ইঁহাদের দল ক্ষুদ্র, কিন্তু বিক্রম দেখে কে? পর্ব্বতসম বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইঁহারা ভ্রূক্ষেপে সত্যের রাজ্য বিস্তার করিয়া ফেলেন। শত্রুদল পরাজিত হইয়া যায়; কিন্তু কেন যে এরূপ হইল, কেহই কিছু বুঝিতে পারে না। পারিবেই বা কিরূপে? এঁরা কি দেখেন, কি শুনেন, কি ভাবেন, কি বলেন, কেহই তাহার

ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। সকলই বাতুলের কাণ্ড। শূন্য আকাশ ভাবময় নিবাসীদের বাসভূমি। সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকা, মেঘ, বায়ু, জ্যোতিঃ চিরসুহৃদের ন্যায় নবভাবুকের হৃদয়-তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া, তাঁহার সুরে সুর মিশাইয়া মধুরতানে সঙ্গীত করিতেছে। নদ, নদী, জলধি, গিরিগহ্বর, মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর তরুলতা, কানন, কুসুম, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী সকলেই আনন্দে উন্মত্ত—সকলেই ভাবুকের ভাবে মগ্ন, তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, স্বর্গের বার্ত্তাবহনকার্য্যের দূত। নববিধানের লোক পরিবর্ত্তিত, পৃথিবীসম্বন্ধে এক প্রকার মৃত, নবজীবনে জীবিত, সুরলোকে অধিষ্ঠিত। সকলের অন্ধকার, তাঁহার আলোক। যেখানে অন্যের নিরুৎসাহ নিরুদ্যমতা, সেখানে তাঁহার উৎসাহ এবং কার্য্যাড়ম্বর—যেখানে সকলে দেখে এক, বিধানবিশ্বাসী দেখেন দুই—যেখানে অন্যের জনকোলাহল-পরিশূন্য নিস্তব্ধতা, সেখানে ভাবুক শুনেন বাগ্‌দেবীর রবশূন্য বাণী—যেখানে নিরবচ্ছিন্ন শুষ্কতা, সেখানে রসাল ভাব—যেখানে জরাজীর্ণ, বার্দ্ধক্য, সেখানে নব যৌবনের পূর্ণ পরাক্রম—যেখানে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানবের সমারোহ, সেখানে দেবতার আবির্ভাব—যেখানে অনুমান কল্পনা, সেখানে স্থির সিদ্ধান্ত—যেখানে সংশয় বিচলতা, সেখানে বিশ্বাস নিশ্চয়তা—যেখানে নীচ বাসনা কামনা, সেখানে উচ্চাভিলাষ ও স্বর্গের আশা। নববিধানে অসত্যের

পরিবর্ত্তে সত্য, অজ্ঞানের পরিবর্ত্তে জ্ঞান, অমঙ্গলের পরিবর্ত্তে মঙ্গল, বিষাদের পরিবর্ত্তে হর্ষ, মৃত্যুর পরিবর্ত্তে জীবন।

ইহা কি কবিত্ব? কবিত্ব বটে, কিন্তু কল্পনাতনয় নহে; এ এক নূতন কবিত্ব, যাহার প্রাণ পরমেশ্বরের নিশ্বাস-বায়ু। সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, এই নূতন কবিত্বের জীবন। ইহার প্রভাবে নব বৈজ্ঞানিকের ক্ষিপ্ততামধ্যে, অসমসাহসিক অনুভূতির মধ্যে, পরমার্থ-পরিব্রাজক দিব্যজ্ঞান সন্দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক এই দেবদুর্লভ কবিত্বের গুণে বিজ্ঞান দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া মৃত জড়ের ভিতর মহাশক্তি দেখিতে পায়। যে মহা শক্তির প্রভাবে অচেতন জড়ের অণুরাশি কেবল কীটাণু নয়, কেবল কীট পতঙ্গ পক্ষ্যাদি নয়, কেবল সিংহ শার্দ্দূল অশ্ব গবাদির প্রকৃষ্ট আকৃতি ও রূপলাবণ্য নয়, কেবল নরদেহের আশ্চর্য্য ও মনোহর রচনা-কৌশল নয়, কিন্তু মানবে মনোরাজ্যের অন্তর্ভূত ভাব, বুদ্ধি, ইচ্ছা এবং ইহাদের ক্রিয়াকলাপ—সমুদায় দর্শন, সমুদায় কাব্য, সমুদায় বিজ্ঞান, সমুদায় শিল্প,—প্লেটো, সেক্সপিয়ার, নিউটন এবং রেফেল্ পর্য্যন্ত সংগঠনে সুক্ষম, সেই মহাশক্তি এই স্বর্গীয় কবিত্বের প্রাণ। এই নব কবিত্বের পরিমার্জ্জিত সূক্ষ্ম দৃষ্টি উন্মেষ[illegible]দের আতঙ্ককে বীর পরাক্রমের সহিত অতিক্রম করিয়া জড়, উদ্ভিদ, কীটাণু এবং নর ও দেবতার একপ্রাণত্ব, একজাতিত্ব স্বীকার করিতে অকুণ্ঠিত।

বর্ত্তমান নববিধানের বিশেষত্ব।

এ বিধানের বৈশিষ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এস্থলে দুইটীর বিষয় উল্লেখ করিলেই হইবে। (১) বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য; এবং (২) পবিত্রাত্মার অবতরণ। এই দুইটী বিষয় একটুকু বিস্তারিতরূপে বর্ণন করা বিধেয়।

বিশ্বাস ও বিজ্ঞান।

(১)—উনবিংশ শতাব্দীর নববিধানের অতীব গুরুতর এক নূতনত্ব এই যে ইহাতে বিশ্বাস এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সেই প্রাচীন বিবাদ আর নাই। মৃত্যুর প্রাক্কালে শ্রীঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে এই বলিয়াছিলেন :—

"I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when he the spirit of truth is come, he will guide you into all truth."

অস্যার্থ :—"আমার এখনও তোমাদিগকে অনেক বিষয় বলিবার আছে; কিন্তু তোমরা তাহা বহন করিতে পারিবে না। যাহা হউক, যখন সত্যের আত্মা আগমন করিবেন, তখন তিনি তোমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারের সত্যেতে লইয়া যাইবেন।"

এই "সর্ব্বপ্রকারের সত্যে"র মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যই প্রধান অঙ্গ। যে বিজ্ঞানের আলোকে বিশ্বাস তিরোহিত হইবে বলিয়া পূর্ব্বকালের লোক ভয়ে জড়সড় হইত, সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে

একাঙ্গ হইয়া বিশ্বাস এবার পরিত্রাণ বিধানের আশ্চর্য্য ব্যাপারে লিপ্ত। বিশ্বাস প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে বিজ্ঞানকে ডাকিয়া বলিতে-ছেন, "আইস, যেরূপ ইচ্ছা আমাকে পরীক্ষা কর। ভ্রম, প্রমাদ, অসত্য, অন্যায়ের সহিত আর আমার কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার বিচার ও নূতন আবিষ্কার দ্বারা যা উড়িয়া যাওয়ার, এই মুহূর্ত্তে তাহা উড়িয়া যাক্, তাহাতে মঙ্গল হইবে। তোমার যে বিভাগে যত সত্য তৎসমুদয় আমার। তুমি তোমার শ্রমলব্ধ যে সব উপহার লইয়া আসিবে সে সকলই আমার আদরের ধন। বাস্ত-বিক তুমি আমার চক্ষু, তোমা ছাড়া আমি দুপাও চলিতে পারি না। কত দিনের পর আমি তোমাকে পাইয়া এখন স্থিরভূমিতে পা রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। তোমার আনুকূল্যে এবার আমি পৃথিবী জয় করিব। বাস্তবিক তুমিই ধরাতলে স্বর্গধাম আনয়ন করিয়াছ। তুমি তো জান ভক্ত বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সময় বিজ্ঞান যাহা করিয়াছে তজ্জন্য তাহার নিকট আমাদের কত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত! কেবল পার্থিব বিষয় নয়, ধর্ম্মরাজ্যেও উহা কত আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটন করিয়াছে। স্বর্গকে পৃথিবীর সন্নিহিত করিয়া এ দুয়ের মাঝে যে দূরত্ব ছিল তাহা হ্রাস করিয়া দিয়াছে ... অতীত কালে ভগবানের মন্দিরে উঠিবার জন্য বহু সোপানযুক্ত একটী সুদীর্ঘ আরোহণী ছিল। বিজ্ঞান ইহাকে ছোট করিয়া দিয়াছে। ধরা হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত অনেক গুলির পরিবর্ত্তে একটী

মাত্র ধাপ। মন ও জড় হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত একই সোপান; পেশী ও স্নায়ু, চক্ষু ও কর্ণ হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত একই সোপান। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ এবং সুগভীর সাগরতল হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত একই সোপান। ... ... ঈশ্বর আমাদের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন যে আমরা তাঁহাকে এক প্রকার স্পর্শই করিতে পারি," বিজ্ঞান বলেন, "বিশ্বাস, তুমি আমার মাথার মণি। তোমার সঙ্গ ছাড়া হইয়া আমি শুষ্ক ডাঙ্গায় পড়িয়াছিলাম। কেবল বিচার, কেবল সিদ্ধান্ত, কেবল অনুমান, কেবল কল্পনা, কেবল বাক্য, কেবল 'ঘটত্ব পটত্ব'! তুমি যখন আমার মস্তকের ভূষণ হও, তখন পৃথিবী আমার স্বর্গ হয়। আমি দেহ, তুমি প্রাণ; তাই তোমায় না পাইয়া আমার এত বিড়ম্বনা। এস, তোমার স্থান তুমি লইয়া আমাকে জীবন দাও।"

পবিত্রাত্মার অবতরণ।

(২)—এবার আর আমাদের মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন নাই। সকলেরই সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কারবার করিবার অধিকার জন্মিয়াছে। সাধুই হই আর পাপীই হই, জ্ঞানীই হই আর মূর্খই হই, ধনীই হই আর দরিদ্রই হই, কথা বলিতে পারি আর নাই পারি, ধর্ম্ম জানি আর নাই জানি, আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের সম্মুখে যাইতে পারি। বাস্তবিক সাক্ষাৎ ভাবে না হইলে এবার আর আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুরই—ঈশ্বর সম্বন্ধীয়

ক্রিয়াকলাপমাত্রেরই কোন মূল্য নাই। প্রতিনিধি দ্বারা আর কাজ চলে না। বাস্তবিক এবার তিনি পাপীর পরিত্রাণের ভার নিজের হাতেই রাখিয়াছেন। বিজ্ঞান যে এবার ঈশ্বরকে খুব নিকটে লইয়া আসিয়াছে, তদ্বিষয় উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। হরি এখন যেখানে সেখানে—জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, আকাশে, বায়ুতে, ঘরে, বাহিরে, হৃদয়ে, মনে, ইচ্ছাতে, কর্ম্মেতে। নয়ন উন্মীলন কর, আর তাঁহাকে দেখ; কাণ ফিরাও আর তাহার কথা শোন; হাত বাড়াও, আর তাঁহাকে স্পর্শ কর। তিনি খুব নিকটে, তিনি দেখা দেওয়ার জন্য, ধরা দেওয়ার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র। চাহিলেই হয়,—প্রার্থনা করিলেই তিনি ধরা পড়িলেন।

সমবেত বিশ্বাসমণ্ডলী।

উপরে যে একাত্মতার মত বিবৃত হইল, তাহা প্রকৃতার্থে একটী মতমাত্র বৈ আর কিছুই নহে, অধিক হয় তো বিজ্ঞানের সুবিমল, ন্যায়ানুমোদিত সিদ্ধান্ত। কিন্তু মত যতই কেন পরিশুদ্ধ হউক না, যতই কেন উচ্চ হউক না, উহা যত দিন আমাদের রক্ত মাংসের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া আমাদের নিজের সামগ্রী না হয়, তত দিন উহা দ্বারা আমাদের জীবনের কোন প্রকারের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না। খ্রীষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ তোমরা তদ্রূপ পূর্ণ হও।" দুর্ব্বল, মলিন মানব "পূর্ণ" হইবে, এ কথা আপাততঃ

শ্রুতিকটু হইলেও উহা শুনিবার, জীবনে পালন করিবার বিষয়। যীশু নিজ জীবনে তাহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।” “আমি আর আমার পিতা এক,” গর্ব্বের সহিত তিনি যে এ বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার গূঢ়, গভীর অর্থ আছে। তিনি চিন্তাতে, ভাবেতে, ইচ্ছাতে মানবজাতিসঙ্গে—ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যতের লোকসঙ্গে এক হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি মানবের পূর্ণতায় বিশ্বাস করিতেন, লোককে পূর্ণ হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। বাস্তবিক তাঁহার মন এত উদার ছিল—তাঁহার ভাব এত কোমল ছিল—তাঁহার ইচ্ছা এত সতেজ ছিল যে, পৃথিবীতে এমন কোন সত্য ছিল না, থাকিতে পারে না, যাহা গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল—এমন কোন সৌন্দর্য্য ছিল না, থাকিতে পারে না, যাহা তিনি ভালবাসিতে পারিতেন না—এমন কোন করণীয় ছিল না, থাকিতে পারে না, যাহা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। সত্য বটে, তিনি দৃষ্টান্তপ্রদর্শক-রূপে যে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর কাহারো লাভ করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহার অনুগমন করার ক্ষমতা সকলেরই আছে। বাস্তবিক একাত্মতা লাভের যে উচ্চজীবন আদর্শরূপে তিনি জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা জ্ঞাতসারেই হউক, কি অজ্ঞাতসারেই হউক, সর্ব্বদা সকলেই যাপন করি-তেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি আমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই, যে

বলিতে পারে তাহার স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডীমধ্যে অন্যের প্রভাব অন্তর্নিবিষ্ট হয় নাই কিংবা হইতে পারে না। কিন্তু ভগবান্ বিধান প্রকটন করিয়া জ্ঞাতসারে লোককে তাহাদের একাত্মতা অনুভব করিতে দেন। বিধানের মধ্যে যাঁহারা মনোনীত হন, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে পূর্ণতা দর্শন করেন—তাঁহাদিগকে একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে হয়। যাঁহার জ্ঞান নাই তিনি অন্যের জ্ঞানে জ্ঞানী; যাঁহার ভক্তি নাই, তিনি দলের ভক্তিধনে ধনী; যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি সহযাত্রিদিগের বিশ্বাসে বিশ্বাসী। এইরূপে বিধানমণ্ডলীর লোক ব্যক্তিগতভাবে এক এক জন অপূর্ণ হইয়াও দলের সঙ্গে একাত্মতানিবন্ধন প্রত্যেকেই পূর্ণ—দলের সমবেত দৃষ্টিতে দেখেন বলিয়াই তাঁহারা আপনারা পূর্ণ এবং দেখেন পূর্ণ ঈশ্বরকে।

এখন বোধ হয় ইহা স্পষ্টই অনুভব করা যাইতেছে যে, বিজ্ঞানলব্ধ সত্যকে জীবনের কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, আমাদিগকে বিধানের লোকসমূহের সহিত একাত্মা হইয়া পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করিতেই হইবে। এই বিশ্বাস লাভ করিলে ইহলোক পরলোকের ভেদজ্ঞান চলিয়া যাইবে, আমরা মৃত্যুর তীক্ষ্ণাঘাতকে অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারিব, মৃত্যু যে সত্য সত্যই অমৃতের সোপান ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

———o———

৺ বিজয়রাম রায়ের পরিবার।

বংশ পরিচয়।

শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন রায় যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ধন ঐশ্বর্য্য এবং কুলমর্য্যাদাদি সম্বন্ধে শীর্ষ-স্থানীয় না হইলেও প্রাচীন, সুপরিচিত এবং সম্ভ্রান্ত। ত্রিপুরা জিলার মধ্যে খ্যাতনামা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপবিভাগই অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের আবাস স্থান। এই উপবিভাগের সুপ্রসিদ্ধ তিন পরগণা মধ্যে সরাইল নামক পরগণা অন্যতর একটী। এখানে যে সকল ভদ্রলোক বাস করেন,

তাঁহাদিগের মধ্যে সেন, গুপ্ত এবং [illegible]র দত্তবংশীয় বৈদ্য বংশমর্য্যাদা ইত্যাদি সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই চারিঘর বৈদ্যমধ্যে তৃতীয় যে দত্ত বংশটী, তাহার কয়েক পরিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নিকটবর্ত্তী গুতাউড়া নামক ক্ষুদ্র একগ্রামে অবস্থিতি করেন। এই গ্রামের অন্য দশঘরের ন্যায় ৺ বিজয়রাম রায় মহাশয়ের পরিবারের লোকেরা সামান্য গৃহস্থমাত্র। ইহাঁদের যৎসামান্য যে কিছু ভূসম্পত্তি ছিল তদ্দ্বারা সুচারুরূপে পরিবারের ভরণ পোষণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না। এই ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব এবং খামার বা গৃহস্থী হইতে যাহা কিছু পাওয়া যাইত, তাহাতেও সমুদয় ব্যয় সঙ্কুলন হইত না। সুতরাং এই পরিবারের লোকেদের কাহাকে কাহাকে চাকুরি করিতে হইত। ৺ বিজয়রাম রায় এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় সরাইলের সুবিখ্যাত জমিদার দেওয়ান সাহেবদের [illegible]কারে কার্য্য করিতেন। সরাইলের জমিদারী নিলাম হওয়ার পর ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বয়োধিক্যপ্রযুক্ত আর কখন কর্ম্মকাজ করেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

৺ রাজচন্দ্র রায় মহাশয় ত্রিপুরাধিপতির সরকারে সাময়িকভাবে চাকুরি করিতেন। বিজয়রাম রায়ের তৃতীয় পুত্র ৺ গৌরচন্দ্র রায় মহাশয় কুমিল্লার ফৌজদারী আফিসে নায়েব-নাজিরী, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ৺ শিবচন্দ্র রায় মহাশয় বাড়ীতে গৃহস্থীর কাজ করিতেন। ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ প্রাণনাথ রায় মহাশয় নোয়াখালীর কালেক্টরীর একজন মুন্সী ছিলেন। এ বৃহৎ পরিবারটী ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং ৺ রাজচন্দ্র রায় মহাশয়দিগের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একান্নভুক্ত থাকিয়া একপ্রকার সুখেই দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। এই পরিবারের ঈশ্বরানুরাগ এবং ধর্ম্মভীরুতাই ইহাঁদের সুখের কারণ। পৌত্তলিক হইয়াও বিজয়রাম রায়ের পরিবার যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি এবং নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যেমন চিত্তবিমোহন তেমনি সুপবিত্র। তদানীন্তন প্রথানুসারে নিত্ত-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করা তো অবশ্যকর্ত্তব্য মধ্যেই ছিল; এতদ্ব্যতীত দোল দুর্গোৎসবাদি সাময়িক অপরবিধ পার্ব্বণ অনুষ্ঠানও সম্পাদিত হইত। এ পরিবারের ধর্ম্মানুষ্ঠানে এই

একটী আশ্চর্য্যভাব দৃষ্ট হইত যে, তাঁহারা বাহ্যাড়ম্বরের দিকে একেবারে দৃষ্টি করিতেন না। বাস্তবিক তাঁহাদের বাড়ীর এই নিয়ম ছিল যে, পুরুষানুক্রমে যাহা চলিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে বেশী কি কম কিছুই করা হইবে না। এজন্য অনেক সময় দেখা গিয়াছে, এই বাড়ীর প্রতিমাগঠন, সাজান ইত্যাদিতে নূতন সভ্যতার অনুরোধে অন্যান্য বাড়ীর ন্যায় কোনপ্রকারের আধুনিকতা থাকিত না। নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। পক্ষান্তরে শ্রদ্ধা, ভক্তি, নিষ্ঠা, দান, দক্ষিণাদি আধ্যাত্মিক বিষয়সম্বন্ধেও এ বাড়ীতে সময়ের প্রভাব একবারেই পরিলক্ষিত হইত না। এ বাড়ী রক্ষণশীলতার একটী ছোটখাট দুর্গ ছিল বলিলেই হয়। ধর্ম্মভাব-প্রবণ বিজয়রাম রায়ের পরিবার আকিঞ্চন, বিনয়, নম্রতা, দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাহারো সহিত উচ্চভাষে কথা বলা এই পরিবারের স্বভাববিরুদ্ধ। সত্য, ন্যায়, দয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ইহাঁরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এ বাড়ীর নিয়ম নিষ্ঠাদি গ্রামের সকল লোকের সম্মান আকর্ষণ

করিত। ইহাঁদের শিষ্টাচার এবং সদ্ব্যবহারে সকলেই মোহিত হইত। পরসেবা এবং অতিথিসৎকার ইহাঁদের জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। পারিবারিক আভ্যন্তরীণ কার্য্যসম্পাদনের নিয়ম সাতিশয় পারিপাট্যের সহিত ব্যবস্থিত হইত। পরিবার মধ্যে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, নির্ভর, সারল্য, প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। অপরিচিত, অনাত্মীয়, পরপরিবার হইতে আনীত কুলবধূরা যে ভাবে পরস্পরের সহিত স্নেহ ভালবাসার সূত্রে গ্রথিত হইয়া মিল এবং একতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, তাহা দেখিলে এখনকার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা নিশ্চয়ই লজ্জায় অধোবদন হইত। ফলে এই পরিবারটী পতনোন্মুখ প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাবে কিরূপে মানবে দেবভাব সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহার সাক্ষী হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন।

স্বর্গীয় রাজচন্দ্র রায়।

বিজয়রাম রায়ের পারিবারিক উন্নত দেবভাবের শেষাবস্থা, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র, এবং আমার পরম পূজনীয় পিতৃদেব, স্বর্গীয় রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের

জীবনকালসহিত সহব্যাপক। কলির ঘোর পাপ-তমসাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে ৺রাজচন্দ্র রায় একটী ধ্রুবতারা-রূপে উদিত হইয়া পথভ্রান্তদিগের দূরস্থিত গৃহগমনের পথ আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এক জন প্রকৃত বিশ্বাসী এবং হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন। দেশমধ্যে তিনি সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মালসীগান রচয়িতা ৺ রামদুলাল মুন্সীর সহযোগী এবং সহসাধক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীত রচনাশক্তি না থাকিলেও তিনি সঙ্গীতের রসগ্রহণে সুপটু ছিলেন। রামদুলালের সঙ্গে সঙ্গীত করিয়া অনেক সময় ভাবরসে ডুবিয়া যাইতেন। পক্ষান্তরে মুন্সী রাম-দুলাল পিতৃদেবের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সুতীক্ষ্ণ ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং কঠোর সাধনবল দেখিয়া চিরমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এই দুই সাধুআত্মা আজীবন পবিত্র সৌহার্দ্দ সুখ আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের ধর্ম্মজীবনের বিশেষত্ব এই যে ইহাঁরা উভয়েই গৃহী ছিলেন—ধর্ম্মব্যবসায়িদের ন্যায় ইহাঁদের শিষ্য সেবক কেহ ছিল না। পিতৃদেব সাধারণতঃ বৎসরের মধ্যে

ছয়মাস গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে কোন স্থানে যাইয়া কর্ম্মকাজ করিতেন। অবশিষ্ট ছয়মাস প্রায়শঃ বাড়ীতে বাস করিতেন। গৃহে অবস্থিতির সময়টা তাঁহার পক্ষে বৃথা আমোদ প্রমোদ কিংবা নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামসম্ভোগের সময় ছিল না। বাড়ী আসিলে তাঁহাকে পরিবারের বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ এবং অধ্যাত্ম জীবনসম্বন্ধীয় নানা প্রকারের সাধন ভজনে ব্যাপৃত থাকিতে হইত।

গৃহকর্ম্ম।

গৃহকার্য্য মধ্যে বাড়ী ঘর দরজা এবং ফুলের বাগান ইত্যাদি পরিষ্কার রাখাই প্রধান কর্ম্ম ছিল। এ সবকার্য্যে তাঁহাকে এতটা পরিশ্রম এবং এত অধিক পরিমাণে কাজ করিতে হইত যে, যে ছয়মাস কাল তাঁহাকে প্রবাসে থাকিতে হইত, সেই সময়ের অমনো-যোগিতা বাহিরের লোক বড় একটা অনুভব করিতে পারিত না। গৃহকার্য্যসম্বন্ধে তাঁহার এতাধিক পরি-মাণে উদারতা ও সদাশয়তা ছিল যে, সচরাচর যে সকল কাজে ভূঁইমালী (হাড়ী) ভিন্ন অন্য কোন হিন্দু কখন হস্তক্ষেপ করে না, প্রয়োজন হইলে তিনি অম্লান

বদনে তাহাও সম্পন্ন করিতেন। সংসার ও গৃহসম্বন্ধীয় অন্যান্য কাজের মধ্যে তাঁহার পক্ষে সূচীর কর্ম্ম যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি রুচিসঙ্গতও ছিল। সেই কার্য্য পুরাতন লেপ, কাঁথা, বালিস ইত্যাদির জীর্ণসংস্কার। বিজয়রাম রায়ের বাড়ীতে অতিথিসেবাকার্য্য যে একটী চিরব্রতের আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। শীতকালে আগন্তুকদিগের কষ্ট না হয়, এজন্য রাত্রকালীয় গাত্রাবরণের প্রয়োজন। নূতন লেপ তোষক প্রস্তুত করিয়া রাখার সামর্থ্য ছিল না, সুতরাং অব্যবহার্য্য পুরাতনগুলিকে মেরামত এবং পরিষ্কার পুরাতন বস্ত্রের আবরণী দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইত। শীতকালে আমাদের ওঅঞ্চলের লোকেরা প্রায়শঃ পদব্রজেই গমনাগমন করে। ফলারী ব্রাহ্মণগণের পদধূলি এবাড়ীতে শীতকালেই অধিক পড়িত। তাঁহাদের জন্য লেপ কাঁথা না রাখিলে চলিবে কেন? দেখিয়াছি, আমাদের বাড়ীতে ১০ কি ১৫ জনের প্রয়োজনীয় গাত্রাবরণী ইত্যাদি মজুদ থাকিত।

ধর্ম্মসাধন।

পিতৃদেবের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রধান কার্য্য ধর্ম্ম

সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিসংগ্রহপূর্ব্বক তাহার অনুলিপি করিয়া রাখা। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী তাঁহার নিকট বিশেষরূপে আদৃত ছিল। নানা স্থান হইতে পুস্তক আনিয়া তাহার অনুলিপি নিজ হস্তেই করিতেন। এইরূপে তিনি অনেকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এগুলি তিনি আমাকে দেওয়ার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই, আমার অযত্নে পুস্তকগুলির অধিকাংশই হারাইয়া এবং নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রথম অবস্থায় যখন তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মসাধন করিতেন, তখন সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপে বিশেষ মনোযোগ ছিল। তন্ত্রমতে ধর্ম্ম-সাধন করিতেন বলিয়া তিনি যে সাধারণ তান্ত্রিকদিগের মত 'ভৈরবীচক্র' কিংবা দূষিত বা অবৈধ পানাদির সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতেন তাহা নহে। তিনি এক জন প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু লোক ছিলেন। স্বকীয় গূঢ় উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য তিনি এই প্রথমাবস্থায় সন্ধ্যা পূজা এবং গুরুভক্তিকেই প্রচুর মনে করিতেন। রাত্রি অধিক হইলে গভীর সাধনার জন্য মালাজপ ও ধ্যানাদি করিতেন। মাঝে মাঝে ধর্ম্মবন্ধুগণ সহ গভীর ধর্ম্মালাপ ও সঙ্গীত করিতেন। ধর্ম্ম-

জীবনের শেষ অবস্থায় মূর্ত্তিপূজা একবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। যোগাভ্যাস জন্য ন্যাস নামক প্রক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের গৌরব সাধনার দিক্ দিয়া তত প্রকাশিত হয় নাই, যত চিত্তের স্বাভাবিক গতির মধ্য দিয়া হইয়াছিল। যদিও তাঁহার জীবনকালেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাজবদ্ধ হইয়াছিল, এবং যদিও তিনি কলিকাতা নগরীতে কয়েক বার আসিয়াছিলেন, তথাপি পরিতাপের বিষয় এই, তিনি রাজা রামমোহন রায় কিংবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন অনুসন্ধান পান নাই। তিনি যেরূপ উদার ও ধর্ম্মপিপাসু লোক ছিলেন, তাহাতে ইহা নিশ্চয় করিয়াই বলা যায় যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন।

উন্নতজীবন।

যাহাহউক, স্বর্গীয় রাজচন্দ্র রায়ের গৃহীত ধর্ম্মমতে যত কেন দোষ থাকুক না এবং তাহার প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান যত কেন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের অননুমোদনীয় হউক না, তাঁহার জীবনের অনেক ব্যাপার অত্যুন্নত ব্রাহ্মজীবনের সহিত তুলনার বিষয় ছিল। এ জীবনে

মানবস্বভাবসুলভ নানাপ্রকারের অভাব ত্রুটি ছিল ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও তাহার অবশিষ্টাংশে এতটা উচ্চতা ও চমৎকারিত্ব দেখা গিয়াছিল যে, এ বিষয় একটুকু বিস্তার করিয়া দুই চারি কথা বলা প্রয়োজনীয়। ৺রাজচন্দ্র রায়ের উচ্চজীবন সমালোচনা করিবার জন্য উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—১ম, সামাজিক; ২য়, আধ্যাত্মিক।

সামাজিক।

পিতৃদেবের জীবন কালে হিন্দুসমাজের অবস্থা যদিও এখনকার ন্যায় ততটা দুর্গতিগ্রস্ত হয় নাই, তথাপি ইহা সহজেই বোধগম্য যে, কল্পিত দেব দেবীর উপাসনাপ্রভাবে সমাজের পবিত্রতা কখন অপ্রতিহত থাকিতে পারে না। বাস্তবিক প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের জীবন্ত ভাব বহুশতাব্দী পূর্ব্বেই তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। তবে কি না ভাব-প্রধান হিন্দুজাতির মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মের প্রভাব সহজে বিলুপ্ত হওয়ার কথা নয়—ধর্ম্মের উত্তাল তরঙ্গরাজি যতই কেন্দ্র হইতে পরিধির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই ক্রমে ক্রমে তাহার উচ্চতা এবং বেগ হ্রাস হইয়া আসে, এবং অবশেষে

বহু কালের পর তাহার শেষ লহরীটী একেবারে জলে মিশিয়া সাম্য প্রাপ্ত হয়। এখানে যে সময়ের কথা হইতেছে, তাহা হিন্দুধর্ম্মের বিলয়প্রাপ্তির সময়। সেই সময়ে ধর্ম্মের বন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা কিছু ধর্ম্ম ছিল তাহা নামমাত্র। সুতরাং সমাজনীতি-প্রতিপালনে লোকের যত্ন অত্যল্প মাত্র ছিল। অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা, কার্পণ্য, শঠতা, হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরপীড়া, বিবাদ, কলহ ইত্যাদি নানা প্রকারের পাপ, ব্যভিচার সমাজকে বাহুল্যরূপে কলঙ্কিত করিতেছিল। এদিকে আবার ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর বিলক্ষণ ছিল—ফুল, দূর্ব্বা, বিল্ব-পত্র, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যের ছড়াছড়ি, মালার ঠক্‌ঠকি, ফোটা, তিলক এবং গায়ে ছাপমারা, এ সকলের সমাদর! সমাজের ঈদৃশ দুর্দ্দশার মধ্যে ৺ রাজচন্দ্র রায়ের বিশ্বাস, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি যে বিশেষ-রূপে শোভমান হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং এই অবস্থায় তিনি যে দেশ মধ্যে 'সিদ্ধ পুরুষের' খ্যাতিলাভ করিবেন তাহাতেই বা বিস্ময়ের বিষয় কি? তাঁহার সরল, উদার, অমায়িক ব্যবহার, তাঁহার অক্ৰু-

ত্রিম ভালবাসা, তাঁহার সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার কার্য্য-পটুতা, তাঁহার পরহিতৈষণা, তাঁহার পরদুঃখকাতরতা, তাঁহার মিষ্টভাষিতা, তাঁহার সদ্ভাব সদ্বিবেচনা—এ সকল গুণ সহজেই লোকের চিত্ত মোহিত করিতে পারিত। তিনি নিজের বড় পরিবারের জন্য যত দূর করিবার করিয়াও গ্রামের গরীব দুঃখীদিগকে বিস্মৃত হইতেন না। কিছু করিবার ক্ষমতা থাকুক আর না থাকুক, তাঁহার সুপ্রশস্ত হৃদয়ে বহু লোকের ভাবনা ভাবিবার স্থান ছিল। উৎসবাদির সময় নিজ বাড়ীর বালক বালিকাদিগের জন্য যেমন নূতন দ্রব্য বস্ত্রাদি আনিতেন, তেমন গরীব প্রতিবাসীর ছেলেদের জন্যও আনিতেন। নিজ পরিবারের মধ্যে এক আত্মবিস্মৃতিই পারিবারিক সেবাসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের মূলীভূত ছিল। মাতৃদেবীর নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি পরি-ণীতা হইয়া যে দিন স্বামি-গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, সেই দিনই তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তুমি মনে রাখিবে যে, তুমি কেবল আমার নও, সকল পরিবারের।" তিনিও স্বামীর আজ্ঞাপালনে আজীবন যত্নপরায়ণা ছিলেন, এবং বহুল পরিমাণে

কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষপাতবিহীন হইয়া সমানভাবে সকলের দিকে দেখিতেন বলিয়াই অর্থের অনাটন সত্ত্বেও পরিবারের মধ্যে সন্তোষের একটা অপূর্ব্বভাব পরিলক্ষিত হইত, এবং ইহারই জন্য এই পরিবারের মধ্যে কখনও কোন দিন—অন্ততঃ তাঁহার জীবদ্দশায়—পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস, হিংসা, পিশুন দৃষ্ট হয় নাই। আমার ছোট কাকা ৺ শিবচন্দ্র রায় মহাশয় বাড়ীতে থাকিয়া সংসার এবং গৃহস্থীর কাজকর্ম্ম দেখিতেন। একবার বাজারে তাঁহার কিছু দেনা হইয়াছিল। তজ্জন্য এক দিন ঋণ হইল বলিয়া পিতৃদেবের সম্মুখে তিনি একটুকু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতৃদেব অমনি বলিলেন, "তুই একটা মানুষ, তোর আবার ঋণ।" ইহার অর্থ এই, আমি বর্ত্তমান থাকিতে ঋণের ভাবনা তোমাকে কেন ভাবিতে হইবে? তাঁহার পারিবারিক পক্ষপাত-শূন্য জীবনের এমনি একটা প্রবল প্রভাব ছিল যে, ইহা কখনও কেহ সংশয় করিতে পারে নাই। তিনি পরিবারের অন্যান্য শিশুবর্গকে নিজের সন্তানগণ হইতে বিন্দুমাত্রও ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতেন না। তাঁহার নিকট

সকলেই সমান ছিল। তাঁহার এক জন পিতৃব্যপুত্র তাঁহার স্বর্গারোহণের পর যখন পৃথক্-অন্ন হইলেন, তখন কোন প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কেন এত শীঘ্র ভিন্ন হইলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "যাঁহার পুণ্যের বলে একত্র ছিলাম, তিনি তো চলিয়া গেলেন, এখন আর একত্র থাকা উচিত নয়।" জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত পরিবারের সকলকে একই চক্ষে দেখিয়া, একই ভাবে সকলের সুখের জন্য প্রয়াস করিয়া তিনি যথাসাধ্য পরিবারের সুখবিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অল্পাহার, অনাহার, সুখ, দুঃখ, সকল অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া পৃথিবীমধ্যে এই পরিবার একটী আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক।

পিতৃদেবের আধ্যাত্মিক জীবন যোগপ্রধান ছিল। সংসারের কার্য্যে তিনি সুনিপুণ ছিলেন এবং সংসারের কোন না কোন কার্য্যে নিরন্তর তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত। কিন্তু তিনি যে কাজেই কেন লিপ্ত থাকুন না,—তাঁহার হস্ত যাহাই করুক না কেন, পদদ্বয় যেখানেই গমন করুক না কেন, চক্ষুর্দ্বয় যাহাই দেখুক

না কেন, তাঁহার সুবিমল আত্মা দিগ্দর্শনের শলাকার ন্যায় সেই একই চিন্ময় মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া থাকিত। তিনি যখন মূর্ত্ত্যাদির পূজা করিতেন, যখন ফুল, দূর্ব্বা, বিল্বপত্রের খুব ধুম ছিল, তখনও মন সেই মনোহর রূপের গুণেই মোহিত ছিল। কোদালি হাতে করিয়া ঘাসই ছুলুন, আর দা দিয়া গাছই কাটুন; সেলাই করুন আর রাস্তায়ই বেড়ান, মন যে অটলভাবে আর এক দিকে ফিরিয়া রহিয়াছে, ইহা যে সে লোকও টের পাইত। শুনিয়াছি একদিন নিড়ানী হাতে করিয়া ফুলবাগানের তৃণোৎপাটন করিতে করিতে কি একটা জিনিষ ধরিয়া কেবলই টানিতেছেন; ইত্যবসরে কেহ নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মহাশয়, কি করিতেছেন? আপনি যে একটা সাপের ল্যাজ ধরিয়া রহিয়াছেন!" হাতের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তাই তো।" তৎপর হাত ছাড়িয়া দেওয়ামাত্র গর্ত্তে প্রবিষ্ট সর্পের ল্যাজটাও ভিতরে চলিয়া গেল। ভিতরে থাকিয়া তিনি যে কি এক আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তাহা সহজে বোধগম্য নয়। তিনি হৃদয়মধ্যে হৃদয়রাজকে দেখিয়া যে প্রফুল্লবদন থাকিতেন এবং তজ্জন্যই যে

তাঁহার কথা, বার্ত্তা, আচার, ব্যবহার এত মিষ্ট বোধ হইত, তাহাতে কি আর কোন সংশয় থাকিতে পারে? বাহির শুদ্ধ থাকিলেও অন্তর শুদ্ধ না হইতে পারে; কিন্তু যেখানে অন্তর পবিত্র, সেখানে বাহিরের পবিত্রতা অনিবার্য্য। কৃত্রিম সদনুষ্ঠান, কিংবা যে সকল সৎকার্য্য ফলবাদের নিয়মানুরোধে অভ্যাস দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া যান্ত্র্য নামে অভিহিত হইতে পারে, তাহার সহিত প্রকৃতিপ্রণোদিত বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক কার্য্যের অনেক বৈষম্য রহিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ এতাবন্মাত্র বলিলেই হইল যে, একটুকু মনোযোগের সহিত দেখিলে কৃত্রিম এবং যান্ত্র্য কার্য্যমাত্রই কোন না কোন স্থানে কিংবা কোন না কোন সময়ে অসংলগ্নতা এবং স্ববিরোধিতা দোষে দূষিত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ফলে প্রকৃতিকে কেহ লুকাইতে পারে না, ঠিক অনুকরণও করিতে পারে না।

পিতৃদেবের অন্তররাজ্য প্রকৃতিদেবী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া সম্যগ্‌রূপে নিজেরই শাসনে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার যোগ স্বর্গের সুপবিত্র সামগ্রী—কলির মাহাত্ম্য

উহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, শিক্ষা এবং অভ্যাসের প্রভাব উহাতে বিস্তৃত হয় নাই, সমাজের কুদৃষ্টান্ত উহার চতুঃসীমামধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার যোগ শুষ্ক কঠোর পদার্থ ছিল না, উহা সুনির্ম্মল ভক্তির সহিত মিশিয়া বড়ই সুমিষ্ট রসাল রূপ ধারণ করিয়াছিল। যোগেতে আনন্দ লাভ করিয়া তিনি গুরুতর সংসারের কার্য্যনির্ব্বাহ-কালে কখনও বিরক্ত হইতেন না; বরঞ্চ ধ্যান, ধারণা-দির ন্যায় এ সকল কার্য্যেও খুব ডুবিতে এবং মজিতে পারিতেন। পৈতৃক শ্মশানভূমিতে সাধন ভজনের জন্য তিনি যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেখানে উপাসনা করিতে করিতে যখন ভক্তির উচ্ছ্বাস হইত, তখন ক্রন্দন করিয়া চক্ষু ফুলাইয়া ফেলিতেন। ধর্ম্ম-বন্ধুগণকে লইয়া কোন দিন সঙ্গীত করিতে করিতে রাত্র শেষ করিয়া দিতেন। আমি তাঁহার মুখে এই সঙ্গীতটী শ্রবণ করিয়াছি :—

"ডুবেছে কেউ ডুব দিতেছে।
সোণার কমলমাঝে রসিক ছাপা রয়েছে ॥
এক ডুবেছে স্বরূপ গোঁসাই,

প্রেমে আর ডুবেছে গৌর নিতাই,
ডুবেছে অদ্বৈত গোঁসাই যে জন প্রেমধন এনেছে ॥"

পৌত্তলিকতা উপায়।

যোগভক্তির সম্মিলন যে আত্মাতে হয়, তাহাতে জ্ঞান এবং কর্ম্মের অভাব থাকে না। পিতৃদেবের কার্য্যকুশলতার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'জ্ঞান' শব্দে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত লোক যাহা বুঝি, সে জ্ঞান ৺রাজচন্দ্র রায়ের ছিল না বটে; কিন্তু যে জ্ঞান থাকিলে লোক জ্ঞানসমুদ্রের অগাধ জলে নিমগ্ন হইতে পারে, সেই জ্ঞান তাঁহার প্রচুর পরিমাণেই ছিল। তিনি পৌত্তলিকতার দুর্গমধ্যে থাকিয়াও কি আশ্চর্য্যরূপে চিন্ময় ঈশ্বরের অনুসন্ধান পাইয়াছিলেন! সত্য বটে ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন; কিন্তু তাঁহার পৌত্তলিকতার অর্থ সাধারণ পৌত্তলিকতা নয়। প্রকৃত পৌত্তলিকেরা মুখে যাহাই কেন বলুক না, তাহাদের পুতুলপূজা 'উপায়' নয়, বাস্তবিক 'উদ্দেশ্য'ই। কিন্তু পিতৃদেবের বাহ্য পৌত্তলিক অনুষ্ঠান সত্য সত্যই উপায়মাত্র ছিল। এজন্য তাঁহার সাধনপ্রণালী সময়

সময় পরিবর্ত্তিত হইত। প্রারম্ভে অন্যান্যেরা যেমন গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শাক্তের উপাস্য দেবতা শিব ও শক্তির মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করে, পিতৃদেবও তাহা করিতেন—বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত করিতেন। গুরু, মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি তাঁহার এত ভক্তি ছিল যে, তাঁহার পাদপূজা পর্য্যন্ত করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। পরে এই প্রকারের পূজা পরিত্যাগ করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। তন্ত্রের বিধি বলিতে মদ্যমাংসাদি যেন কেহ না বুঝেন, কেন না তাঁহার ধর্ম্মমতের ঈশ্বর-প্রণোদিত চমৎকার উদারতা তাঁহাকে সর্ব্বদাই পাপ হইতে রক্ষা করিত। শেষ জীবনে স্পষ্টরূপে এবং জ্ঞাতসারেই চিন্ময় সৎস্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া সমুদায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। শিক্ষা দ্বারা পরিমার্জ্জিত না হইলেও মূলতঃ ঈশ্বরপ্রদত্ত উজ্জ্বল জ্ঞানই তাঁহার জীবন-পথের আলোক ছিল। এজন্যই তিনি পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি করিয়া এবং বস্তুতঃ সমাজ ও জাতির শাসন মানিয়াও অক্লেশে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে এবং যথাসাধ্য জীবনে তাহা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের জীবন সম্বন্ধীয়

যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী আমাকে বলিয়াছিলেন,তাহা নিম্নে সঙ্কলন করিলাম :—

মাতৃদেবী হইতে শ্রুত।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ ইং, শুক্রবার—"আমার বয়স যখন একাদশ কি দ্বাদশ বর্ষ, তখন আমি কর্ত্তার জীবনগত ধর্ম্মভাবপ্রবণতার বিষয় টের পাই। সেই সময় তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া একটা জনরব উঠে। কারণ তিনি রাত্রে বসিয়া সন্ন্যাস বিষয়ক কি পুস্তক পাঠ করিতেন। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কোন দিন রাত দুই কি আড়াই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণের মাহাত্ম্য সেই গ্রন্থে বর্ণিত ছিল। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখনও কখনও তিনি ক্রন্দন করিতেন। পুত্র সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, লোকের মুখে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী এ কথা শুনিতে পাইয়া পুত্রকে এক দিন বলিলেন, 'আমি জীবিত থাকিতেই কি তুই সন্ন্যাসী হইবি?' মাতার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'তুমি কেন ভয় কর? আমি কখনও সন্ন্যাসী হইব না।' আমাকে এই শ্লোকটী শুনাইয়া প্রবোধ দিতেন।

'শ্রুতিস্মৃতী ন বিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা অপরে বেশধারিণঃ ॥'"

পিতৃদেবের বয়স যখন ২৫ বৎসর, তখন তাঁহার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। তখন মাতাঠাকুরাণীর বয়স আট বৎসর ছয় মাস ছিল। বিবাহের পূর্ব্বেই বাবা 'উপদেশ' অর্থাৎ শিবমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাতৃদেবীর বয়স যখন ১৩ কি ১৪ বৎসর, তখন বাবা 'দীক্ষিত' হন, অর্থাৎ শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করেন। দীক্ষিত হওয়ার পরই ধূপ, দীপ, পুষ্প, বিল্বপত্র ইত্যাদি দ্বারা পূজা আরম্ভ করিলেন। পূজাতে খুব সময় লাগিত—কোন কোন দিন ৪ কি ৬ দণ্ড কাল পূজাতে অতিবাহিত হইত। পূজান্তে প্রত্যহ স্বীয় জননীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিতেন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া তাহা পাঠ করার অভ্যাস ও রীতি পূর্ব্ব হইতেই ছিল। শাক্তদিগের প্রথানুসারে তিনি মালা জপ করিতেন। জপ করিবারকালে তিনি স্বীয় পিতৃপ্রদত্ত স্ফটিকের মালা ও গোমুখ ব্যবহার করিতেন। তিনি এক সময় নোওয়াখালীর অন্তর্গত সুন্দ্বীপ নামক দ্বীপেতে কর্ম্ম করিতেন। তখন এক

দিবস একটা শৃগাল সেই মালা এবং গোমুখ লইয়া যায়। এই ঘটনা উপলক্ষে মালাজপ তিনি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এসময় গুরুগীতা নামক গ্রন্থ দিনে তিনবার করিয়া পাঠ করিতেন। এতদ্ব্যতীত *তন্ত্রসারনামক গ্রন্থও পাঠ করা হইত। তন্ত্রের বিধি অনুসারে যখন সাধনারম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে সাতটী বিশেষ বিশেষ স্থানে উপাসনা-কার্য্য সম্পাদন* করিতে হইয়াছিল; অর্থাৎ (১) ঘরের মেজে; (২) ছাঁচ; (৩) উঠান; (৪) বাড়ীর পঞ্চবটী; (৫) পুষ্করিণীর ঘাট; (৬) শ্মশান এবং (৭) নদীকুল। পত্নীকে প্রায় প্রথম হইতেই ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। গুরুভক্তি শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু গুরু বলিতে তিনি বিশেষভাবে ঈশ্বরকে বুঝিতেন। এজন্যই গুরুগীতা তিনি এত ভালবাসিতেন। যাহা হউক, গুরু শব্দ দ্বারা তিনি মন্ত্রদাতা গুরু এবং পরিবারস্থ গুরুজনকেও লক্ষ্য করিতেন। সন্ধ্যা, পূজা, জপ, তপ এবং গৃহকার্য্যসম্বন্ধেও সর্ব্বদা মাকে নানা উপদেশ দিতেন এবং শুদ্ধ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবার জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ করিতেন। শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং নিষ্ঠার

সহিত জপ পূজাদি করিবার জন্য সততই উপদেশ দিতেন। পূজা করিবার সময় নিজে রুদ্রাক্ষের মালা শরীরের নানা স্থানে পরিধান করিতেন। তন্ত্রোক্ত অনু-ষ্ঠান শেষ করিয়া ন্যাসনামক প্রক্রিয়া দ্বারা সাধনা-রম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটী বিশেষ ঘটনা হয়। ত্রিপুরা-ধিপের জমিদারী মধ্যে বিদ্যাকুট নামক গ্রামে যখন কাজ করেন, তখন পবিত্রা নাম্নী সাধনপরায়ণা এক সন্ন্যাসিনী তথায় বাস করিতেন। পিতৃদেব গুরুগীতা পড়েন ও ভালবাসেন, ইহা জানিয়া সন্ন্যাসিনী এক দিবস তাঁহাকে এক স্থানের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাহার ব্যাখ্যা ভালরূপ করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসিনীকে বলিলেন, "আমি তো এ স্থানের অর্থ ভাল করিয়া বুঝি না, যদি পার তুমিই ইহার ব্যাখ্যা কর।" তৎপর পবিত্রা সেই স্থানের অর্থ ও ব্যাখ্যা এমন আশ্চর্য্যরূপে এবং গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি সহকারে করিলেন যে, তিনি সেই দিন হইতে সন্ন্যাসিনী ঠাকুরাণীর সহিত আধ্যাত্মিক এক অভিনব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসিনী, পবিত্রার ন্যাসপ্রক্রিয়াসম্বন্ধীয় পারদর্শিতা, এবং তাঁহার গভীর অধ্যাত্ম বিষয়ক সদুপদেশ হইতে

পিতৃদেব তাঁহার শেষ জীবনে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছিলেন।

সংসারকার্য্যনির্ব্বাহকালে তিনি কখনও কোন প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। কেন না তিনি তদ্গতচিত্ত হইয়া সমুদায় কর্ত্তব্য পালন করিতেন, এজন্যই অনেক সময় তাঁহাকে কাজের বেলা গুন্ গুন্ শব্দে সঙ্গীত করিতে শুনা যাইত। দুর্গাপূজা, কালী-পূজা প্রভৃতি পৌত্তলিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে তিনি সংলিপ্ত থাকিলেও—এমন কি, স্বহস্তে নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া দিলেও, পরিবারের মনস্তুষ্টিসাধন ভিন্ন এ সকল কার্য্যে তাঁহার আর কোন অভিপ্রায় থাকিত না। কারণ পূজা কিংবা বলিদানের সময় তিনি কখনও সম্মুখে থাকিতেন না—উপাসনায় বসিয়া নিজের ইষ্টদেবতার আরাধনা এবং ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন।

রামকৃষ্ণ সিংহ হইতে শ্রুত।

উড়সিউড়া গ্রাম-নিবাসী আমার পিতার একজন ধর্ম্মবন্ধু রামকৃষ্ণ সিংহের নিকট যাহা শ্রবণ করিয়াছি, এস্থলে তাহা বিবৃত করিতেছি। রামকৃষ্ণ কোন সময় পিতৃদেবের ভৃত্য ছিলেন; কিন্তু পরজীবনে তিনি

পবিত্রা সন্ন্যাসিনী এবং উড়সিউড়ার কালীগির সন্ন্যা-সীর সহবাসে থাকিয়া ন্যাসপ্রক্রিয়ায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের সঙ্গে যখন রাম-কৃষ্ণের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রথম আলাপ হয়, তখন সিংহ মহাশয়ের বয়স ৪০ বৎসর; বাবার বয়স তখন ৫০ কি ৫৫ বৎসর। পিতৃদেব তখন প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্ম-মতেই সাধনাদি করিতেন। বিদ্যাকুট-গ্রামে সন্ন্যা-সিনীর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয় বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পবিত্রা জাতিতে চণ্ডালিনী ছিলেন। ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তিনি উড়সিউড়ার কালীগির সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়াছিলেন। সেই গ্রামে অবস্থানকালে কালীগিরের শিষ্য রামকৃষ্ণ সিংহের বাড়ীতে পবিত্রা বাস করিতেন। কিছুদিন পরে লোকালয় ছাড়িয়া নিকটস্থ একটা জঙ্গলের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সাধন আরম্ভ করেন। কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকেরা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করাতে, তথা হইতে বিদ্যা-কুটে চলিয়া যান। তখনই পিতৃদেবের সঙ্গে পবিত্রার সাক্ষাৎ হয়। রামকৃষ্ণ তখন বাবার সঙ্গে ছিলেন। প্রথম সাক্ষাৎসময় পিতৃদেবের সহিত সন্ন্যাসিনীর

যে আলাপ হয়, রামকৃষ্ণ তাহা এইরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন :—

পবিত্রা। "রাজচন্দ্র, তুমি তো বড় সুন্দর পুরুষ; কিন্তু তোমার নিকট যে একটী ঘুঘু-শাবক আছে, সে তোমাপেক্ষাও সুন্দর।"

রাজচন্দ্র। "সে কোথা থাকে?"

পবিত্রা। "সে থাকে তার বাসাতে।"

রাজচন্দ্র। "আমাকে উহা দেখাতে পার কি?"

পবিত্রা। "দেখ্‌তে চাইলে দেখাতে পারি।"

ন্যাসপ্রক্রিয়াকালে পবিত্রা যে আত্মাতে ঈশ্বর দর্শন করিতেন, তাহাকে তিনি "ঘুঘু-শাবক" নামে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, পিতৃদেব এবং ৺রামদুলাল মুন্সী এই পবিত্রা সন্ন্যাসিনীর নিকট হইতে ন্যাসবিষয়ে নানাবিধ উপকার লাভ করিয়াছিলেন। এই সন্ন্যাসিনীকে আমি দেখিয়াছি। তিনি অপৌত্তলিক ছিলেন এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দ্দৃষ্টি দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।

তনুত্যাগ।

পিতৃদেবের দেহত্যাগকালে পবিত্রা এবং রামকৃষ্ণ

আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। তখনকার ঘটনা রামকৃষ্ণ সিংহ এইরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন :—

"প্রথমতঃ তিনি ঔষধ সেবন করিতেন না। আমার কথায় তাহা করিতে লাগিলেন। তবু বলিয়াছিলেন 'আমি কিন্তু এবার বাঁচিব না।' সন্ন্যাসিনী বলিলেন 'যাইতে পারিবে না।' রায় মহাশয় বলিলেন 'আমি না থাকিলে তুমি রাখিবে কেমন করিয়া?' মৃত্যুর দিবস রাত্রি ছয় দণ্ড থাকিতে বলিয়াছিলেন 'প্রাতে আমি চলিয়া যাইব।' কার্য্যতঃ ঠিক সেই সময়ই যাত্রা করিলেন। আমাকে বলিলেন, 'সেই সময় আমাকে নাম শুনাইবে।' এদিকে পরিবারস্থ সকলকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার অগ্রজ ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কেবল রামকৃষ্ণের কোলে থাকিবে—ভাই-দের কোলে থাকিবে না?' তিনি তখন বলিলেন, 'আপনাদের সঙ্গে তো কেবল মায়ার সম্বন্ধ, প্রকৃত ভাই রামকৃষ্ণ।' মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমি চলিলাম, যার যা বলিবার কি করিবার থাকে, এখন বল এবং কর, কারণ এই দেখাই

জন্মের মত দেখা।' অতঃপর যাঁহাদের প্রণামাদি করিবার ছিল তাঁহারা তাহা করিলেন। অগ্রজ মহাশয় বলিলেন 'আমাকে ফেলিয়া চলিলে?' তখন প্রত্যুত্তর করিলেন, 'এ কেমন কথা, মৃত্যু বিষয়ে কি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের ভেদ বিচার আছে? যখন যার সময় উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে যাইতে হয়।' তোমার মা যখন বলিলেন, 'আপনি চলিলেন, আমাকে কি দিয়া গেলেন?' তখন উত্তর করিলেন, 'আমি এক রাজচন্দ্র চলিলাম, তুই রাজচন্দ্র (তুই পুত্র) দিয়া গেলাম, তাহাদিগকে লইয়া রাজত্ব কর, তাহাদের দিকে দেখিয়া থাক, আর নিজের কাজ কর' (অর্থাৎ পরমার্থ চিন্তা কর)। তোমার মাতার ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিলেন:—'তুমি যে ব্রতপালন করিয়াছ (অর্থাৎ ভক্ত পতির সেবায় যে ভাবে নিয়ত রত ছিলে) তাহাতে তোমার আর কোন চিন্তাই নাই—তবে যদি একান্ত ঠেকা পড়ে, তাহা হইলে রামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিবে।'" তাঁহার স্বর্গারোহণে জ্যেষ্ঠতাত মহাশয় দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। সময় মত, অর্থাৎ রাত্র প্রভাত হইবার সময় তাঁহাকে

বাহিরবাড়ীর পঞ্চবটীতে লইয়া যাইবার জন্য বার বার রামকৃষ্ণকে বলিলেন। তথায় নীত হইলে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ নাম শুনাইতে লাগিলেন। নাম শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে 'হুঁ' শব্দ দ্বারা বুঝাইতেন তিনি আপনার ইষ্টদেবতাকে দেখিতেছেন। সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেও তাহাই কহিতেন। যখন এরূপ করা শেষ হইল, তখনই প্রাণবায়ু চলিয়া গেল— "ঘুঘু শাবক" আপন কুলায়ে গিয়া আরাম ও শান্তি সম্ভোগ করিতে লাগিল।

মাতৃদেবী।

এস্থলে মাতৃদেবী মহামায়ার জীবনসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা বিধেয়। জিলা ময়মনসিংহ, পরগণা জোওয়ানসাহির অন্তর্গত অষ্টগ্রাম নামক সুবৃহৎ গ্রামে ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ সেন মহাশয় বাস করিতেন। ইনি সরাইল চুণ্টার সুবিখ্যাত বৈদ্যজাতীয় সেনবংশোদ্ভব। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তত ভাল না হইলেও তাঁহার অন্তরটা ধর্ম্মরত্নে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সচ্চরিত্র, সাধু এবং অত্যন্ত সরলচিত্ত লোক ছিলেন। পরের ইষ্টসাধন তাঁহার জীবনের মহাব্রত

ছিল। তিনি কখনও কোন ব্যক্তির প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ করিতেন না—বিনয় ও নম্রতা তাঁহার চরিত্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এই মহাশয় ব্যক্তির দুহিতা শ্রীমতী মহামায়া দেবীর সহিত আমার খুল্ল-পিতামহ ৺ অযোধ্যারাম রায় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। মাতৃদেবীকে দেখিবামাত্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন ইনিই রাজচন্দ্রের উপযুক্তা পাত্রী। কন্যার বয়স বিবাহের সময় ৮ বৎসর ৬ মাস মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার নম্রতা, বিনয়, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসকল দেখিয়া তিনি তখনই বিবাহের দিন স্থির করিয়া অনতিকালমধ্যে সেই কন্যাকে তাঁহাদের পরিবারভুক্ত করিলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, বধূকে দুহিতানির্ব্বিশেষে আদর যত্ন করিতেন। বিবাহের পর মহামায়াদেবী তিন বৎসর কাল পিত্রালয়ে বাস করিয়াছিলেন। সময়ে যখন পতির সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ হইতে লাগিল, তখন হইতেই পিতৃদেব নানা ঘটনা উপলক্ষে তাঁহাকে নানা বিষয় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পরিবারের প্রতি-মাতৃদেবীর সদ্ভাব উদ্দীপন করাই তদানীন্তন উপ-

দেশের প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য নববধূকে সর্ব্বদা সাবধান করিয়া দিয়া বলিতেন, "দেখ আমাদের এই পরিবার পাঁচ জনের। অতএব যাহাতে পাঁচ জনের মন রাখিয়া চলিতে পার, কায়মনোবাক্যে সতত সে বিষয়ে যত্নবতী হইবে।" লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের সরলা সদাশয়া আত্মজা অনেকাংশে পিতৃচরিত্র লাভ করিয়াছিলেন। ৺ রাজচন্দ্র রায় তাঁহার বয়স্যদিগের নিকট নববধূর সারল্য, বশ্যতা, সুমতি এবং সেবানিরতির ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। মহামায়ার ভাবী জীবন বহুলাংশে তাঁহার স্বামীর উপদেশ ও দৃষ্টান্তের ফলমাত্র হইলেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পিতৃচরিত্রের প্রভাব তাঁহার মনকে অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই স্বামীর উপদেশ ফলপ্রদ হইয়াছিল। যাহা হউক, পতিপরায়ণা মহামায়াদেবী স্বামীর বাক্য পালন করিয়া সর্ব্বদা পরিবারের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অচিরে সেই পরিবারও মহামায়াকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। বাহিরে ৺ রাজচন্দ্র রায়, অন্তঃপুরে মহামায়া যে পরিবারের সেবায় কায়মনোবাক্যে ব্যস্ত ও নিযুক্ত, সে পরিবার যে স্বর্গীয়

শান্তি ও সন্তোষের কিছু কিছু স্বাদগ্রহণে সমর্থ হই-বেন, তাহা বলা বাহুল্য।

১৮৮৮ সনে আমি মাতৃদেবীর সঙ্গে মাঝে মাঝে সৎপ্রসঙ্গ করিতাম। তিন চারি দিনের কথা আমার নিকট লেখা আছে; তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিলে মাতৃদেবীর আন্তরিক ধর্ম্মভাবের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

২৮শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

১। ঈশ্বরের বড় দয়া, তিনি পাপী বলিয়া আমাকে ঘৃণা করেন না, তিনি বলেন "তোকে আমি ছাড়িতে পারি না।"

২। মনই ভিতরে থাকিয়া কথা বলে, মনের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ আছে।

৩। ঈশ্বরকে আমি সর্ব্বদা দেখি—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন।

৪। আমি তপস্যা করিতে পারি না—আমি তাঁহাকেই বলিয়াছি, "তুমি আমার জন্য তপস্যা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ দাও।"

৫। বিশ্বাস, সাচ্চা (খাটী) বিশ্বাসঁচাই।

৬। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "মরিয়া আমাকে পশু পক্ষী হইতে হইবে নাকি ?" তিনি বলিলেন "না।" আমি বলিলাম, "তবে আমি কি হইব ?" তিনি বলিলেন "তুমি ঈশ্বরকে পাইবে।"

৭। ঈশ্বরকে কেহ মন্দ বলিলে আমার বুকে বড় আঘাত লাগে—তিনি বড় ভাল।

৪ঠা অক্টোবর—বৃহস্পতিবার।

মনটা এখন পীড়ার দিকে থাকিতে চায়, তবু আমি দি না। শ্মশানে শিব (মঙ্গলময় ঈশ্বর) থাকেন, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন ঈশ্বর। সংসারের কাজের জন্য আমার শরীরে জোর নাই। ঈশ্বর সব করিবেন—ঈশ্বর পড়েছেন সঙ্কটে (আমার পাপের জন্য)—শরীর বড় কাতর, ঈশ্বর সহায়তা করেন বলিয়া চলিতেছি। বাহিরের দেখায় ফল নাই—ভিতরে না দেখ্‌লে হয় না। ন্যাসের সময় আগুন দেখিয়া তাঁহার বাণীতে ভয় পাই নাই, নিজে ঠিক থাকিলে ভয় নাই, ঈশ্বরময় সংসার।

৫ই অক্টোবর—শুক্রবার।

মনোমন্দির পরিষ্কার ও প্রকাশ না হইলে এই বাহিরের মন্দিরে থাকিলে কিছু হয় না। পর কালের

বিষয় আমি কিছু জানি না। মনুষ্যের নিকট শুনিয়া একটুকু একটুকু ভয় হয়। কেননা আমার কিছু মাত্র সাধন ভজন হয় নাই। আমি ঈশ্বরকে আগে জানিলাম না। আমার স্বামী থাকিতে জানিলে তিনি আমাকে পথ বলিয়া দিতেন। যাহা হউক, আমি ঈশ্বরের পা ধরিয়া রহিয়াছি, তিনি যেরূপে হয় আমাকে লইয়া যাইবেন, আমার প্রতি তাঁর দয়া আছে; কারণ তিনি আমাকে বিশ্বাস দিয়াছেন। তাঁর কেমন দয়া মরণকালে বুঝা যাইবে, আমি তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে মরিতে চাই। আমি তাঁর কথা বুঝি না, মনে যা উঠে তাহাই বলি, মনের ভিতর থাকিয়া তিনিই কথা বলেন, মন কখনও আমাকে কুকথা বলে না। খুব খাটী হইয়া পরকালে গেলে স্বামীর সঙ্গে দেখা হইত—তবে যার উপর ভার দিয়াছি সে যদি দেখা করায়, তা হইলে হইতে পারে। পীড়ার সময় ঈশ্বরের দিকে মন গেলে বড় ঠাণ্ডা লাগে। যে ধর্ম্মে মন পরিষ্কার হয়, সেই ধর্ম্ম অনেকে বুঝে না। ধনী হইয়া ঈশ্বরকে পায় না, ইহা আমি মানি না—আমার পুত্রদের ধন আমার মনকে ফিরাইতে পারে নাই।

আমার মনটা ভাল, ঈশ্বর আমাকে ইহা দিয়াছেন। লোকে ঈশ্বরের ধর্ম্ম চায় না, চায় গয়া, কাশী ইত্যাদি ; কারণ তাহা চক্ষে দেখা যায় ও দুইটা টাকা খরচ করিলেই হয়।

১৪ই অক্টোবর—রবিবার।

১। চক্ষে যাহা না দেখা যায়, লোকে তাহা ধরে না।

২। তিনি চক্ষু ও বুদ্ধির অগোচর হইলেও আসল চক্ষু ও বুদ্ধিতে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

৩। তিনি লোকের পাছ ছাড়েন না।

৪। ভিতরে গেলে তাঁর কথা শুনা যায়—চুপ করিয়া বসিলেই শব্দ হয়।

৫। ভাবিলে দুঃখ দূর হয় না—যে দুঃখ দিয়াছে সে নিলে হয়।

পরসেবা মাতৃদেবীর জীবনের একটি বিশেষ ব্রত ছিল বলিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই ব্রত পালনে তিনি এতদূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে যতদিন শরীরে বল ছিল, ততদিন তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। আমার ব্যাবসায়িক জীবনের প্রারম্ভে এক দিবস আমি দূরস্থ কোন রোগীকে দেখিবার

জন্য অনুরুদ্ধ হই। অর্থ লালসায় নয়, নানা কর্ত্তব্য পালনের অসুবিধা নিবারণার্থ আমি রোগীর আত্মীয়কে ব্যয়বাহুল্যের ভয় দেখাইয়াছিলাম। মাতৃদেবী টাকার কথা শুনিয়া আমাকে তিরস্কারবাক্যে বলিলেন, "তুই বুঝি লোকের গলায় পা দিয়া টাকা লইবার জন্য চিকিৎসাবিদ্যা শিখিয়াছিস্।" তাঁহার মনের ভাব এই ছিল যে, আমি পরসেবার জন্য ব্যবসায় পরিচালন করিব। ইহার আনুষঙ্গিক আর একটী আন্তরিক দৃঢ়তার কথাও এস্থানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তিনি একদিকে যেমন পরের সেবা করিতে ভালবাসিতেন, আর এক দিকে নিজে অন্যের সেবাগ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন। শেষ বয়সে তাঁহার অন্তরে এরূপ একটা ভয় জন্মিয়াছিল যে, পাছে বা তাঁহাকে নিজের সেবার জন্য অন্যকে কষ্ট দিতে হয়। মৃত্যুর তিন চারি দিন পূর্ব্বেও সাতিশয় দুর্ব্বল, জীর্ণ শরীর লইয়া মল মূত্রাদি ত্যাগ জন্য শয্যা হইতে নিজে নিজে উঠিবার চেষ্টা করিতেন। এই ভাবটী তাঁহার ধর্ম্মজীবনগঠনে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিল। কিংবা প্রকৃত কথা এই ছিল যে, দীনতাই তাঁহাকে ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধীয় উচ্চতা লাভে

সূক্ষ্ম করিয়াছিল। তিনি আমার সঙ্গে যখন যখনই ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ প্রসঙ্গাদি করিতেন, তখনই আপনাকে এত নীচ, হীন বলিয়া প্রকাশ করিতেন যে, তখন বুঝিতাম, সেই অবস্থায় তাঁহার পক্ষে পরসেবা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, অন্যের সেবা না করাই অসম্ভব ছিল। তিনি নিজকে এত দীন হীন জানিতেন বলিয়াই অন্যের দোষের দিকে দৃষ্টি করিবার বড় অবকাশ পাইতেন না। নিজে ভাল নহেন বলিয়া অন্যকে মন্দ দেখেন, এই তাঁহার মনের একটী ধারণা ছিল। এজন্যই তাঁহার মুখে সর্ব্বদা হিন্দি ভাষায় এই প্রবচনটী শুনা যাইত :—"আপ্‌নে ভালা তো জগৎ ভালা"; অর্থাৎ নিজে ভাল হইলে, জগৎও ভাল। তাঁহার, দীনতার বাহ্যলক্ষণ আরো অনেক দেখা গিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা কদলীপত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া নিজ হাতে উচ্ছিষ্ট মুক্ত এবং স্থান পরিষ্কার করিতেন। তিনি কাহাকেও তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে দিতেন না। এসম্বন্ধে আত্মপরভেদবিচার করিতেন না। সুতরাং অন্যান্যের ন্যায় আমাদিগেরও প্রণাম লইতেন না। প্রণাম করিলে সকলকে যেমন, তেমন

আমাদিগকেও প্রতিনমস্কার করিতেন; এবং বলিতেন "আমাকে কেন? ঈশ্বরকে প্রণাম কর।" জীবনের শেষাবস্থায় সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিথিলতা দেখিয়া মনে মনে বড় কষ্ট অনুভব করিতেন। বাস্তবিক তিনি যে পরিবারের মধ্যে পালিতা ও শিক্ষিতা হইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় আধুনিক সামাজিক বিচ্ছিন্নভাব ও ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আসুরিক বলিয়া মনে হইত। আধুনিক লোকদের স্বাতন্ত্র্য ও সহানুভূতি-হ্রাস-বিষয়ে আলাপ হইলে তিনি প্রায় সর্ব্বদাই বলিতেন যে, "ওরে ওরে ভাই রে, যার যেমনে তর রে," এই হয়েছে আজ কালের ধর্ম্ম। পিতৃদেবের উপদেশ, দৃষ্টান্ত এবং সহবাসে তাঁহার ধর্ম্মজীবন খুব উন্নত হইয়াছিল। বাবার ন্যায় তিনিও সামাজিকবিপ্লব সংঘটনের বিরোধী হইলেও জাত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার প্রাচীন কুসংস্কার দূর হইয়া গিয়াছিল। এজন্যই তিনি আমার আচার ব্যবহার দেখিয়া কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। বরঞ্চ প্রসন্নচিত্তে ক্ষমা করিয়া আমার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে স্বজাতীয়ের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন; বাবার ন্যায় তাঁহার ধর্ম্ম অপৌত্তলিক

ছিল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। এবং আমাদের সামাজিক উপাসনা বড়ই ভালবাসিতেন। এক দিবস কার্ত্তিকেয় অমাবস্যার নিশীথ উপাসনাতে ক্রন্দন করিতে করিতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আমি বাড়ীতে গেলে নিজে নিজে যে উপাসনা করিতাম, প্রায় সর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত তাহাতে যোগ দান করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের গ্রন্থাদি তাঁহার নিকট এত ভাল লাগিত যে, স্বাধীনভাবে যখন ইচ্ছা তখন তাহা পাঠ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বয়সে চশমা নাকে দিয়া বাঙ্গালা ভাষা অভ্যাস করিয়াছিলেন। আমার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বিনোদমণিকে নবসংহিতা মতে বিবাহ দিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মা এই বিবাহে তুমি তুষ্ট হইয়াছ কি?" তিনি উত্তর করিলেন "কি! কেবল আমি কেন? ঈশ্বর স্বয়ংই তুষ্ট হইয়াছেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি জানিলে কেমন করিয়া?" তিনি বলিলেন, "বিবাহের পূর্ব্বের দিন উপাসনাকালে শ্রীমতীর মুখে যে স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই

আমার নিকট করুণানিলয়ের সম্মতি জ্ঞাপন করিল।"

ঈশ্বরের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন, এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ভগবান্ তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। কারণ মৃত্যুর এক দিন পূর্ব্বেও আমার উপাসনাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিবার জন্য যত দূর সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ বাক্য অতি সুন্দর একটী প্রার্থনা। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমাদের আত্মীয়া কোন একটী বৃদ্ধা নারী মাতাঠাকুরাণীকে ধর্ম্মের কিছু উপদেশ দিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। মা বলিলেন "আর কি বলিব? পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছি, সেই মত চলিলেই হইবে।" বৃদ্ধা বলিলেন, "তবু আর একটী আধটী কথা বলিয়া যাউন।" মা বলিলেন, "সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও।" বৃদ্ধা আবার বলিলেন, "কিরূপে প্রার্থনা করিব তাহা দেখাইয়া দিন।" কিরূপে প্রার্থনা করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন জন্য হাত জোড় করিয়া তিনি এই প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করি-

লেন,—"ঈশ্বর তুমি আমার তালাস লইও।" এই শেষ প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করিয়া তিনি আর শারীরিক ভাবে কাহারও সহিত বাক্যবিনিময় করেন নাই।

৺ রাজচন্দ্র রায়ের সন্তানগণ।

৺রাজচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাত সন্তান হইয়াছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা স্বর্গীয়া দেবী শ্রীমতী হরসুন্দরী। তিনি ১১ কিংবা ১২ বৎসর বয়ঃক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন। আমি তাঁহার অব্যবহিত কনিষ্ঠ। আমার কনিষ্ঠা আর একটী ভগ্নী জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু সূতিকাগৃহেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ দ্বিজদাস রায় ঈশ্বর-কৃপায় এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার চারিটী কন্যা এবং তিনটী পুত্রসন্তান বর্ত্তমান। তিনি বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার উদাসীনের ভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী পুত্রগণ লইয়া সংসার ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। শ্রীমান্ দ্বিজ দাসের কনিষ্ঠ যমজ দুইটী ভাই জন্মেন। একজন সূতিকাগারে দেহত্যাগ করেন। অপরজন—স্বর্গীয় শ্রীমান্ সর্ব্বদাস—আড়াই কি তিন বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দেহভার

পরিমুক্ত হন। তৎপর আর একটী ভাই হইয়া সুতিকা-গৃহেই দেহত্যাগ করেন।

নিজ সন্তানের পরিচয়।

শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন আমার চতুর্থ পুত্র এবং পঞ্চম ও শেষ সন্তান। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ যোগেশ-রঞ্জন,—যাঁহাকে আমরা 'টুনু' বলিয়া ডাকিতাম,—ইংরেজী ১৮৬৫ সালের ৭ই জুন বুধবার, মাধ্য-প্রাদেশিক নাগপুর সহরে ভূমিষ্ঠ হন; এবং ১৮৬৭ সনের জুন কি জুলাই মাসে আমার জন্মস্থান ও পৈতৃক বাসভূমি গুতাউড়া গ্রামে হামরোগগ্রস্ত হইয়া পর-লোক গমন করেন। শিশুটী এই অল্প কাল মধ্যেই এত সদ্‌গুণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা এই দীর্ঘকাল মধ্যেও আমি ভুলিতে পারি নাই। বাস্তবিক শ্রীমান্ দীনেশ পরে যে চরিত্র দেখাইয়া গেলেন, শ্রীমান্ যোগেশের শিশুজীবনে আমি তাহারই অঙ্কুর দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই শিশুর মৃত্যুতে আমি বহুদিন পর্য্যন্ত নিদারুণ শোক-যাতনা ভোগ করিয়াছি। শোকের অন্যতর একটী কারণ এই ছিল যে, দূরস্থ পল্লি-গ্রামে অবস্থিতিনিবন্ধন রুগ্নাবস্থায় সমুচিতরূপে তাহার

চিকিৎসা হইতে পারে নাই। সত্য বটে, নিকটস্থ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সব্‌ডিবিজনের নেটিব্ ডাক্তার সাধ্যানুসারে চিকিৎসা করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার পক্ষে ইহাতে তুষ্টিলাভ না করিবার বিশেষ কারণ আছে। যাহা হউক, আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেশরঞ্জন ১৮৬৬ সালের ২৭শে অক্টোবর নাগপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখন ঢাকা নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ পরেশরঞ্জন ১৮৭০ সনের ২১শে ডিসেম্বর নাগপুরে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি এখন লাহোর মেডিকেল্ কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন। চতুর্থ সন্তান একটী কন্যা। তাঁহার জন্মদিন ১৮৭২ সনের ৮ই জানুয়ারি ; এবং জন্মস্থান নাগপুর। জেলা ঢাকা, পরগণা মহেশ্বরদির অন্তর্গত ভাটপাড়া নিবাসী সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের সহিত শ্রীমতী বিনোদমণি নাম্নী আমার এই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। কৃপাময়ের শুভ আশীর্ব্বাদে তিনি এখন স্বামী, দুহিতা এবং দুইটী পুত্র লইয়া স্বামি-গৃহে বাস করিতেছেন।
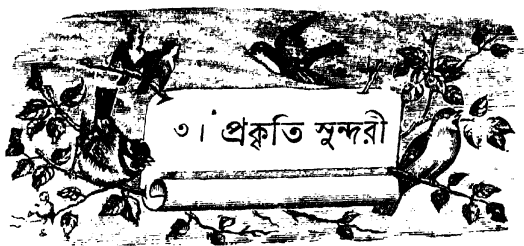
শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন।

শৈশব ও কৌমার।
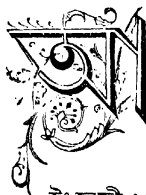
আমার কনিষ্ঠ পুত্র, স্নেহের আধার শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন রায়ের জন্মস্থানও মধ্যপ্রদেশসমূহের রাজধানী বা প্রধান নগর সুপ্রসিদ্ধ নাগপুর নগর। তিনি ইংরেজী ১৮৭৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ঘন গভীর অন্ধকারে পরিবৃত আমার দীন মলিন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তৎপর ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণকালের তরে এই পরিবারকে স্বর্গের আলোক দেখাইয়া বিগত ১৮৯৬ সনের ২রা মার্চ্চ সোমবার পূর্ব্বাহ্ন ৬

ঘটিকার সময়, বিহারপ্রদেশীয় সাহাবাদ জিলার প্রধান নগর আরা নামক স্থানে দেহভারপ্রমুক্ত হইয়া চির-শান্তিনিলয় শ্রীমতী আনন্দময়ী মার স্নেহক্রোড়ে জন্মের মত লুক্কায়িত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীমানের পার্থিব জীবনের পরিমাণ অতি অল্প—২২ বৎসর, ২ মাস, ১৯ দিন মাত্র। তন্মধ্যে শেষ জীবনের প্রায় তিন বৎসর কাল রোগ-শয্যায় অতিবাহিত হয়। অবশিষ্ট ১৯ বৎসর মধ্যে বাল্যকালের ৫ বৎসর বাদ দিলে, তাঁহার ঐতিহাসিক জীবন প্রকৃতার্থে ১৪ বৎসর মাত্র। এই কালের সমগ্রভাগই বিদ্যাধ্যয়নে ব্যয়িত। সুতরাং দীনেশের চরিতালেখ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা পাওয়ার প্রত্যাশা অত্যল্প। বাস্তবিক শ্রীমানের জীবন সামান্য একটী প্রাত্যহিক ব্যাপার বৈ আর কিছুই নয়। তবে কি না, তাহাতে কিছুটা বিশেষত্ব আছে। শ্রীমানের ঐতিহাসিক সমগ্র জীবনই ঢাকাস্থ নববিধানপরিবারের ভিতরে যাপিত এবং তাঁহার স্বর্গীয় প্রভাবে গঠিত। এই সামান্য জীবনে পবিত্র নব-বিধানের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ কিয়ৎপরিমাণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল বলিয়াই উহা ইতিহাসের বিষয় হইয়াছে।

এবং তজ্জন্যই শ্রীমান্ দীনেশের জীবনসম্বন্ধীয় ঘটনা সকল লিপিবদ্ধ করা আমার পক্ষে একটী গুরুতর কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

শৈশব।

শ্রীমান্ দীনেশের শৈশবাবস্থা শ্রীমতী বিনোদমণি এবং শ্রীমান্ পরেশের বাল্যজীবন হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। তাঁহারা দুই জনেই অতি শিশুবয়সে মাতৃস্তন্য লাভে বঞ্চিত ছিলেন। এতন্নিবন্ধন তাঁহারা উভয়েই বিশেষতঃ বালকটী প্রায়শঃ পীড়িত থাকিতেন। সুতরাং তাহারই জন্য এই দুইটী সন্তানের সঙ্গে আমার একটুকু বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। শ্রীমান্ মাতৃ-স্তন্যলাভ সম্বন্ধে তাঁহার মেজদাদা ও দিদি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যশালী ছিলেন—তিনি মাতারই দুগ্ধে পোষিত এবং মাতৃক্রোড়েই লালিত ও পরিপালিত। কাজেই দীনেশ মাতৃবৎসল ছিলেন। তিনি ভগবানের কৃপায় এবং নাগপুরের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুপ্রভাবে দিন দিন সবল, পরিপুষ্ট এবং বর্দ্ধিতকায় হইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার জন্য আমাকে বিশেষরূপে কোন প্রকারের উদ্বেগগ্রস্ত হইতে কিংবা কষ্ট সহ্য করিতে হয়

নাই। এইরূপে তাঁহার বয়স ১ বৎসর পূর্ণ হইল। কিন্তু ১৮৭৫ সনের মে মাসে আমি যখন নাগপুর মেডিকেল্ স্কুল হইতে ঢাকা মেডিকেল্ স্কুলে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসি, তখন পথিমধ্যে গ্রীষ্মাতিশয্যপ্রযুক্ত শ্রীমানের শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়। তজ্জন্য আমাকে পরিবার সহ বাঁকিপুরে পাটনা মেডিকেল্ স্কুলের তদানীন্তন অন্যতর একজন অধ্যাপক আমার প্রাচীন বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষের বাড়ীতে ৮।৯ দিন অবস্থিতি করিতে হয়। দয়াময়ের অপার করুণায় শ্রীমান্ আরোগ্য লাভ করিলেই আমি ঢাকাতে চলিয়া আসি।

শ্রীমান্‌কে আমরা 'ভুতু' বলিয়া ডাকিতাম। দীনেশরঞ্জন নামটী বোধ হয় আমার পূজনীয়া মাতৃ-দেবী মনোনীত করিয়াছিলেন। ভাবিজীবনের চরিত্র-গত দীনতা শ্রীমানের পক্ষে এই নামটী সুসঙ্গত বলিয়াই সপ্রমাণ করিয়াছে। আমার এক জন বন্ধু এবং পূর্ব্বতন ছাত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় শৈশব-কালে শ্রীমান্‌কে জানিতেন, তিনি 'ভুতু' নাম সম্বন্ধে এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন:—"তাহার স্থিরপ্রকৃতি এবং শান্তভাব দেখিয়া আহ্লাদে 'ভুতু' বলিয়া আমি

তাহাকে ডাকিতাম।" যাহা হউক, এই উভয় নামে যদিও শ্রীমানের ভাবী চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথাপি ইহা বলা কর্ত্তব্য যে শ্রীমানের নামমনোনয়নকার্য্যে আমাদের যে টুকু সম্বন্ধ ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে আকস্মিক বৈ আর কিছুই নহে।

ঢাকায় আসিবার পর শ্রীমান্ দীনেশের অবস্থা কিছুকাল পূর্ব্বের মতই ছিল। কিন্তু ১৮৭৬ সনের মধ্যভাগে শ্রীমানের মানসিক অবস্থাতে একটী পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। দীনেশ যে অগ্রজ শ্রীমান্ পরেশ ও অগ্রজা শ্রীমতী বিনোদমণির ন্যায় ততটা পিতৃবৎসল ছিলেন না, তাহার কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময় হইতে সেই ভাবের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইতে লাগিল—শ্রীমান্ আস্তে আস্তে আমারই প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘনিষ্ঠতা যখন অনুভব করিতে লাগিলাম, তখন অনেক সময় আমার মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইত—দীনেশ কেন এখন আমার দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন? বলা বাহুল্য, সেই সময় আমি এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রাপ্ত হই নাই।

মাতৃহীনাবস্থা।

১৮৭৬ সনের ৩১শে অক্টোবর প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ও ভীষণাকার জলপ্লাবন সমুপস্থিত হইয়া যে রাত্রিতে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে অসংখ্য অসংখ্য পরিবার মধ্যে মৃত্যুশোকের ঘোর আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল, সেই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীতে এ দীনের পরিবারমধ্যে এমন একটী ঘটনার সূচনা হইল, যাহার পরিণাম আমার পক্ষে আর একটা পরিপ্লাবক ঝটিকা হইয়া দাঁড়াইল। ঝড় বৃষ্টির বেগ দেখিয়া আমরা আশঙ্কা করিতেছিলাম একদিক্ দিয়া, ভগবান্ বিপ্লব আনয়ন করিলেন আর একদিক্ দিয়া। সেই ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন পরিপূর্ণ তামসীতে আমার স্ত্রী, দেবী শ্রীমতী রাসমণি দুর্দ্দান্ত বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন, এবং তৎপর সপ্তাহকাল মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭৬ সনের ৪ঠা নবেম্বর চারিটী সন্তানকে মাতৃহীন করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। একেত পত্নীবিয়োগের শোক, তাহাতে আবার ধর্ম্মবলের অপ্রাচুর্য্য ; এই

অবস্থায় মাতৃহীন অপগণ্ড শিশুগণ লইয়া স্থির থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত দুষ্কর ব্যাপার হইয়া উঠিল। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজও তখন ভিতরের দিক্ দিয়া ততটা উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই; সমাজে যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মের স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে তখন আমার ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই। ফলে অবিশ্বাসনিবন্ধন আমার তদানীন্তন ধর্ম্মের ভাব অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। দূরস্থ মধ্যপ্রদেশ হইতে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজকে যে ভাবে কল্পনার বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছিলাম, চক্ষে তাহা দেখিতে না পাইয়া, আমার ন্যায় চঞ্চলচিত্ত লোকের পক্ষে ভগবানের চরণে পড়িয়া থাকা সুদূরপরাহত হইল। সুতরাং স্ত্রীর মৃত্যু আমাকে কিছু কাতর করিল। এই অবস্থায় হঠাৎ এক দিবস অন্তর হইতে ভগবদ্বাক্য গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিল :—"তুই কেন নিরাশ্বাস হইতেছিস্? এই যে তোর রাসমণি আমার ক্রোড়ে বসিয়া আছে।" চক্ষু খুলিল—আশা বিশ্বাসে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে—ভগবদ্বাক্য শ্রবণমাত্রই, আর একটা বিষয় মীমাংসা হইয়া গেল। যদিও বহুদিন

হইতে আমি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক কার্য্য করিয়া আসিতেছিলাম, তত্রাপি আমার স্বর্গগতা স্ত্রীর শ্রাদ্ধ হিন্দুমতে কি ব্রাহ্মমতে করিব, তদ্বিষয়ে আমার মনে একটা দোদুল্যমানতা উপস্থিত হইল। কিন্তু ভিতরের সেই বাণী তিরস্কার করিয়া বলিল, "ব্রাহ্ম হইয়া তুই বুঝি পৌত্তলিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে বিদ্রূপ করিবি, কপটাচরণ দ্বারা বুঝি স্বর্গগতা স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবি?" এই তিরস্কার বাণীতেই সব গোল মিটিয়া গেল। শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইল।

প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রয়োজনানুরোধে মূল বিষয় ছাড়িয়া একটুকু অপ্রাসঙ্গিকতায় যাইতে হইল। যাহা হউক, মাতৃ-বিয়োগের সময় শ্রীমান্ দীনেশের বয়ঃক্রম ২ বৎসর ১১ মাস হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাতার স্বর্গা-রোহণের কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে শিশু দীনেশ ক্রমে ক্রমে আমার প্রতি অনুরক্ত হইতেছিলেন। এই ঘটনাটী সেই সময় আমার নিকট আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বাস্তবিক তখন আমি ইহার তাৎপর্য্য

কিছুমাত্র পরিগ্রহ করিতে পারি নাই। দেবী রাসমণি আমাদিগকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করিয়া লোকান্তরে চলিয়া গেলে পর ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। দয়ার সাগর পরম পিতা বালকের অন্তরস্থ মাতৃবিচ্ছেদের দুঃসহ যাতনা লাঘব করিবার মানসে যে তাঁহাকে ধীরে ধীরে আমার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছিলেন, তাহা এখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় শেষ পর্য্যন্ত শিশু যদি মাতারই অনুরক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে হঠাৎ মাকে হারাইয়া শিশুকে যে কি যাতনাই সহ্য করিতে হইত, তাহা ভাবিতেও কষ্ট বোধ হয়। যাহা হউক, ভগবানের এই বিশেষ বিধান মাহাত্ম্যে পরেশ ও বিনোদমণির ন্যায় দীনেশও আমাকে পাইয়া মাতার অভাব যথাকথঞ্চিৎ রূপে ভুলিতে পারিলেন। বাস্তবিক শিশুর বয়স ও পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিলে ইহাই বলিতে হইবে যে, ভগবানের এই বিশেষ কৃপা ব্যতীত শ্রীমান্ কিছুতেই এই মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতেন না। বাহ্য ভাবে অন্তরের যাতনাচিহ্ন জাজ্বল্য-রূপে প্রকাশ না পাইলেও, মাঝে মাঝে শ্রীমান্ যে "মা কৈ?" বলিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা-

তেই বুঝিতে পারিতাম ভিতরে ভিতরে মার জন্য কতকটা আকর্ষণ ছিল। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দান কালে "মা স্বর্গধামে আনন্দময়ী জননীর কোলে আছেন," এ ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারিতাম না। শিশু দীনেশ কি জানি কি বুঝিয়া কি ভাবিয়া এই উত্তর পাইয়াই তুষ্ট থাকিতেন।

দুঃসহ দুঃখ যাতনায় নিপতিত মাতৃহীন শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণসম্বন্ধে আমাকে সমধিক পরিমাণে উৎকন্ঠিত হইতে হইয়াছিল। আমার ধর্ম্মভাব যে সেই সময় বিলক্ষণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয় উপরে লিখিত হইয়াছে। শিশুগণসম্বন্ধে কথায় কথায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নিকট এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, তাঁহাদিগকে দেশে আমাদের পরিবারের মধ্যে রাখিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব। আনন্দ বাবু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, হিন্দু পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মের সন্তানগণকে রাখা কোন মতেই ধর্ম্মের অনুমোদিত কার্য্য নয়। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য জন্মিল, শিশুগণকে বাড়ী পাঠান হইল না। এ দিকে আমি যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সমুদায় পরি-

বার লইয়া ঢাকাতে আসিয়া বাস করিতে লিখিয়াছিলাম, তিনিও সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সুতরাং আমি নিজেই শিশুদের লালনপালনের ভার লইলাম। এসম্বন্ধে আমার স্বর্গগতা মাতৃদেবী এবং বড় খুড়ী ঠাকুরাণী বহু দিন পর্য্যন্ত আমার সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার জ্ঞাতি, বাল্যসখা, বহুদিনের সঙ্গী, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ হরিশ্চন্দ্র রায় এবিষয়ে আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের সাহায্য এবং করুণাময়ের করুণাবলে শিশু দীনেশকে লইয়া আমি কিছুকাল একপ্রকার নিরুদ্বেগে অতিবাহিত করিলাম। দীনেশ বিশেষ ভাবেই ভাল ছিলেন। তাঁহার শারীরিক কোন অসুস্থতা দেখিতে পাওয়া যায় নাই, মানসিক অবস্থাও বড় মন্দ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে অকস্মাৎ মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া তিন বৎসরের শিশু যে, সম্পূর্ণরূপে অবিচলিতচিত্ত থাকিবে, তাহা কখনও হইতে পারে না। প্রেমময়ী জননীর প্রাতিবিধানিক ব্যবস্থায় শিশু দীনেশকে মার জন্য অধিক চিন্তা না করিতে হইলেও "মা কৈ ?" বলিয়া যে সময় সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহাতেই জানা

যায় যে শ্রীমান্ মার জন্য চিন্তা করিতেন। যাহা হউক কৃপাময়ীর কৃপায় এই রূপে দুই কি আড়াই বৎসর চলিয়া গেল। আমরা কেহই শ্রীমানের জন্য বিশেষ কষ্ট ভোগ করি নাই।

কৌমার।

তৎপর শ্রীমানের বয়স যখন ৫ কি ৬ বৎসর, তখন একবার তাঁর উদরাময় রোগ উপস্থিত হইল। এই রোগে তিনি কিছু অধিক কাল—প্রায় একবৎসর কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। যথাবিধি চিকিৎসার ত্রুটি না হইলেও তাহাতে স্থায়ী ফল পাওয়া যায় নাই। অবশেষ কিছু কাল নৌকায় বাস করাতে পীড়া দূর হইল। আরোগ্য লাভ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার শরীরের প্রাকৃতিক গঠনানুসারে এই দীর্ঘকালস্থায়ী পীড়ার ফলও অপেক্ষাকৃত কষ্টদায়ক হইয়াছিল। যদিও ভোগকালের দীর্ঘতা ব্যতীত রোগের অন্যান্য অবস্থা ভালই ছিল, তথাপি যিনি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও শীর্ণ, তিনি যে সংবৎসরকালস্থায়ী উদরাময় রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া মাত্রই প্রকৃতিস্থ হইবেন, এমন আশা করা যায় না। প্রত্যুতঃ রোগমুক্ত হইলেও কিছুকাল দুর্ব্বলতাদি

দ্বারা তিনি উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পরিণামে শ্রীমান্ পূর্ণ সুস্থতা লাভ করিয়া ভগবানের কৃপায় আবার স্বাভাবিক জীবন যাপনে সমর্থ হইলেন।

রোগগ্রস্ত হইলে আমার সকল সন্তানের‌ই এই গুণটী ছিল যে, তাঁহারা যেমন ঘন ঘন পীড়িত হইতেন, এবং পীড়িত হইয়া দীর্ঘকাল যাতনা ভোগ করিতেন, তেমনি আবার ঔষধসেবনে অনিচ্ছা বা আপত্তি ছিল না। ঔষধ যতই কেন বিস্বাদু হউক না অম্লান বদনে তাহা সেবন করিতেন। দীনেশের প্রাকৃতিক এই গুণের সঙ্গে তাঁহার স্বভাবের পশ্চাল্লিখিতস্ব অপরবিধ সদ্‌-গুণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এস্থলে তাঁহার এই স্বভাবটীর কথা উল্লেখ করিলাম।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে শ্রীমান্ নানা প্রকারের বাল্য-খেলায় মনোনিবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মার্‌বেল্ খেলা ও ঘুড়ী উড়ান অনেক সময় আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। কারণ এতদুভয়েতেই শিশু দীনেশের অঙ্গ পরিচালনায় আমি একটী বিশেষ লালিত্য দেখিতে পাইতাম। সন্তানবাৎসল্য আমার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে ইহা জানিয়াও আমি

বলিতেছি দীনেশের ক্রীড়নমধ্যে চমৎকার মাধুর্য্য দেখিতে পাওয়া যাইত। বলা বাহুল্য এই লালিত্য শিক্ষালব্ধ নয়, প্রকৃতির অযাচিত দান। শ্রীমান্ দীনেশের শরীর খর্ব্বচ্ছন্দ ছিল; তাহাতে আবার দীর্ঘকালস্থায়ী রোগের পারিণামিক শীর্ণতা। শিশু দীনেশ ক্রীড়ার সময় তাঁহার এই ক্ষুদ্র দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত, পদ, অঙ্গুলী, মস্তক, চক্ষু, গ্রীবা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলিকে এমনি ভাবে পরিচালিত করিতেন যে, তাহা যেমন এক দিকে উদ্দেশ্যসাধনপক্ষে প্রায়শঃ অব্যর্থ হইত, তেমনি আর একদিকে দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হইত। প্রকৃতির লীলা সর্ব্বত্রই চিত্ত-বিমোহন। কিন্তু মানবের মধ্যে সেই লীলা, সেই স্বভাবের কার্য্য আরো সুন্দর। জড় হইতে প্রাণ (life), প্রাণ হইতে মন (mind) যত উচ্চ, প্রকৃতির অপরবিধ ক্রীড়াভূমি অপেক্ষা সচেতন বা মনো-নিবাস নরশরীরে যে সৌরম্য দৃষ্ট হয়, তাহা তত উৎকৃষ্ট। পরিস্ফুটনের সময় দেহযন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া মন যে প্রকৃতির পরিচালনায় কার্য্য করিতে থাকে, দেখিতে তাহা বাস্তবিকই অতি মনোহর। ক্রীড়াকালে

শিশুগণকে এক একটী উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কত কৌশলই না অবলম্বন করিতে হয়! 'স্বাধীন ইচ্ছা' (free will) বিকশিত জীবনের যেমন উপদ্রবসংঘটিকা একটী শক্তি, বিকাশোন্মুখ মনেরও (mind's) তেমনি। এই 'স্বাধীন ইচ্ছা' যাহাঁর জীবনে যে পরিমাণে প্রকৃতির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভে সুসমর্থা—অর্থাৎ প্রকৃতির নির্দ্দেশে যাহার 'স্বাধীন ইচ্ছা' প্রাকৃতিক বিপ্লবকারী অন্তরস্থশক্তি-নিচয়কে বশীকরণে সুপারগ—সেই মানব তদনুরূপই জগন্মাতার গূঢ় মঙ্গলাভিপ্রায় সংসাধনে তাঁহার অনুচর সহচর হইয়া জীবন সার্থক করিতে পারে। এই মাত্র বলা হইল, খেলার সময় কত যত্ন, কত চেষ্টা করিয়া শিশুগণকে ক্রীড়নসম্বন্ধীয় এক একটী উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়। সকল শিশুরাই খেলা করিয়া থাকে; কিন্তু কয়টী শিশু খেলাতে পটুতা লাভ করিতে পারে? বলিতে হইবে ইহাদের সংখ্যা স্বল্প। শ্রীমান্ দীনেশ খেলা ভালবাসিতেন এবং খেলাতে বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, ক্রীড়াকালে শ্রীমানের অতি সুন্দর অঙ্গবিন্যাসভঙ্গির কথা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে।

ফলতঃ শিশু দীনেশ প্রকৃতির হস্তযন্ত্র হইয়া মার্বেল্ প্রভৃতি খেলাতে লক্ষ্যের দূরতানুসারে হস্ত, পদ, মস্তক, চক্ষু, গ্রীবাদিকে যে ভাবে, যে ভঙ্গিতে বিন্যাস করিলে লক্ষ্যসাধনে কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায়, ঠিক সেই ভাবে তাহা করাতেই শ্রীমান্ সর্ব্বদা সিদ্ধমনোরথ হইতেন, এবং এজন্যই তিনি খেলাসম্বন্ধে বয়স্যগণ মধ্যে একজন কৃতী বালক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কৌমারাবস্থায় শ্রীমান্ দীনেশের চরিত্রগত আর একটী ভাব আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। পরিধানের জন্য শ্রীমান্‌কে যে সকল বস্ত্র ইত্যাদি দেওয়া যাইত, তাহার মধ্যে ভাল ভাল যেগুলি, তিনি সেই গুলিই বিশেষরূপে মনোনীত করিতেন। সুন্দর সুন্দর সরু ধুতি চাদর যাহা 'পোষাকি'রূপে ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত হইত, সর্ব্বাগ্রে তিনি তাহাই ব্যবহার করিতেন। সেগুলিকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে একবার ব্যবহারের জন্য পাইলে আর তাহা ছাড়িতেন না, ছিঁড়িয়া না গেলে—কাপড় ছিঁড়িতে বড় বেশী সময়ও লাগিত না,—তাহা আর কেহ ছুঁইতেও পারিত

না। এইরূপে ক্রমশঃ যত বয়স হইতে লাগিল, ততই বেশভূষার দিকে শ্রীমানের রুচি প্রধাবিত হইতে লাগিল। বেশভূষায় রুচি যাইতে লাগিল বলিলাম বলিয়া কেহ মনে করিবেন না শ্রীমানের বিলাসিতা বাড়িতে লাগিল। এ সম্বন্ধে শ্রীমানের একজন বয়স্থ এইরূপ লিখিয়াছেন :—

"পোষাক বিষয়ে তিনি বেশ simple (শাদাশিদা) এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিলেন। প্রায়ই বেশ শাদা-শিদে পোষাক পরিতেন, এবং তাহাই যত দূর পারিতেন পরিষ্কার রাখিতেন। কখনও কোন পোষাকের জাঁকজমক করিতেন না।" বাস্তবিক পরিচ্ছদের প্রতি দীনেশের এই স্বাভাবিক অনুরাগ তাঁহার ভাবী চরিত্রের গতি পরিজ্ঞাপক বলিয়া এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল। প্রারম্ভে সুন্দর সুন্দর ধুতিচাদর হইলেই চলিত; কিন্তু ক্রমে যেমন বয়স অধিক হইতে লাগিল, তেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিধেয় যাবতীয় বস্তুর দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এখন ভাল ধুতি, ভাল চাদর, সুন্দর জামা, সুন্দর কোট্, সুন্দর জুতার প্রয়োজন পড়িল। ধীরে ধীরে নিজ শরীরের দিকে দৃষ্টি যাইতে

লাগিল। অঙ্গপরিমার্জ্জন, কেশবিন্যাস এবং গাত্রে সুগন্ধিলেপন ক্রমে ক্রমে নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িল। অথচ এ সমুদায়ের মধ্যেই সুস্পষ্ট নৈসর্গিকতা পরিদৃষ্ট হইত—ইহার কিছুতেই পরিষ্কার পরিপাটী থাকিবার ইচ্ছা ভিন্ন বাবুগিরির কোন ভাব দেখা যাইত না।

কৈশোর।

সুরুচি।

শ্রীমান্ দীনেশের বয়ঃক্রম এখন দ্বাদশ বর্ষ হইতে চলিল। এসময় তাঁহার রুচিসৌষ্ঠব আর এক দিক্ দিয়া প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। শ্রীমানের রুচিসম্বন্ধীয় ভাবনা এখন স্বার্থের বাহিরে কার্য্যক্ষেত্র পাইল। মাতার অভাব এবং আমার এতদ্বিষয়ক ঔদাসীন্য শৃঙ্খলাপ্রিয় দীনেশকে কোমল বয়সে গৃহাদি সুসজ্জিত রাখিতে বাধ্য করিয়াছিল। সময় এবং সাধ্যে যত দূর কুলাইত, শ্রীমান্ নিজের দ্রব্যাদি সাজাইয়া বিশেষ ভাবে যে

দ্রব্যগুলি আমার তাহাও গুছাইয়া রাখিতেন। ফলে শ্রীমানের সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং শৃঙ্খলাপ্রিয়তা যতই পরিপক্কতা লাভ করিতে লাগিল, ততই তাহা আমার আনুকূল্যে বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিল। তাঁহার অনতিদীর্ঘজীবনের শেষ কয়েক বৎসর তাঁহার স্বাভাবিক এই দুইটী এবং আর কয়েকটী গুণ আমার সাহায্যার্থে এত অধিকপরিমাণে তিনি ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে আমার গৃহকার্য্যের বিশৃঙ্খলতা বহুলাংশে বিদূরিত হইল ; অথচ সংসারের এই সকল কার্য্য করিতে তাঁহাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার কিংবা অধিক সময় নষ্ট করিতে হইত না। কারণ স্বাভাবিক প্রবেশশক্তির প্রচুরতানিবন্ধন তিনি সহজেই এ সকল কাজ সম্পন্ন করিতে পারিতেন। স্বচিন্তার সীমাতিক্রম করিবার কাল হইতেই শ্রীমানের দৃষ্টি আস্তে আস্তে আমার দিকে পড়িতে লাগিল। আমার কাগজ পত্র, মস্যাধার, লেখনী প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিতে আরম্ভ করিয়া, তারপর বস্ত্র, শয্যা, শয়ন-কামরা ইত্যাদি সাজাইবার ভার লইলেন, এবং অবশেষ টাকা কড়ি ইত্যাদির দায়িত্ব লইয়া আমার সংসারের প্রায় সমুদায়

কার্য্যই তিনি নিজে চালাইতে লাগিলেন। অর্থব্যয়-সম্বন্ধে অল্প বয়সেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার বিচক্ষণতা লাভ হইয়াছিল। আমি নিজে খুব ব্যয়কুণ্ঠ; কিন্তু আমার ব্যয়কুণ্ঠতা সময় সময় সীমান্তে যাইয়া পৌঁছে, তাহাতে অনেক সময় নানা প্রকারের বিভ্রাট উপস্থিত হইয়া আমার ব্যয়কুণ্ঠতা পরিণামে অমিতব্যয়িতার আকার ধারণ করে। যখন শ্রীমান্ ব্যয় চালাইতে লাগিলেন, এমন দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেন যে, তাহাতে তাঁহার সদ্‌বিবেচনার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইত। তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহের পারিপাট্য দ্বারা এক দিকে যেমন কার্য্যের সুবিধা হইত, অপর দিকে তেমনই ব্যয়সঙ্কোচও বিলক্ষণ দেখা যাইত। ফলে এ সকল বিষয়ে শৃঙ্খলাপ্রিয়তা ও সৌন্দর্য্যানুরাগই বহুলাংশে শ্রীমানের চরিত্রগঠনের সহকারী হইয়াছিল।

সদ্দৃষ্টান্ত।

আমি ইং ১৮৭৫ সনের মে মাসে ঢাকাতে আসি। তথায় তখন 'কৈশব' ব্রাহ্মধর্ম্ম কিঞ্চিৎ গৌরবলাভ করিয়াছিল। এই বিশেষণটী মূলে বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত' হইলেও, লোকে 'কৈশব' ব্রাহ্মদলকে কিয়ৎপরিমাণে

সম্মান ও প্রতিপত্তি প্রদান করিত। কারণ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতীয় সংগ্রামে নৈতিক বিবেক যখন জয়যুক্ত হয়, তখন কেশব-প্রমুখ নব্যদল এই বিশেষণ লাভ করেন। যাহা হউক, ১৮৭৫ সন সেই সময়েরই অন্তর্ভূত যে সময় প্রকৃত 'কৈশব' দল ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সংগ্রামের জন্য—ভক্তি, বৈরাগ্য ইত্যাদি বিষয়ক তুমুল আন্দোলনের জন্য—প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই সময় ঢাকার ক্ষুদ্র 'কৈশব' দল বৈরাগ্যসাধনের জন্য কিছু কিছু নির্যন্ত্রিত হইতেছিলেন। আমার জীবনগত অবস্থা বৈরাগ্যের কোন ধার না ধারিলেও বিচারতঃ বুঝিতে পারিলাম যে বৈরাগ্যের পক্ষই ন্যায়সঙ্গত। এখানে আসিয়া আমাকে ভিতরে ভিতরে বৈরাগী দলের সঙ্গেই সহানুভূতি রাখিতে হইল। ভিতরে ভিতরে বলিবার কারণ এই, তৎকালে আমি দুই একটী ব্যতীত 'বৈরাগী' ব্রাহ্মদের মধ্যে আর কাহারও সঙ্গে বিশেষ-রূপে পরিচিত ছিলাম না। ১৮৭৬ সনে আমার স্বর্গ-গতা স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধি অনুসারে সম্পন্ন হওয়ার পর হইতে সেই দলের সঙ্গে কিছু কিছু ঘনিষ্ঠতা হইতে লাগিল। আমার সন্তানগণমধ্যে

শ্রীমান্ জ্ঞানেশ ব্যতীত আর কেহই ঢাকার তখনকার কোন বিদ্যালয়ে পড়িবার বয়স প্রাপ্ত হন নাই। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশের বিদ্যালয়পরিচালনার দূষিত রীতি দেখিয়া শিশুদের বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে আমাকে বিশেষরূপে সোদ্বেগ হইতে হয়। অনেক চিন্তা করিয়া এবং শিক্ষিতদলের বন্ধুগণসহ পরামর্শের পর শ্রীমান্ জ্ঞানেশকে গবর্ণমেণ্টের কলীজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম। তৎপর কিছুকাল গত হইলে শ্রীমান্ পরেশ ও শ্রীমতী বিনোদমণিকে তত্রত্য বয়স্থা স্ত্রীলোকদের বিদ্যালয়সংক্রান্ত বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে দিলাম। তথায় তাঁহারা বড় অধিক দিন পড়েন নাই। পরে কিছু দিন বাসার ছেলেদের নিকটেই পড়িয়াছিলেন। এ সময় শ্রদ্ধেয় ভাই স্বর্গীয় অন্নদা-প্রসন্ন সেন (তখন তিনিও স্কুলে পড়িতেন) শিশুদের পারিবারিক শিক্ষকরূপে আসিয়া আমার সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও এ সময় আমার নয়াবাজারস্থ বাসাতে কিছু-দিনের তরে শিশুদের জন্য একটা পাঠশালা স্থাপন করেন।

কুসঙ্গ।

শ্রীমান্ জ্ঞানেশ কলীজিয়েট স্কুলে যাইয়া অবধি কিছুটা দুরন্তপণা শিক্ষা করেন। ১৮৭৮ সনে এ বিষয়ে বিশেষভাবে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। একদিবস প্রয়োজনবশতঃ আমাকে কলেজে যাইতে হয়। তথায় কোন কোন বালক অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলে, "ঐ দেখ জ্ঞানেশের বাবা যাচ্ছেন"। বাস্তবিক 'জ্ঞানেশ' নামটী স্কুলে এক প্রকার বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। স্কুলের তদানীন্তন হেড্‌মাষ্টার শ্রদ্ধেয় ৺ কৈলাশচন্দ্র ঘোষ শ্রীমান্‌কে আদর করিয়া 'পাগল' নাম দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই শ্রীমান্ সম্বন্ধে আমার নিকট আশাপ্রদ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। যাহা হউক, যে দিবস আমি কলেজে যাই, সেই দিনকার একটী ক্লেশকর দৃশ্য আজও আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। সমাধ্যায়ীদের সমাজে শ্রীমান্ যে একজন 'চিহ্নিত' লোক হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার কথা উপরে বলিলাম। কিন্তু সেই দিন জ্ঞানেশসম্বন্ধে ছেলেদের আমোদের সহিত তাঁহার একজন শিক্ষককে সংমিশ্রিত দেখিয়া যেমন বিস্মিত তেমন সন্তপ্ত হইলাম। যাঁহার

অধ্যাপনাশক্তির ত্রুটিতে এবং সুশাসনের অভাবে বালকের চরিত্রে এই দোষ প্রকাশ পাইল, তিনি কোথা তজ্জন্য বিষণ্ণ ও অনুতপ্ত হইবেন, না তিনিই সেই দোষ লইয়া ছেলেদের সহিত আমোদ করিতেছেন! মনে হইল এখানে ছেলেকে রাখিলে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হউক আর না হউক, চরিত্রটী একবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং তখনই ছেলেকে সেই স্কুল হইতে লইয়া আসিতে হইল। এই ঘটনাটী ১৮৭৮সনের শেষভাগে কিংবা ১৮৭৯ সনের প্রারম্ভে সংঘটিত হয়। এ সময় ঢাকাস্থ ধর্ম্মানুরাগী ব্রাহ্মপ্রচারকগণ সহ আমার সম্বন্ধ বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। শিশুদের লিখাপড়াসম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ খুব যত্নের সহিত আমার সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষের নাম এ সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণীয় ও উল্লেখনীয়। কলীজিয়েট্ স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের বিস্ময়কর আচরণ আমার মনে প্রকাণ্ড একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ আলোচনার পর আমি এই ক্লেশকর জ্ঞানলাভ করিলাম যে, আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী নিতান্ত দূষিত ও অপকারক।

বিদ্যালয় স্থাপন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে ১৮৭৯ সনের ১৭ই ডিসেম্বর এই স্থির করিলাম যে, নিজের ও অন্যের বালকদের সুশিক্ষাজন্য স্বতন্ত্র একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করা বিধেয়। তৎপর ১৮৮০ সনের ২৫শে মে ঢাকা মাইনার স্কুল সংস্থাপিত হইল। দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপশাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন, শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথ রায় ও শ্রীমান্ অন্নদাপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু এই স্কুলের শিক্ষকতার ভার লইলেন। পরে শ্রদ্ধেয় ৺গুরুপ্রসাদ ভৌমিক মহাশয় এবং ৺পার্ব্বতীচরণ সেনও কিছুদিন স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ১৮৮২ সনে শ্রীমান্ জ্ঞানেশ মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর ১৮৮৬ সনে মাইনর স্কুল মডেল্ এণ্ট্রেন্স্ স্কুলে পরিণত হয়। এই স্কুলের কার্য্য ১৮৯২ সনের জানুয়ারি মাসে স্থগিত হয়। এই স্কুল হইতেই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেশরঞ্জন প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

পাঠ্যাবস্থা।

১৮৭৮ কি ১৮৭৯ সনে শ্রীমান্ দীনেশের বিদ্যারম্ভ

হয়। শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ ঘরের মেজেতে সুরকী লেপিয়া শ্রীমান্ দীনেশকে "কখ" লিখাইতেন। কিন্তু অন্নদার উপর শ্রীমানের শিক্ষার ভার ছিল। ভাই অন্নদাপ্রসন্ন তাঁহার পড়া শুনা সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিতেন। আমার অন্যান্য সন্তানেরা পড়া শিখিতে না পারিলে তিনি সর্ব্বদাই "ভুতু ভাল পড়া দেয় তোমরা পার না কেন?" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে লজ্জিত করিতেন। ১৮৮০ সনে মাইনার স্কুল সংস্থাপিত হইলে শ্রীমান্ দীনেশকে তথায় ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু সেই সময় তিনি পুরাতন উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন, এবং তাহাতে প্রায় বৎসরাধিক কাল কষ্ট পান। রোগ এক প্রকার দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু অবশেষ কয়েক মাস নৌকাভ্রমণে ভগবানের কৃপায় রোগ দূরীভূত হয়।

রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া শ্রীমান্ এখন বিধিপূর্ব্বক পড়া শুনা করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে অবস্থিতিকালে শ্রীমানের জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই যাহা ইতিহাসে লিখিবার উপযুক্ত। ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ

অনুরাগ ছিল। ভূগোল একেবারে ভালবাসিতেন না। ভূগোলে রুচি জন্মাইবার জন্য আমি মাঝে মাঝে নানা দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্য এবং শিল্প বাণিজ্য ও সভ্যতাসম্বন্ধীয় চিত্তাকর্ষক নানা বিষয়ে শ্রীমানের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতাম। তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম বলিতে পারি না। তাঁহার রুচি ইংরেজী সাহিত্য বিষয়ে বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখাও অভ্যাস হইয়াছিল। অঙ্কবিদ্যামধ্যে বীজগণিত খুব ভালবাসিতেন, এজন্য ঢাকা কলেজের গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কে, পি, বসু তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। কলেজে যাওয়ার পর সংস্কৃতটা কিছু মনোযোগের সহিত পড়িতেছিলেন। ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত তিনি বড় ভালবাসিতেন, ভূগোল ভালবাসিতেন না। যাহা পড়িতেন, তাহা খুব ভাল করিয়া পড়িতেন।

১৮৮৬ সনে ঢাকা মাইনর স্কুল, মডেল্ এণ্ট্রেন্স্ স্কুলে পরিণত হয়। তদবধি নিয়মিতরূপে এই স্কুলে শ্রীমানের ইংরেজী শিক্ষা হয়। ইংরেজী ভাষায় রচনা

অভ্যাস করিতেন বলিয়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে তাঁহার যত্ন কথঞ্চিৎ পরিমাণে সফল হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ শ্রীমানের রচিত নিম্নোদ্ধৃত প্রবন্ধটী পাঠ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে :—

"PRAYER"

A Paper Read By

DINES RANJAN ROY.

During the Celebration of the 11th Anniversary of the "Youngmen's Moral and Religious Association".

1891-19-9.

"PRAYER."

Before proceeding to speak on the subject, it would be proper for me to state briefly what the word Prayer means. It is the earnest petition of heart. Some people are under the notion that prayer consists of the words uttered at the time of worshipping God. It is not necessarily so. One may or may not utter words; but yet his heart may be praying. Our hearts are always praying, though they are praying for different things at different times—sometimes for the improvement of mind and at others for the improvement of the body &c. One of the definitions of the word prayer as given

by Dr. Webster is "that prayer is earnest request". So we see these are all prayers.

A prayer must not be called prayer if it be not answered. The benefit that is obtained by prayer, is beyond the reach of human thoughts ; knowledge cannot give it, and skill also fails. There is a story I remember which I think will show how true this fact is. I hope all present here are familiar with the little story of the "Sailor boy." However let me read it to you. It is this:—When a ship was just out from a harbour a severe storm assailed her. The wind was blowing so furiously that the ship began to roll fearfully. Some of the riggings got entangled at the main mast-head, and it became so dangerous that unless some one would go up and put it right, the ship with all her passengers would go down. Who was to go up? The mate cruelly ordered a mere boy to put that right. The poor boy when he had heard of this order which seemed to him an immediate death, glanced at the swinging mast, the raging sea, and the steady determinate countenance of the mate. He hesitated first ; but then went into a cabin, within two minutes came back, climbed to the top of the mast and in about fifteen or twenty minutes, his work done, he came down on the deck all safe. Do you know why he went into the cabin? He went there for praying. Now see what the benefit of prayer is! Many there may be who do not see the benefit

of prayer in this ; but to them I ask a question that if it was not the effect of prayer what did encourage and enable him to go up to the top of the mast, though he hesitated so much at first.

There are some who say "prayer is useless" ; but how can they say so without praying and knowing the utility of prayer. Would it not be absurd if having never tasted sugar I were to say it tastes bitter? Ask those only who pray if they can do away with prayer in religion. They say "Prayer is the life of religion". Do you think that man can be religious without prayer? As the world cannot exist without God, a house connot stand without a foundation, man cannot live without air, so it is impossible to be religious without prayer. Prayer makes the weak powerful, the timid heroic the dejected hopeful, the currupt righteous and the ignorant wise.

One of the most important effects of prayer is this that it points out how sinful we are. It makes us aware of our sins. I can speak to you of myself without the least hesitation that so long as I pray regularly, I become aware even of little things where I go wrong. On the other hand my consciousness of sin directs me to One who is ever willing to help me, to support me and to free me from sin. In short I spend an easier and happier life.

Prayer makes our conscience clear. It is true that

conscience is always acting in the same degree within a person who is prayerful, as well as, within a person who is not prayerful, yet there is some difference—a difference which none but a prayerful man can understand. It is this—when we are addicted to all sorts of wickedness and filthy crimes, and when we are accustomed to all sorts of heinous sins, even then, the conscience speaks within us; but sinful as we are, we cannot hear its voice; while on the other hand if we were prayerful its voice would be as audible as anything.

Our prayers must not be a collection of choice words or phrases. Our special attention should be to sincerely hold our wants before God. For Christ says "But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking." "Be not ye therefore like unto them: for your father knoweth what things ye have need of, before ye ask him."

We must be very sincere in praying and we must rely upon him. There must not be any doubt about the result of the prayer. We must wait upon the Lord for answer. As we pray we must try to realise Him in us. "Let those that pray in the house of Go[illegible] remember that they shall not merely ask but receive, not merely seek and search but see the Lord and gather His righteousness and peace, and the inspiration and joy of his countenance."

"For if ye only pray and ask and beg from day to day what reward have ye? I will respond to prayer and give to the suppliant what he seeketh, said the Lord and every sincere petition of the humble sinner will I grant."

"Therefore as ye pray wait trustfully till the Lord speaks and gives out of the riches of His mercy, filling every heart with wisdom and inspiration, holiness and joy."—"*New Samhita*"

Jesus Christ who knew best what prayer was, said the following on prayer. "Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you." For every one that asketh recieveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened." "Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will be given him a stone or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your father which is in heaven give good things to them that ask them."

When he being the *best of men* could say so, what objection *can we* the filthy creatures have to prayer?

On this *happy occasion* I cannot but praise God for *the blessings* which he has streamed *upon me*. Do you know how? When I was *a mere* boy—when I could hardly go *from one* house to another, without a com-

panion, I once went to see a little friend of mine who lived at a little distance from our house. There was an appearance of a great storm ; but I thought that I would be able to reach that house before the storm, but unfortunately when I had gone half the way the wind began to blow ; it was as dark as night, I could scarcely open my eyes for dust. Being placed in such a perilous situation, I prayed to God and began to run towards home, giving up the attempt. But it so happened that I was all safe in my way, but as soon as I reached home, the storm came.

Our prayers must be unceasing. "Pray without ceasing" says the Bible. We must not be contented with praying once or even twice a day. This little story will show how we can pray unceasingly. "A pious servant-girl was once asked by her master if she understood this text, and this is how she explained it. 'When I first open my eyes in the morning,' said Mary, 'I pray Lord open the eyes of my understanding ; while I am dressing I pray that I may be clothed with the robe of righteousness ; when I wash myself, I pray for the washing of regeneration ; when I sweep out the house, I pray that my heart may be cleansed from all its impurities ; when I eat my breakfast, I ask God to feed me with the hidden manna and the sincere milk of his word.'" And in this way Mary carried out the text, "Pray without ceasing."

Go when the morning shineth,
  Go when the noon is bright;
Go when the eve declineth,
  Go in the hush of night;

Go with pure mind and feeling,
  Fling earthly thought away,
And in thy chamber kneeling,
  Do thou in secret pray.

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী দোষবিবর্জ্জিত নহে; কিন্তু ইহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আছে। প্রথমতঃ শ্রীমানের শিক্ষাকার্য্যের সৌকর্য্যের জন্য বিশেষ কোন উপায় অবলম্বিত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যৎসামান্য যে সকল উপায় ব্যবস্থিত হইয়াছিল কিংবা হইতে পারিত, রোগাক্রমণের পৌনঃপুন্যে তাহাও পূর্ণরূপে ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ প্রবন্ধলিখার সময় তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই এবং তিনি মডেল্ এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। এই প্রতিকূল অবস্থাগুলি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বিজাতীয় ভাষায় এরূপ একটী প্রবন্ধ লিখার সামর্থ্য শ্রীমানের প্রাকৃতিক রচনাশক্তিপরিচায়ক, সন্দেহ নাই।

১৮৮৬ সন হইতে ১৮৯১ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত শ্রীমান্ এই মডেল্ এণ্ট্রেন্স্ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বালকদিগের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে, এই উদ্দেশ্যে ঢাকাতে আমি স্কুলটী সংস্থাপন করি। ইহার উদ্দেশ্য ফলে পরিণত করিবার জন্য ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সকল প্রচারকেরাই যথোচিত পরিমাণে চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ এই স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। এতদ্ব্যতীত স্কুলের ছাত্রদিগের ধর্ম্ম-ও নীতি-গঠন-বিষয়ে ইহাঁরা প্রাণপণে যত্ন করিতেন। শ্রীমান্ দীনেশের ধর্ম্ম ও নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা দ্বারা যত দূর লাভ হইতে পারে তাহা ইহাঁদেরই পদতলে বসিয়া হইয়াছিল। এই স্কুলে থাকিবার সময় শ্রীমানের চরিত্রসম্বন্ধে তিনটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, এস্থলে তাহা লিপিবদ্ধ করা বিধেয়।

প্রথমটী সততাসম্বন্ধে—

যখন ৺ রাজকৃষ্ণ রায় ঢাকাতে প্রহ্লাদচরিত্র নাটকাভিনয়ার্থ আগমন করেন, তখন অনেকেই দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট্ বিনামূল্যে প্রাপ্ত হন ও ক্রয় করেন। কিন্তু দীনেশকে আমি তৃতীয় শ্রেণীর

টিকেট্ ক্রয় করিবার জন্য টাকা দি। তিনি টাকা দিয়া টিকেট্ ক্রয় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে বসিয়াছিলেন, অধ্যক্ষ যাইয়া তাঁহার টিকেট্ দ্বিতীয় শ্রেণীর দেখিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসিতে পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট্ ক্রয় করিয়াছি। কিন্তু টিকেট্ বাহির করিয়া দেখা গেল দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট্। তখন দীনেশ বলিলেন, ইহা ভুলক্রমে হইয়াছে, আমি তৃতীয় শ্রেণীর মূল্য দিয়াছি। অধ্যক্ষ টিকেট্ পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। দীনেশ টিকেট্ বিক্রেতার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলাতে তিনি সাধুতার পুরস্কাররূপে দীনেশকে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই যাইয়া বসিতে বলিলেন।

দ্বিতীয়টি ক্ষমা সম্বন্ধে—

যখন মডেল্ এণ্ট্রেন্স্ স্কুল আমাদের আরমাণীটোলার বাড়ীতে ছিল, তখন তাহার পার্শ্বস্থ আমাদেরই ছোট একটা বাড়ীতে এক জন সামান্য লোক ভাড়াদার ছিল। সে আমার নিকট একদিন নালিশ করে যে, স্কুলের ছেলেরা তাহার দরজা খুলিয়া বাড়ীতে আসিয়া উৎপাত করে। একথায় আমি বলি, পুনরায় কোন বালক গেলে তুমি তাহাকে ঠেঙ্গাইয়া দিও। ঘটনা-ক্রমে সে ব্যক্তিও যেমন তাকে তাকে ছিল, এমন সময়ে দীনেশ সেই দিকে যাইবার কালে সে একটা যষ্টিদ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করে। দীনেশ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট সমস্ত বলিলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতারা অতিশয় ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া

সেই লোকের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে ব্যস্ত হইলেন। আমি দীনেশকে নির্জ্জনে নিয়া বলিলাম, দেখ দীনেশ, এ লোক-টাকে কি তুমি সচ্ছন্দ মনে ক্ষমা করিতে পার? যদি তোমার মনে কোন কালিমা থাকিয়া যায়, তবে তাহাও বলা ভাল। দীনেশ অমনি অম্লান বদনে বলিলেন, হাঁ আমি ক্ষমা করিলাম, আমার মনে কোনও দাগ থাকিবে না। আমি বলিলাম, তবে দাদাদেরে একথা বল, তাঁহারা যেন ও লোকটার অপরাধের কোন প্রতিশোধ লওয়ার চেষ্টা না করেন। দীনেশ তৎক্ষণাৎ দাদাদিগকে একথা বলিয়া তাঁহাদের ক্রোধ দূর করিয়া দিলেন।

তৃতীয়টী পরহিতৈষণা সম্বন্ধে। এই ঘটনাটী আমার আত্মীয় শ্রীমান্ জ্ঞানচন্দ্র রায় বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার পত্রের যে অংশে তিনি এই ঘটনার কথা লিখি-য়াছেন, এস্থলে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বোধ হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাসে যখন ঢাকানগরীতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বড় ধুমধাম হয় এবং নানা স্থান হইতে বহুলোকের সমাগম হয়, তখন একদিন তিনি বুড়ীগঙ্গার বাবুর বাজারের ঘাটে স্নান করিতে যান। রাস্তায় একটী ৬।৭ বৎসরবয়স্ক বালক ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জানা গেল, সে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তাহার খুল্লতাত প্রভৃতি আত্মীয়ের সঙ্গে ঢাকা আসিয়াছে এবং

কি করিয়া তাহাদের কাছছাড়া হইয়া পড়িয়াছে। এখন যে কোথায় যায় কি করে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার থাকিবার স্থান কোথায় তাহাও সে বলিতে পারে না। এই সব কথা শুনিয়া তিনি বালকটীকে সঙ্গে নিয়া বাড়ী আসিলেন। বালকটীকে কিছু আহার করিতে দেওয়া হইলে এবং ক্ষণকাল পরে তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি সহরের নানাস্থান অন্বেষণ করিয়াও তাহার সঙ্গীদের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তৎপর নিরুপায় দেখিয়া পোলিশ ষ্টেশনে বালকের বিষয় জানাইয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া রাখিবেন মনে করিয়া, পোলিশ ষ্টেশনে যেমন প্রবেশ করিতেছিলেন অমনি বালকের আত্মীয়েরাও অনেক অনুসন্ধানের পর পোলিশকে খবর দিয়া বাহির হইতেছিল। তৎপর উভয় পক্ষে মহা আনন্দ—বালক তাহার আত্মীয়ের সঙ্গে চলিয়া গেল। এই কার্য্যে প্রায় সমস্ত দিনটী লাগিয়াছিল। ঢাকার মত একটী সহরে এইরূপ একটী কার্য্যে কত পরিশ্রম তাহা বুঝা যায়। এই ঘটনাতে তাঁহার পরদুঃখকাতরতার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র রায়
কলিকাতা।

মডেল্ এণ্ট্রেন্স স্কুলের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীমান্ সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

১৮৮৬ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে উক্ত বিদ্যালয়ের পণ্ডিত নিযুক্ত হই, এবং ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ছিলাম। এই কয়েক বৎসরই শ্রীমান্ দীনেশ আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, বাঙ্গালা সংস্কৃত নিম্নশ্রেণীতে কম পড়ান হইত। শেষে আমার মনে পড়ে আমি এখানে আসিবার সময়ে শ্রীমান্ ৩য় শ্রেণীতে উন্নমিত হইয়াছিলেন। (কোন কথা) উপলক্ষে আমি বলিয়াছিলাম, "চরিত্র সংগঠনের যে সকল অভিনব প্রণালী এই স্কুলে অবলম্বিত হয় তুমি তাহা প্রাণপণে পালন করিয়া সকলকে দেখাও যে, 'আদর্শ প্রবেশিকা' বিদ্যালয় আদর্শস্থানীয়ই বটে"। শ্রীমান্ আমার এই কথাটী পালন করিয়া চরিত্র গঠন করিতে সতত যত্ন করিতেন ইহা আমি তাঁহার কার্য্যতায় বুঝিতাম। পুণ্যের প্রতি প্রবল পিপাসা পাপের প্রতি বিদ্বেষ আমি অধ্যাপন সময়ে বহুশঃ লক্ষ্য করিয়াছি। একদিন আমার অসুখ করাতে স্কুলে যাইতে পারি নাই, শ্রীমান্ আমার তত্ত্ব লইয়াছিলেন। অন্য দিন আমি স্কুলের তদানীন্তন সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট বিদায়ের জন্য সংস্কৃত 'রথোদ্ধতা' ছন্দে কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছিলাম; শ্রীমান্ আমার নিকট হইতে মনোযোগ করিয়া কবিতাগুলি শুনিলেন, সম্ভবতঃ সে শ্রেণীতে সংস্কৃতের অধ্যাপনা খুব কমই হইত; কিন্তু দীনেশরঞ্জনের এতই অনুসন্ধিৎসা প্রখর ছিল যে মোটামুটী সংস্কৃত ছন্দ কিরূপ? অন্যান্য কবিতার মত মিল থাকে কিনা? এই আপনার লিখিত রথোদ্ধতা ছন্দের কবিতায়

মিল দেখিতেছি না তবে কিরূপে কবিতা হইল? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি যত সহজে সম্ভব তাঁহাকে বুঝাইতে যত্ন করিয়াছিলাম। অতঃপর সংস্কৃতে তাঁহার একটু অভিনব অনুরাগ যেন দেখিতে পাইতাম।

আমি যত বৎসর যাবৎ আমার এই ক্ষুদ্রতম শক্তি ভগবদিচ্ছায় শিক্ষকতাকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছি তৎকাল মধ্যে শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের মত বিনয়ী, গুরুভক্তিসম্পন্ন, পাঠে মনোযোগী, প্রখর অনুসন্ধিৎসু ছাত্র কমই দেখিয়াছি।

নানা কারণে ১৮৯১ সনের জানুয়ারি মাস হইতে মডেল্ এণ্ট্রেন্স স্কুলের কার্য্য রহিত হয়। সুতরাং জানুয়ারি মাসের প্রথম হইতেই শ্রীমান্‌কে ঢাকা কলীজিয়েট্ স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই স্কুল হইতে তিনি ১৮৯৩ সনের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হন। কলীজিয়েট্ স্কুলে পড়িবার সময় শ্রীমানের চরিত্র যে আরো বিকশিত হয়, তাহার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। যে অল্পকাল শ্রীমান্ এই স্কুলে পড়িয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে তিনি সকল ছাত্রের সঙ্গে সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে সেক্সনে তিনি পড়িতেন সেই সেক্সনের ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার তো কথাই; কিন্তু

অপর সেকৃসন্ এবং অন্যান্য ক্লাসের বহুসংখ্যক ছাত্রগণ সহ তাহার আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। ফলে তাঁহার চরিত্রের মিষ্টতা এবং তাঁহার স্বাভাবিক আসঙ্গ-লিপ্সা জন্য তিনি লোকের সঙ্গে অনায়াসে মিশিতে পারিতেন।

১৮৯৩ সনে কলেজে যে কয়েক মাস পড়িয়াছিলেন, সেই সময়েও ছাত্র এবং অধ্যাপক, সকলের সঙ্গে সদ্ভাব-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমার বন্ধু এবং শ্রীমান্ দীনেশের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, মহাশয় শ্রীমান্ সম্বন্ধে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন :—

I have a very good opinion both of the conduct and character of our lamented Dinesh. সে বড় সরল স্বভাব ছিল; কখনও কোন কথা বলিতে হইলে সরলভাবে বলিত। এখনকার ছাত্রবর্গ যেমন শিক্ষকদের নিকট কোন লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে তদ্রূপ ছিল না; যাহা জানিত না বা বুঝিত না, নম্রভাবে তাহা জিজ্ঞাসা করিত, আমার বাসায় আসিয়া আমার নিকট সংস্কৃত পড়িত, সুতরাং তাঁহার স্বভাব চরিত্র জানার আমার বিশেষ সুযোগ ছিল।

শ্রীমানের জীবন সম্বন্ধীয় পার্থিব বিভাগের কথা

এখানে শেষ হইল। এই জীবন গঠনবিষয়ে বিশেষ কিছু চেষ্টা করা হয় নাই। অথচ প্রকৃতির পরিচালনায় এবং নববিধান-প্রভাবে এ একটী মনোহর চরিত্র-রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীমানের চরিত্রে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমি এতাধিক সন্তুষ্ট ছিলাম যে, কায়িক শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে বাচনিক তিরস্কার করিবার অবকাশও আমি বড় পাই নাই। ফলে এই অল্প বয়সেই তিনি এত বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছিলেন যে, আমি অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়া সফল হইতাম। ভগবানের লীলা আশ্চর্য্য !

৫। দিঙ্‌নির্ণয়

ঢাকা।

ঢাকা নগরের অপরিষ্কার এবং জঙ্গলময় বিশেষতঃ অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। ১৮৮৭ সনে স্থানীয় নববিধানমণ্ডলীর নেতৃগণ এই স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানের দোষ সম্পূর্ণরূপে আমার জানা থাকিলেও মণ্ডলীর সহিত থাকিবার জন্য আমাকে এই স্থানেই আসিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিতে হয়। তাহাতে আবার অন্য কোন গুরুতর কারণবশতঃ এই অস্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে যাহা জাজ্বল্যরূপে অধিকতর স্বাস্থ্যনাশক, এমন এক স্থান আমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেই মনোনীত করিলাম। এমন ভয়ানক স্থানে বাস করিবার জন্য যেরূপ বাড়ী প্রস্তুত করা আমার

সাধ্যায়ত্ত ছিল, তদ্রূপ বাড়ী প্রস্তুত করিয়া আমি সন্তানগণসহ তথায় বাস করিতে লাগিলাম। ইহার অনতিকাল পরেই আমার মধ্যম পুত্র জ্বর ও প্লীহা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে শ্রীমান্‌কে স্থানান্তরিত করাতে অচিরে তিনি রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। ১৮৯৩ সনে শ্রীমান্ পরেশ ও শ্রীমান্ দীনেশ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর উভয়েরই লাহোর মেডিকেল্ কলেজে যাওয়ার প্রস্তাব হয়। কিন্তু পরে কোন কারণে শ্রীমান্ দীনেশের তথায় যাওয়া হইল না। তিনি ঢাকা কলেজেই ভর্ত্তি হইলেন। পরীক্ষার পূর্ব্বেই শ্রীমান্ দীনেশের শরীরেও মেলেরিয়ার দোষ প্রকাশ পাইতেছিল। ইহা টের পাইয়া অবকাশের সময় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিব এরূপ ইচ্ছা করি। ঘটনাক্রমে তাহা হইয়া উঠিল না। যাহা হউক, শ্রীমান্ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় অবাধেই কলেজে যাইতেছিলেন। অক্টোবর মাসে আমার পুত্রবধূ তাঁহার কন্যা ও বালকটীকে লইয়া তাঁহার মাতার সঙ্গে মধুপুর বাস করিতে যান। হঠাৎ শিশু বালকটীর জ্বর ও কাশি হওয়াতে আমাকে তথায়

যাইতে হয়। ঈশ্বরানুগ্রহে শিশুটী আশু এই উৎকট পীড়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিছুকাল পরে মাতা সহ আমার পুত্রবধূ কলিকাতায় চলিয়া আসি-লেন। আমি আমার কন্যাকে দেখিবার জন্য আরাতে চলিয়া গেলাম।

যদিও আমার ঢাকা পরিত্যাগ করিবার কিছুকাল পর হইতেই শ্রীমান্ দীনেশের মাঝে মাঝে জ্বর হইতে লাগিল, তথাচ তাহার প্রকোপ এত অধিক ছিল না যে, তজ্জন্য আমার ভাবনার কারণ উপস্থিত হয়। বাস্তবিক শ্রীমান্ নিজেই পত্র দ্বারা নিজের অবস্থা বিশদরূপে লিখিয়া আমাকে জানাইতেন; এবং আমি ব্যস্ত না হই এজন্য যত্ন করিতেন। আরা হইতে লাহোর, হরিদ্বার, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, ডিহিরি, রোতাশগড় নামক পাহাড়, প্রভৃতি দেখিতে যাই। রোতাশগড় দেখিয়া ফিরিবার সময় পথে কলিকাতা হইতে টেলীগ্রাফ পাইয়া জানিলাম, আমার পৌত্রটী সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিয়া জানিলাম ১৮৯৪ সনের ৩১শে জানুয়ারি আমাদিগকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন

করিয়া আমার অতি যত্ন ও স্নেহের ধন, প্রেমের পুতুল শিশু পৌত্রটী পরলোকে প্রেমময়ের শান্তি-ক্রোড়ে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। এদিকে আমার বধূমাতা এবং পৌত্রীটীর গুরুতর পীড়া। এই সব গোলমালে কলিকাতাতে আমাকে প্রায় দুই মাস থাকিতে হয়।

ঢাকাতে এখন শ্রীমান্ দীনেশের পীড়াও পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল। যদিও জানিতাম চিকিৎসাদি ভালরূপ চলিতেছে এবং শ্রীমান্‌ও আমাকে বল ভরসা দিতে ত্রুটি করেন নাই, তথাপি পীড়ার গতিক বুঝিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল আর কলিকাতায় থাকা ঠিক বোধ হইল না। সুতরাং সুবিধা হইবামাত্রই সকলকে লইয়া ঢাকায় পৌঁছিলাম। তখন মার্চ্চ মাসের আরম্ভ এবং দীনেশ এসময় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ রায় মহাশয়ের লক্ষ্মীবাজারের বাড়ীতে তাঁহার পরিবার মধ্যে থাকিতেন। এই পরিবারের সৌজন্য ও সহৃদ-য়তা ঢাকায় খুব প্রসিদ্ধ। আমাদের অনুপস্থিতিকালে তাঁহারা শ্রীমানের সেবা শুশ্রূষায় কোন ত্রুটি করেন নাই। এইজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা

ঋণে আবদ্ধ। ঢাকায় পৌঁছিয়াই ডাক্তারদের পরামর্শা-নুসারে শ্রীমানকে লক্ষ্মীবাজার হইতে আমার আরমাণী-টোলাস্থ বড় বাড়ীতে আনিলাম। ঈশ্বরকৃপায় এখানে আসার পরই জ্বর প্লীহাদি বিদূরিত হইল। দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিন সপ্তাহান্তে উপসর্গ লইয়া জ্বর প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। শ্রীমানের কষ্ট যন্ত্রণা খুব হইতেছে দেখিতে-ছিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যেও তাঁহার ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা এবং শান্তভাব এত পরিলক্ষিত হইল যে, আমি অবাক্ হইয়া ভাবিলাম, এ বালক এত যন্ত্রণার মধ্যে কিরূপে সুধীর ও সুস্থির রহিয়াছেন। যাহা হউক, এ অবস্থায় আর শ্রীমানকে ঢাকাতে রাখা ঠিক নয় বলিয়া, আমার বন্ধু ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসু, ও শ্রীযুক্ত গোপাল-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রাজমোহন বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়দের পরামর্শমতে আমি এপ্রিল্ মাসের শেষ পর্য্যন্ত শ্রীমানকে লইয়া আরাতে আসিলাম।

আরা।

আরাতে শ্রীমানকে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসন্ন ঘটক ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মিত্রের চিকিৎসাধীনে রাখিলাম। তাঁহাদের চিকিৎসায় জ্বর ও প্লীহা সম্পূর্ণ-

রূপে আরাম হইয়াছিল। কিন্তু তিন সপ্তাহ পর আবার প্লীহা সহ জ্বর আরম্ভ হইল। সপ্তাহকাল পরে, ৭ই জুন (১৮৯৪), বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য শ্রীমান্‌কে লইয়া কৈলওর আসিলাম। এই গ্রাম আরা হইতে ৮ মাইল দূরে, শোণনদীর তীরে অবস্থিত,শোণব্রিজ ষ্টেসনের খুব নিকট। নদীর পশ্চিম পারে, তথাকার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বয়জনাথ সিংহদের একটা বড় কুঠী আছে। কৃপা করিয়া জমীদারেরা এই কুঠী আমাকে দিয়াছিলেন। নদীর পারে এবং মাঠের মধ্যে স্থিত বলিয়া এই বাড়ী আমাদের উপযোগীই ছিল। স্থানটা দেখিতেও সুন্দর। এক দিকে সুবিস্তীর্ণ শস্যপূর্ণ মাঠ। অন্য (পূর্ব্ব) দিকে বালুকাময় দুই উপকূলের মধ্যদিয়া সুমন্দধারে শোণ-নদী প্রবহমাণা, তার উপর আবার গ্রীষ্মকালীয় প্রখর সূর্য্যোত্তাপ নিবারণার্থ সুশীতল বায়ুর হিল্লোল। এ স্থানের শোভা ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির সুপ্রসিদ্ধ শোণসেতু বিলক্ষণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া রাখিয়াছে। সামান্য দৃষ্টিতে এস্থান রুগ্ন লোকদের জন্য মনোনীত না হওয়ার কারণ নাই। কিন্তু স্বাস্থ্যবিজ্ঞা-নের চক্ষে দেখিলে, এসময় কৈলওরের কুঠীতে থাকা

সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি আছে। নদীর পশ্চিম বালুকাময় শুষ্ক উপকূলে মেলেরিয়াখ্য বিষোৎপত্তির ভূয়সী সম্ভাবনা। পূর্ব্বদিকের বায়ুদ্বারা সর্ব্বদাই মেলেরিয়া কুঠীতে আসিতেছে। ইহা প্রথম হইতেই জানিতাম, তবু অন্যান্য দিক্ দিয়া উপযোগিতা দেখিয়া এ বাড়ীতে আসিয়া থাকা স্থির করিলাম। ভবিষ্যতে যাঁহারা স্বাস্থ্যান্বেষী হইয়া এস্থানে আসিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে; এস্থানে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করার বিশেষ অসুবিধা। আমরা ৭ই জুন এখানে আসি। পরিবর্ত্তনের উৎসাহে সে দিন শ্রীমান্ অপেক্ষাকৃত ভাল ছিলেন; কিন্তু পর দিন হইতে জ্বর পূর্ব্বের ন্যায়ই হইতে লাগিল। এই দিন শ্রদ্ধেয় ভাই মহিমচন্দ্র সেন আমার সাহায্যার্থে এখানে আইসেন। ১৪ই জুন শ্রীমান্ কিছুটা হতাশ্বাসের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক যাতনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে ইহা বুঝাইয়া দিলাম, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার উপরে আমাদের হাত নাই; কিন্তু মনুষ্যের চিকিৎসায় যত দূর হইতে পারে, তাহা তাঁহার সম্বন্ধে হইতেছে। যত দূর বুঝিলাম, শ্রীমান্ প্রবুদ্ধ হইলেন বলিয়া টের

পাইলাম। এই কথা হওয়ার কিছু পরে অতি দীন ভাবে নির্ভর-ও প্রার্থনাশীল হইয়া তিনি প্রথমে "কি ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়", ও তৎপর "কত ভালবাস গো মা", এই দুইটী গান করিলেন। এ দৃশ্যটী এক দিকে যেমন আমার হৃদয়ে কতকটা আঘাত দিয়াছিল, আর এক দিকে তেমনি তাঁহাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, যথাস্থানেই শ্রীমান্ নির্ভর স্থাপন করিয়াছেন। এখানে জ্বরের লাঘব না দেখিয়া ১৬ই জুন আরাতে ফিরিয়া আসিলাম।

এই পরিবর্ত্তনে কিছু দিনের জন্য জ্বরের বিরাম হইল বটে, কিন্তু স্থায়ী ফল কিছুই পাইলাম না,—জ্বর প্রত্যাবর্ত্তিত হইল। জ্বরের এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীমান্‌কে এবং আমাকে যে নানা কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুভবনীয়। কিন্তু সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতেছি, এই অবস্থাই আবার অনেক সময় আমাদের উভয়কেই ভগবানের চরণাশ্রয় লইতে বাধ্য করিয়াছে। এই পরীক্ষার মধ্যে আমরা দুজনে সময়ে সময়ে সৎ-প্রসঙ্গও করিতাম। ২৭শে জুলাই শ্রীমান্ প্রার্থনাসম্বন্ধে এই প্রশ্ন করেন :—"প্রার্থনা অনেক সময় ভাল হয় না;

এরূপ অনেক বার হইলে পর অবিশ্বাস আসিতে পারে কি না?" উত্তর—"প্রার্থনার অর্থ নিজের গূঢ় অভাব টের পাইয়া তাহা মোচনের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে ঈশ্বরের দিকে তাকান। বাক্যে তাহা স্ফুরিত হউক আর না হউক, মনে এই অভাব বোধ হইলেই প্রকৃত প্রার্থনা হয়। তবে ইহা হইতে পারে যে, প্রার্থনার পর অমনি তাহার উত্তর না পাওয়া যাইতে পারে। প্রার্থনার উত্তর পাওয়া গেল না বলিয়া যদি অধীর হওয়া যায়, তাহা হইলে দোষ আছে। এ সম্বন্ধে কথা এই, প্রার্থনার ভাব মনে হইলেই প্রার্থনা করিব—ফল ভগবানের হাতে। মৃত্যুকালে যীশুর মুখ হইতেও 'পিতঃ আমা হইতে এই পানপাত্র দূরে রাখ', মানব স্বভাবসুলভ এই প্রার্থনা বাহির হইল। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন 'যদি তোমার ইচ্ছা হয়'। বিপদের সময় লোকের মনে স্বভাবতঃ প্রার্থনার ভাব হয়। কিন্তু প্রার্থনার শেষে সর্ব্বদাই এই কথা থাকিবে, 'কিন্তু আমার নয়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' "। ২৯শে জুলাই আমার স্বর্গগতা মাতৃদেবীর প্রথম সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ হয়। সেই শ্রাদ্ধে শ্রীমান্ যোগ দিয়াছিলেন।

এবং তাহাতে পরলোকবাসী আত্মা সম্বন্ধে অনেক কথা প্রকাশিত হয়। রাত্রে আবার শ্রীমান্ সঙ্গে আমাদের পরিবারস্থ স্বর্গীয় আত্মা সম্বন্ধে এবং পরলোকই যে আমাদের চির আবাসভূমি, এই বিষয়ে সৎপ্রসঙ্গ হয়।

ঢাকা ও কুমিল্লা।

জ্বরের ভাবলক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসকগণ আগত-প্রায় বর্ষাকালে শ্রীমান্‌কে আরাতে না রাখাই ঠিক মনে করিলেন। কোথায় যাই, এই চিন্তায় কিছু চিন্তিত ছিলাম। অবশেষে বন্ধুগণের পরামর্শ এবং ভগ-বানের নির্দ্দেশে ঢাকাতে পৌঁছিয়া কুমিল্লায় নৌকাতে বাস করা স্থির করিলাম। আরায় থাকিবার সময় একদিবস একস্থানে বক্তৃতা হওয়ার কথা শুনিয়া শ্রীমান্ তথায় যাইবার অনুমতি চাহিলেন। পালাজ্বর কিয়ৎ পরিমাণ ইচ্ছার অধীন, এজন্য আমরা শ্রীমান্‌কে বলিলাম জ্বর না আসিতে দিলে যাইতে পার। সত্য সত্যই সেই দিন নিয়মিত কালে জ্বর আসে নাই। তন্ত্র মন্ত্র ছিটা কোঁটাতে যে পালাজ্বর আরোগ্য হয় তাহার প্রকৃত কারণ ইচ্ছার বল।

আমরা যখন ঢাকাতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইলাম তখন শ্রীমানের জ্বর থাকিলেও শরীর তত দুর্ব্বল হয় নাই— শ্রীমান্ নদীর পারে এবং নিকটস্থ বন্ধুদের বাড়ীতে চলিয়া যাইতে সমর্থ ছিলেন। যাহা হউক, শীঘ্রই আমরা নৌকা পথে কুমিল্লাভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাস্তায় লিখিবার উপযুক্ত কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। যে দিন কুমিল্লায় পৌঁছি, সেই দিবস একটী সামান্য ঘটনাতে শ্রীমানের সদ্বিবেচনা এবং একজন মাল্লার সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। গোমতী নদীর স্রোত বর্ষাকালে খুব প্রবল হয়। যে স্থানে রেল্‌ওয়ে-সেতু নির্ম্মিত হইতেছিল, সেই স্থানে স্রোতের প্রাবল্য খুব বেশী। গুণ টানিয়া অনেক কষ্টে আমরা উজান দিকে যাইতেছিলাম। সেতুর নিকট কাজের সুবিধাজন্য কর্ম্মচারীরা রাস্তাটী এত সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল যে অপূর্ণ সেতুর উপর দিয়া না গেলে সেই স্থানটুকু গুণ লইয়া কি গুণ ছাড়িয়া অন্য কোন উপায়ে উত্তীর্ণ হওয়ার উপায় ছিল না। এদিকে আবার রাজমিস্ত্রিগণ সেতুর উপর যাইতে দেয় না। মহাবিপদ্; কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সকলে ভাবিতেছে,

ইত্যবসরে একজন মাল্লা সাহসপূর্ব্বক জলে লাফ দিয়া পড়িল, এবং বীরের ন্যায় প্রবল স্রোতের প্রতিকূলে গিয়া সেতুর অপরদিকে উত্তরিল! কিন্তু দুঃখের কথা এই, তীরে পৌঁছিয়া যেই গুণ ধরিয়া টানিবে মনে করিল, অমনি হাত হইতে গুণ ছুটিয়া গেল এবং আমাদের নৌকা খুব বেগের সহিত পশ্চাৎ দিকে কতক দূর চলিয়া গেল। এখন উপায় কি? শ্রীমান্ দীনেশ পরে একজন সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, সাহেবের নিকট বলিলে অবশ্যই সেতুর উপর দিয়া যাইতে পারিব। আমি নিজে যাওয়ার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে আমার অনুমতি লইয়া তিনি নিজেই সাহেবের নিকট গেলেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে অনুমতি লইয়া আসিলেন।

১৮ই কি ১৯শে আগষ্ট কুমিল্লায় পৌঁছিলাম। এখানে আমার আত্মীয় কুটুম্ব অনেক থাকিলেও আমরা নৌকাতেই রহিলাম। ফলে বর্ষাকাল বলিয়া সহ-রের অবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী ছিল না। দুঃখের বিষয়, এই স্থানে বাস করিয়া আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইলাম না। আহার, চলা ফিরা, মানসিক স্ফূর্ত্তি এবং

উৎসাহাদি সম্বন্ধে কতকটা সুবিধা বোধ হইলেও জ্বরের অবস্থায় বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল না। প্রায় দেড় মাস কাল কাটিয়া গেল, জ্বর অল্পই হউক আর অধিকই হউক, প্রায় প্রত্যহই আসিতে লাগিল। শেষ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তথাকার ডাক্তার সাহেবের এবং কোন কোন আত্মীয়ের পরামর্শানুসারে আসামের স্বাস্থ্য-নিবাস শিলং নামক পার্ব্বত্যস্থানে যাওয়া স্থির করিয়া পুনরায় ঢাকাতে আসিলাম। কুমিল্লাতেও এক দিবস একটা বক্তৃতা শুনিবার উৎসাহে জ্বরের পালা নিবারণ হইয়াছিল।

শিলং যাত্রা।

এ সময় "খাসিয়ামিশন্" সম্বন্ধীয় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী ঢাকাতে ছিলেন। তাঁহার নিকট শিলঙ্গের অনেক কথা অবগত হইলাম। এবং তিনি যে আমাদের সঙ্গেই যাইবেন, ইহা অবগত হইলাম। তৎপর ১৫ই অক্টোবর নৌকা নারায়ণগঞ্জ যাইয়া রাত্রেই ষ্টীমারে উঠিলাম। প্রথম শ্রেণীর টিকেট ক্রয় করিয়াও বিশেষ সুবিধা হইল না— ষ্টীমারখানি ছোট, এবং কার্য্যকারকগণও বড় ভাল

লোক নয়। পরদিন ষ্টীমার নারায়ণগঞ্জ ছাড়িয়া রাত্রে ইটনা নামক স্থানে আসিয়া রহিল। ১৭ই আনু-মানিক ৫টার সময় ছাতকে পৌঁছিলাম। সোণাম-গঞ্জ হইতে জামাতা শ্রীমান্ রামকুমার দত্ত টেলীগ্রাম দিয়া ছাতকে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা আহারান্তে একখানা নৌকা করিয়া কোম্পানিগঞ্জ রওয়ানা হইলাম। নীলমণি বাবু, এবং মথুর বাবু নামক একটী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে চলিলেন। যদিও প্রত্যূষে আসিয়া কোম্পানিগঞ্জে পৌঁছিলাম, তথাপি কোন কারণে আমরা প্রথম ট্রেণে যাইতে পারিলাম না। এ "ট্রেণ্" যদিও রেলওয়ে ট্রেণ্ই বটে, তবু উহা অতি সামান্য প্রকারের। ৯ মাইল ব্যবধানে থারিয়াঘাট নামক পর্ব্বতের নিম্ন-স্থলীয় একটী স্থান হইতে চূণের পাতর আনিবার জন্য এই রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং আরোহী-দিগের জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই—অতি সামান্য রকমের দুই কি তিনখান মাত্র গাড়ী এক এক ট্রেণে থাকে। যাহা হউক, কোম্পানিগঞ্জের ডাক বাঙ্গালায় আমরা পৌর্ব্বাহ্লিক আহারকার্য্য সম্পাদন করিয়া

১১টার ট্রেণে থারিয়াঘাট পৌঁছিলাম। ইহাই পার্ব্বত্য সৈমান্তিক ষ্টেশন এবং এখান হইতে চেরাপুঞ্জির পর্ব্বতারোহণ করিতে হয়। "থ্যাবা" না পাওয়াতে সেই দিন আমরা তথাকার বিশ্রামাগারে অবস্থিতি করিলাম। নীলমণি বাবু চলিয়া গেলেন, মথুর বাবু সঙ্গে রহিলেন। বিশ্রামাগারের চৌকিদার রাত্রে আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করাতে পরদিন আমরা নদীর পারে আলুভাতে ভাত রন্ধন করিয়া আহার করিলাম। নদীটা অতি সামান্য রকমের পার্ব্বত্য স্রোত; কিন্তু ছোট ছোট নৌকা আলু বোঝাই করিয়া অনায়াসে এই নদী দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। থারিয়াঘাটের নিকটে অনেকগুলি কমলা লেবুর বাগান আছে। কমলা ও সুপারি গাছ একই বাগানে জন্মে। কমলা গাছে যেরূপ কমলা দেখিলাম, তাহাতে বোধ হইল যেন এবার ফসলটা ভাল হয় নাই। এত সুপারি গাছ থাকার কারণ এই, খাসিয়ারা অপরিমিতরূপে কাঁচা সুপারি ও পান খায়। খাসিয়াগণ পার্ব্বত্য জাতীয় লোক। ইহারা অত্যন্ত অপরিষ্কার; কখনও স্নান করে না। সুতরাং

ইহাদের শরীর হইতে একটা দুর্গন্ধ আইসে। স্ত্রীলোক-দের মুখের আকৃতি পার্ব্বত্য লোকের ন্যায় হইলেও দেখিতে সুন্দর। বর্ণ বাঙ্গালীদের ন্যায়। স্ত্রীলোকদের বস্ত্র পরিধানের ধরণ অতি পরিপাটী—হাত, পা এবং মুখ ব্যতীত আর সকল অঙ্গই বস্ত্রাবৃত। যাহারা দুঃখী এবং যাহাদের পরিধেয় বস্ত্র মলিন তাহাদেরও সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা থাকে। শুনিলাম যাহারা বিশেষভাবে পরিষ্কার থাকে, তাহাদের চরিত্র দূষিত। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ। বড় বড় লোকদের—রাজা, জমীদার, তালুক-দারদের, পরিবারস্থ মেয়েরাও হাটের দিন পণ্য দ্রব্য পূরিত "কঙ্কো" নামক এক প্রকার বাঁশের মঠাকৃতি চেঙ্গারি স্ব স্ব পৃষ্ঠে বহন করিয়া আনিয়া বেচা কেনা করে। বৃষ্টির সময় বংশ ও "কুর্চী"পাতানির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর মাতলা মাথায় দিয়া স্ত্রীলোকেরা চলাফেরা করে। যদিচ তখনও কমলাগুলি পরিপক্ক হয় নাই, তবু বোঝায় বোঝায় পাহাড় হইতে লেবু আসিয়া নামিতেছিল। পয়সায় ছয় সাতটা করিয়া বিক্রয় হয়। লেবুগুলি খাইতে টক হইলেও সুস্বাদু ছিল। চূণের পাতর এখান হইতে ছাতকে যায় এবং সেখানে

লোক তাহা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করে। এখানে এই পাতরের খনি আছে।

থারিয়াঘাট হইতে শিলং ৪২ মাইল এবং চেরা-পুঞ্জি ৯ মাইল। চেরাপুঞ্জির ৯ মাইল রাস্তা দিয়া প্রায় খাড়া বা সোজাভাবে পাহাড় চড়িতে হয়। সমুদ্রবক্ষ হইতে এই পাহাড়ের উচ্চতা ৪,০০০ ফীট্ (প্রায় ২৬৬৭ হাত)। এখানে খাসিয়া পর্ব্বতের দক্ষিণপ্রান্ত এবং উহা নিম্নভূমি হইতে ঠিক খাড়াভাবে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। চেরা যাইবার রাস্তা এই প্রান্তের মধ্য দিয়া এবং প্রস্তরনির্ম্মিত। যত দূর পারা যায়, উহাকে ঢাল করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তত্রাপি পাহাড় চড়িতে বড়ই কষ্ট হয়। আমরা অল্প বেলা থাকিতে রওয়ানা হই, কাজেই ৪ মাইল মাত্র যাইয়া মহাদেও নামক স্থানে রাত্রে বিশ্রাম করি। এখানেও বিশ্রামাগার আছে; কিন্তু তাহাতে লোক ছিল বলিয়া আমরা এক সাহেবের একটা ছাড়া বাঙ্গালাতে গিয়া রহিলাম। বিশ্রামাগারের চৌকিদার আমাদিগকে খাবার প্রস্তুত করিয়া দিল। পর দিন পূর্ব্বাহ্ণ ১০টার পর আমরা চেরাতে পৌঁছিলাম।

নীলমণি বাবু চেরাতে যাইয়া বর্দ্ধনরায় নামক খাসিয়া একটী ব্রাহ্ম যুবককে থারিয়াঘাট পাঠাইয়াছিলেন; এবং তিনি নিজে শিলং চলিয়া গিয়াছিলেন। বর্দ্ধনরায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। চেরার রাস্তা হইতে দূরস্থ মুস্‌মাই নামক স্থানের জলপ্রপাত দেখিলাম। চেরা-পুঞ্জিতে নীলমণি বাবুর সহকারী, বাবু রাইচরণ দাস আমাদিগকে খুব যত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন।

"থাবায়" পর্ব্বতারোহণ করা আমাদের ন্যায় অনেকের নিকট নূতন ব্যাপার বলিয়া বোধ হইবে। "থাবা" গুলি বাঁশের শলাকাদ্বারা নির্ম্মিত। দেখিতে ঠিক মোড়ার চেয়ারের মত, কেবল নীচটা চেটাল নয়। কেন না বসিবার স্থানের নিম্নস্থ শলাকাগুলি চূড়ার ন্যায় একত্র জড়ান। নীচটা এরূপ করিবার উদ্দেশ্য আছে। থাবাগুলি চূড়া হইতে বসিবার আসন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রসারিত। সুতরাং এক প্রকার বেতনির্ম্মিত যে ফিতা (strap) দ্বারা থাবাগুলি মুটেরা স্ব স্ব ললাট হইতে ঝুলাইয়া পৃষ্ঠে বহন করে, সেই ফিতা আরোহীদিগের ভারে চূড়ার দিক্ হইতে উপরে সরিয়া যাইতে পারে না। আরোহীদিগকে

মুটেদের পৃষ্ঠের দিকে পৃষ্ঠ দিয়া ঘোড়ার ন্যায় ঠেস দিয়া বসিতে হয়। পা রাখিবার জন্য একখণ্ড কাঠ বান্ধা থাকে। মুটেরা থাবায় করিয়া আমার ন্যায় স্থূলকায় লোকদিগকে লইয়াও অনায়াসে পর্ব্বতারোহণ করিয়া থাকে। আরও আশ্চর্য্য এই, মুটেরা প্রস্তুতী রাস্তায় না চলিয়া জঙ্গলময় চুপাইয়া রাস্তা দিয়া চলে। ইহাতে যেমন দূরতার লাঘব হয়, তেমন নাকি পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা কম।

চেরাপুঞ্জি পৌঁছিবামাত্রই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, আর কিছুকাল পূর্ব্বে বৃষ্টি আরম্ভ হয় নাই। ছেলেবেলা পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, পৃথিবীর মধ্যে চেরাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হয়। এখন স্বচক্ষে তাহা দেখিলাম। ২০শে অক্টোবর হইতে এই যে বৃষ্টি নামিল,তাহা ক্রমাগত ছয় দিন প্রায় সমান ভাবে মুষলধারে পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে আবার ঝটিকার আকার ধারণ করিয়া প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, শ্রীমান্ রাইচরণ এ দুর্যোগের মধ্যেও অতি যত্নের সহিত আমাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীমান্ দীনেশ ১৮ই অক্টোবর হইতে কিছু কিছু আরাম বোধ করিতে লাগিলেন। শীত, বৃষ্টি এবং ঝড় সত্ত্বেও শ্রীমানের একটুকু স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। জ্বরও হ্রাস হইল এবং আহারাদিও এক রকম ভালই করিতে লাগিলেন। ২১শে বৃষ্টি থামিল, আকাশ পরিষ্কার হইল এবং রৌদ্র দেখা দিল। আমরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু তখনই আবার আকাশ কুজ্ঝটিকায় পূর্ণ হইল। যাহা হউক, আমরা শ্রীমান্ দীনেশকে ভালরূপে বস্ত্রাদিদ্বারা আবৃত করিয়া শিলং যাত্রা করিলাম, এবং বিশেষ কোন উদ্বেগ অনুভব না করিয়া সন্ধ্যার সময় মকৃডকৃনামক বিশ্রামালয়ে পৌঁছিলাম। বাঙ্গালাতে লোক ছিল বলিয়া আমরা বাজে-লোক থাকিবার ঘরে রহিলাম, চৌকিদার বেশ করিয়া খাওয়াইল। কষ্টে রাত কাটাইয়া পরদিন (২৭শে) অপরাহ্ণ ৫টার সময় শিলং পৌঁছিলাম। সেই দিন আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল। দীনেশ মাঝে মাঝে পদব্রজে চলিয়া আসিলেন, এবং আমরা প্রায় ৪০ প্রকার সুন্দর সুন্দর বনফুল এবং অনেক রকমের মস্ (moss) নামক উদ্ভিদ তুলিয়া সঙ্গে আনিলাম।

চেরাপুঞ্জি।

আমরা ছেলে বয়সে চেরাপুঞ্জির কথা অনেক শুনিতাম। কারণ আজি কালিকার দার্জিলিং, সিমলা ইত্যাদির ন্যায় তখন এই স্থানই সাহেবদের স্বাস্থ্যনিবাস (sanitarium) ছিল। যদিও বৃষ্টির জন্য বাহির হইয়া স্থানটা ভালরূপ দেখিতে পারি নাই, তথাপি যত দূর পারিয়াছি তাহাতেই বোধ হয় উহার পূর্ব্বগৌরব আর নাই। ডাক বাঙ্গালা ব্যতীত ভদ্র সাহেব লোক থাকিতে পারেন এমন গৃহ নাই বলিলেই হয়। খৃষ্টান মিশনারিদের বাড়ী ঘর আছে বটে, কিন্তু তাহাতে আগন্তুক লোক থাকিবার সুবিধা কোথা ? এক সময় যে এ স্থানের গৌরব ছিল, তাহার প্রমাণস্বরূপ প্রাচীন গৃহের বড় বড় ভিত্তিগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। স্থানটী বাস্তবিকই অতিশয় মনোহর। চারিদিকে উচ্চ উচ্চ পাহাড় থাকাতে মধ্যস্থিত চেরাকে দুর্ভেদ্য প্রাচীরপরিবৃত বলিয়া বোধ হয়. এখানকার সমতল ভূমিতে বৃক্ষাদির বিরলতানিবন্ধন প্রমুক্তভাবে বায়ু গতায়াত করিতে পারে। সুবিস্তীর্ণ মাঠগুলিতে ভ্রমণ করিবার সুবিধা বিলক্ষণ, এবং

নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জল অপর্য্যাপ্তরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাস্তাগুলি পাকা, সুপ্রশস্ত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আবাসগৃহের অভাবে আগন্তুক বাঙ্গালী-দের এস্থানে বাস করা বড় কষ্টকর ব্যাপার। আর থারিয়াঘাট হইতে পর্ব্বতারোহণের পথও অনেক প্রতিবন্ধকতা জন্মায়। ইঞ্জিনীয়ার মিং উইলিয়েম্‌স্ (Mr. Williams) যে রেলওয়ে প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং যাহার চিহ্ন এখনও আছে, তাহা শেষ করিতে পারিলে যাতায়াতের খুব সুবিধা হইত। তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে অর্থব্যয় ব্যর্থ হইল। শুনা যায় শিলঙ্গের পথের ন্যায় গাড়ী চলিতে পারে এমন একটা রাস্তা শীঘ্র প্রস্তুত হইবে।

শিলং।

শিলং আসিয়া ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি খুব যত্নের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যার সময় সকলকে একটা ব্রাহ্মবিবাহে উপস্থিত থাকিতে হইবে, এজন্য তিনি তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরীর সহিত আমাদিগকে পরিচয় করিয়া দিলেন। হেমন্ত

৮ নবীনচন্দ্র রায়ের কন্যা। ইনি খুব আদর করিয়া আমাদিগকে রাত্রে ভোজনাদি করাইলেন। আমরা যে ফুল সঙ্গে আনিয়াছিলাম, দীনেশ তাহা দিয়া একটা তোড়ার মত প্রস্তুত করিয়া বিবাহবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

শিলং খাসিয়া এবং জন্তিয়া নামক পার্ব্বত্য জেলার প্রধান নগর। এখানে আসাম প্রদেশের চীফ্ কমিশনর, ডেপুটি কমিশনর, পুলিশ এবং জেলসমূহের ইন্‌স্পেক্টার জেনেরেল্ এবং আরও কয়েক বিভাগের প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ থাকেন। এই জেলাকে পোলিটিকেল্ ডিষ্ট্রিক্ট্ বলা যায়। কারণ স্বতন্ত্র এক আইনানুসারে চীফ্ ও ডেপুটি কমিশনর এবং কয়েক শ্রেণীস্থ নেটিব্ চীফ্‌গণদ্বারা এই জেলার শাসনকার্য্য সম্পাদিত হয়। এই জেলা তিন ভাগে বিভক্ত—(১) খাসিয়া পর্ব্বতের বিশুদ্ধ ব্রিটিশাধিকার; (২) খাসিয়া পর্ব্বতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধীন দেশীয় ষ্টেট সমূহ; (৩) জন্তিয়া পর্ব্বতসম্বন্ধীয় বিশুদ্ধ ব্রিটিশাধিকার। ব্রিটিশাধিকারের স্থানগুলি বিশেষ এক আইনানুসারে শাসিত হয় বলিয়া পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

দেশীয়াধিকারগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকতন্ত্র (Democracy)। ইহাদের অধিনায়ক বা "সীম্" গণ, কোন কোন জাতি হইতে "ওহাদাদার", "লিংডো", "সরদার", "পাথর" ইত্যাদি নামক সমাজের প্রধান প্রধান লোকদ্বারা নির্ব্বাচিত ও মনোনীত। কিন্তু ইহাদিগের নিযুক্তি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সম্মতিসাপেক্ষ, এবং ইহারা অপ-রাধজন্য রাজ্যচ্যুতার্হ। হত্যাব্যতীত নিজ নিজ প্রজা-দের আদালত ও ফৌজদারির বিচার সম্বন্ধে ইহারা স্বাধীন। হত্যা এবং অধিনায়কগণের পরস্পর সম্বন্ধীয় বিচার ব্রিটিশ কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পন্ন হয়। ১৭৬৫ সনে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন দেওয়ানী কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন এই জেলার কথা ইংরেজগণ প্রথম অবগত হন। কিন্তু মুসলমান সময়ের ন্যায় তখন এ স্থানের পার্ব্বত্য লোকগুলি স্বাধীন ছিল। যাহা হউক, চূণের কারবার অচিরে ইংরেজদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। এবং ১৮২৬ সনে ইউরোপীয়েনেরা আসিয়া নংক্রেও নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। অনতিকালমধ্যে পার্ব্বত্য লোকদের সঙ্গে মনোবাদ উপস্থিত হওয়াতে ১৮২৯ সনে যুদ্ধারম্ভ হয় এবং

১৮৩৩ সনে এ সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৫৪ সনে কর্ণেল্ লিষ্টার খাসিয়া পর্ব্বতের পোলিটিকেল্ এজেন্ট নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ সন পর্য্যন্ত সৈনিক ও পৌর (civil) বিভাগ একজনের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। এই সনে মিঃ হড্‌সন্ অগ্রে এসিষ্টেন্ট্ কমিশনর, পরে ডেপুটি কমিশনর হইয়া তদানীন্তন প্রধান স্থান চেরাপুঞ্জিতে আসিয়া বাস করেন। জন্তিয়া পর্ব্যন্ত ১৮৩৫ সনে ইংরেজাধিকৃত হয়। জন্তি-য়ার রাজা ইন্দ্রসিংহ তিন জন ইউরোপীয়েনের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় রাজ্যচ্যুত হন। রাজ্যচ্যুত হওয়ার পর তিনি মাসিক ৫০০৲ টাকা পেন্‌শন সহ ১৮৬১ সন পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

ভৌতিক অবস্থা।

সমুদ্রবক্ষ হইতে শিলং সহর ৪৯০০ ফীট্ উচ্চ। ফলে শিলং শৃঙ্গগুলি খাসিয়া এবং জন্তিয়া পর্ব্বতরাজি মধ্যে উচ্চতম। এগুলির মধ্যে যেটী সর্ব্বোচ্চ, সেটী সমুদ্রগর্ভ হইতে ৬৪৪৯ ফীট্ উচু। শিলংস্বাস্থ্যনিবাস "সহর" হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে। এখানে সরকারি একটা বাঙ্গালা আছে। নিরূপিত ভাড়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট

সময়ের জন্য সকলেই এখানে থাকিতে পারে। অক্টোবর মাসে শিলঙ্গের আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে। প্রাতঃকালে এ স্থান হইতে উত্তর দিকে চির তুষারাবৃত হিমালয়ের ধবলাগিরি নামক শ্বেতশৃঙ্গরাজি অতি স্পষ্টরূপে দেখা যায়। আমরা যে স্থান হইতে দেখিতাম সেই স্থানটী বেশ উঁচু বটে। কিন্তু তাহার উত্তরদিকে বহু সংখ্যক পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নত শির, মেঘমালার ন্যায় নভোমণ্ডলে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এত দূর হইতে দেখিতাম বলিয়া বোধ হইত যেন এই গুলির চূড়া, চন্দ্রাতপতুল্য গগণমণ্ডল স্পর্শ করিয়া উচ্চতার এক সীমায় পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মেঘবর্ণ শৃঙ্গগুলির উপর দিয়া যখন মনোহর ধবলাগিরির শ্বেত চূড়া সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়, অমনি অনন্ত ঈশ্বরের অনন্তত্ব আসিয়া হৃদয়াধিকার করিয়া ফেলে। যে দিন প্রথম ধবলাগিরির সৌন্দর্য্য দেখিলাম সেই দিন এই প্রার্থনাটী হইয়াছিল :—

হে সুন্দর পুরুষ! সমস্ত প্রকৃতি একতানে তোমার গুণগান করিতেছে—কেবল আমিই তোমার হাসির সঙ্গে মিশিতে পারিতেছি না। আমার "স্বাধীনতা" আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে সহানু-

ভূতি প্রকাশ করিতে দিতেছে না। এমন কি, আমার শরীর ও মন যে আনন্দপ্রবাহের বেগ বর্দ্ধন করিতেছে, সে আনন্দেও আমার সহানুভূতি নাই। নাথ! ইহাপেক্ষা আর দুর্গতি কি হইতে পারে? দয়াময়! তব পাদপদ্মে আমার স্বাধীনতা বিনষ্ট হউক, যেন আমি সকলের সঙ্গে মিলিয়া আনন্দের কোলাহলে প্রমত্ত হইতে পারি।

বলা বাহুল্য যে, এত উচ্চ স্থানের ভূবায়ু অত্যন্ত শীতল। ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে শিশির জমাট হইয়া যায়। কোন কোন দিন বাহিরের জলও বরফ হইয়া থাকে। ১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের কয়েক দিন গৃহাভ্যন্তরীণ ভূবায়ুর উত্তাপ-পরিমাণ তাপমান যন্ত্র দ্বারা নির্ণয় করিয়াছিলাম। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ভূবায়ুর উত্তাপ।

১৮৯৫ ইং—ফেব্রুয়ারি।

৪ঠা,	অপরাহ্ণ	৭ টা—	৪৭° ফেরেণ্‌হীট্।
৫ই,	পূর্ব্বাহ্ণ	৭½ টা—	৪২° ফেং।
„	অপরাহ্ণ	৫ টা—	৫৫° ফেং।
„	„	১১½ টা—	৩৬° ফেং।
৬ই,	পূর্ব্বাহ্ণ	৬½ টা—	৩৮° ফেং।

৬ই, অপরাহ্ণ ৩ টা—৫০.৫° ফেং।
৭ই, পূর্ব্বাহ্ণ ৭ টা—৪০° ফেং।
" অপরাহ্ণ ১ টা—৫৩.৫° ফেং।
" " ৭½ টা—৫৩° ফেং।
৮ই, পূর্ব্বাহ্ণ ৭ টা—৪২° ফেং।
" অপরাহ্ণ ১০½টা—৪৮° ফেং।
৯ই, পূর্ব্বাহ্ণ ৭½টা—৪৪° ফেং।
১০ই, পূর্ব্বাহ্ণ ৫¾টা—৪৪° ফেং।
" অপরাহ্ণ ৫½টা—৫৪° ফেং।
" অপরাহ্ণ ১০½টা—৪৯° ফেং।
১১ই, পূর্ব্বাহ্ণ ৮ টা—৪৬° ফেং।

লাবান।

শিলং সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ যে দুইটী টীলাতে লোকের আবাসস্থান আছে, তাহার অন্যতর একটীর নাম লাবান। এই স্থান নূতন আবাদ বলিয়া এখানে লোকের সংখ্যা কম এবং স্থানটী পরিষ্কার। এখানে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী মহাশয়ের বাড়ী। তাঁহার পরিবার দেশে ছিলেন বলিয়া বাড়ীটা খালি ছিল। তিনি দয়া করিয়া আমাদিগের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন। ইহা আমাদের পক্ষে খুব উপযোগী

হইল। বাড়ীটি যেমন উচু, তেমনি পরিষ্কার। চতুর্দ্দিক্ খোলা থাকাতে সারা দিন বায়ু ও রৌদ্র পাওয়া যায়। শিলঙ্গের উচ্চতম শৃঙ্গে আরোহণ করিবার একটা পথ লাবানের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা আমাদের বাড়ী থেকে সহরের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতাম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঢাকা হইতে রওয়ানা হওয়ার পর হইতে শ্রীমান্ দীনেশের শরীর ক্রমশঃ ভাল বোধ হইতেছিল। শিলং পৌঁছার পরও ঈশ্বর-ইচ্ছায় অবস্থা তদ্রূপই ছিল। ক্রমে ক্রমে জ্বর কমিতে লাগিল। আহারে রুচি জন্মিল, শ্রীমান্ কিছু কিছু করিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তথাকার সিবিল-সার্জ্জন ডাক্তার কেরল্ (Dr. Carroll) সঙ্গে শ্রীমানের দেখা হইলেই তিনি বলিতেন, "তুমি এত বেড়াইতে পার তোমার আবার বেয়ারাম কি? তোমার শরীর যে সুস্থকায় লোকদিগের মত।" শ্রীমান্ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিবার জন্য সাহেব আমাকেও সময় সময় বলিতেন। এই ভাবে নবেম্বর মাস গত হইল। শ্রীমান্ এখন ক্রমে ক্রমে সংসারের কাজ কর্ম্মের দিকে

মনোযোগ দিতে লাগিলেন। হাট বাজার করিবার জন্য নিজেই যাইতেন; লাবানস্থ বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দয়া এবং নিজের স্বভাবের গুণে শ্রীমান্ সকলের ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠিলেন। আস্তে আস্তে শরীর যতই সবল হইতে লাগিল, ততই দূরস্থ জেল্‌রোড্ নামক পল্লীস্থ আত্মীয়গণের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে আরম্ভ করিলেন। তত্রত্য গোবীজপ্রস্তুতের কার্য্যালয়ের (Vaccine Depot) ভারপ্রাপ্ত সিবিল হস্পিটাল্ এসিষ্টেণ্ট্ শ্রীমান্ চন্দ্রনাথ চন্দ আমাদের একজন পরম উপকারী বন্ধু। প্রায় দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া এবং দুই তিনটা টীলা চড়িয়া নামিয়া দীনেশ তাঁহার বাসায় যাইতেন। এত দূর চলিতে তাঁহার কোন কষ্ট হওয়া হওয়া দূরে থাকুক, সঙ্গে কেহ না থাকাতে আরো যে দূরে যাইতে পারেন না, তজ্জন্য তিনি আক্ষেপ করিতেন। সঙ্গী সম্বন্ধে বিদেশভ্রমণকালে তাঁহার একটা ক্লেশকর অভাব থাকিত—স্বভাবিক আসঙ্গলিপ্সা পরিতৃপ্তির জন্য বিদেশে লোক কোথায়? আরাতে তাঁহার এই অভাব আমরাও টের পাইতাম। নৌকাতে এক

রকম চলিয়া যাইত। কুমিল্লাতে সঙ্গী পাইতেন; কিন্তু শিলঙ্গে আবার কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। বেড়াইবার কালে তিনি অনেক সময় আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রাতে বেড়ান আবার আমার অভ্যাস বিরুদ্ধ, সুতরাং আমিও প্রায় সঙ্গে যাইতাম না। শিলং শীতপ্রধান পার্ব্বত্য স্থান, এখানে খাদ্য সামগ্রী—মাছ, মাংস, তরকারী—ইত্যাদি শ্রীহট্ট কিম্বা অন্যান্য নিম্ন স্থান হইতে না আসিলে আর পাইবার উপায় নাই। "বড় বাজার" নামক একটা সাপ্তাহিক হাট আছে—হাটের দিন আমাদিগকে সব দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া রাখিতে হইত। মাংসের জন্য পাখী কিনিয়া রাখিতে হইত। সপ্তাহান্তে যেগুলি অবশিষ্ট থাকিত, কিম্বা প্রথম হইতেই যেগুলি পছন্দ করিতেন, সেইগুলিকে খাওয়ান এবং উহাদের যত্ন করা তাঁহার একটা প্রমোদকর দৈনিক কার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, তিনি যেগুলিকে যত্ন করিতে লাগিলেন, সেইগুলি আহারের জন্য ব্যবহার করা যাইত না। ক্রমে যত পাখী বাড়িতে লাগিল তত তাঁহার আমোদ এবং কার্য্যও

বাড়িল। এইগুলির প্রতি তাঁহার এত ভালবাসা দেখিয়া বারংবার আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। ঘটনা বশতঃ আমরা যখন শিলং পরিত্যাগ করিয়া আসি, তখন পাখীগুলি কাহাকে দিব এই প্রশ্ন হয়। শ্রীমান্ জানিতেন, নিরামিষভোজী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী বৈ আর কাহাকেও পাখী দেওয়া যাইবে না। কাজেও তাহাই করা হইল। এখানে অন্য সঙ্গী না পাইলেও কয়েকটী বালক বালিকা পাইয়া তিনি বড়ই সুখী হইয়াছিলেন। রাজচন্দ্র বাবুর একটী শিশু বালক ছিল। সকলে তাহাকে "তাঁতিয়া ভীল" বলিয়া ডাকিত। শিশুটীর চাল চলন, কথা বার্ত্তা অতি মিষ্ট ছিল। দীনেশ তাহাকে লইয়া কত না আমোদ করিতেন। রাজচন্দ্র বাবুর কন্যা শৈলজা ও শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেনের কন্যা সুপ্রভা এবং পুত্র "ভুতা"ও তাঁহার বিশেষ আদরের পাত্র ছিল। সুপ্রভা এবং ভুতা তাঁহার নিকট পাঠ শিখিতে আসিত। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের একটী শিশু কন্যার আশ্চর্য্য ভালবাসা দেখিয়া আমি বড়ই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। শিশুটীর বয়স বোধ হয় পূরা দেড় বৎসরও নয়, অথচ এমন ভীত

যে আত্মীয় ছাড়া কাহারো কাছে সে যাইত না। কিন্তু দীনেশ অল্পকালের মধ্যেই তাহাকে বশ করিয়া ফেলি-লেন। ক্রিকেট্ ইত্যাদি খেলাতে যে শ্রীমানের স্বাভা-বিক উৎসাহ এবং অনুরাগ ছিল, পীড়ার যাতনায় যদিও তাহা তিরোভাব ধারণ করিয়াছিল, তথাচ উহা একবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই। এজন্য শিলং আসিয়া যখন যখন বেড়াইতে যাইতেন, তখন সাহেবদের ক্রিকেট্ ও গল্‌ফ্ খেলা দেখা একটা উদ্দেশ্য থাকিত। শনিবারের ২টার ছুটীকালে সাহেবেরা যখন ক্রিকেট্ খেলিতেন তখন শ্রীমান্ প্রায়ই খেলা দেখিতে যাইতেন। সাহেবেরা তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া খেলিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও ডাক্তারের নিষেধ আছে বলিয়া যোগ দিতে পারিতেন না। ডাক্তার সাহেব খুব গল্‌ফ্ খেলিতেন; সুতরাং দীনেশের সঙ্গে তাঁহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। তখন তিনি তাঁহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং নানা বিষয়ে সদুপদেশ ও উৎসাহ দান করিতেন।

বীডন্স্ ফল্।

এ দিকে জ্বরের গতি আরোগ্যের দিকেই চলিল—

জ্বর একবারে পরিত্যাগ না হইলেও অত্যল্পমাত্র ছিল। প্লীহাটা আর হাতে লাগিত না, আহারাদি সুন্দর-রূপেই করিতে লাগিলেন, শরীরও একটুকু পুষ্ট হইল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া আশা করিতে লাগিলাম এবার বুঝি শ্রীমান্ আরোগ্য লাভ করিলেন। শ্রীমানের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া এখানকার উচ্চতম শৃঙ্গগুলি দেখিবার প্রস্তাব করিলাম। সেইগুলি স্বাস্থ্যনিবাসের নিকট-বর্ত্তী—শিলং হইতে সাত মাইল দক্ষিণে। ঘটনাক্রমে আর সেই শৃঙ্গগুলি দেখা হইল না। যাহা হউক সহরের নিকট বীডন্স্ ফল্ (Beadon's fall) নামক যে জলপ্রপাত আছে এক দিন তাহা দেখিবার জন্য শ্রীমান্‌কে সঙ্গে লইয়া গেলাম। চন্দ্রনাথ ডাক্তার আমাদিগকে লইয়া গেলেন। গোবীজ কার্য্যালয় হইতে উহা দুই কি আড়াই মাইল দূরে। আমরা পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময় কিছু জলযোগ করিয়া ১১টা কি ১১½টার সময় জলপ্রপাত দেখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। সমগ্র রাস্তা শ্রীমান্ হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন। পাহাড়ের উচ্চতা বড় কম নয়—বোধ হয় অর্দ্ধ মাইলের ন্যূন হইবে না। ভাল রাস্তার অভাব আবার পাহাড়ে

চড়িবার প্রধান অন্তরায়। দুই এক স্থানে এই খারাপ রাস্তা আবার এত সঙ্কীর্ণ এবং নিম্নস্থ গভীর গুহার এত ধারে যে, তাহা দিয়া চলা যেমন দুষ্কর, তেমনি ভয়াবহ। আমার পক্ষে উহা বিশেষরূপে কষ্টদায়ক হইয়াছিল ; কিন্তু দীনেশ অকুতোভয়ে সে সকল স্থান পার হইয়া গেলেন! বাস্তবিক সেই দিন শ্রীমানের আশ্চর্য্য স্ফূর্ত্তি দেখিলাম। বারবার তিনি সঙ্গের লোক লইয়া আগে আগে চলিয়া যাইতেন এবং আমাদের প্রতীক্ষায় কোন একটা প্রস্তরের উপর বসিয়া থাকিতেন। জলপ্রপাতের নিকট গেলে সেই স্থানের শোভা বড়ই রমণীয় বোধ হইল। বর্ষাবসানে আমরা উহা দেখিতে যাই। সুতরাং তখন তাহার সৌন্দর্য্য তত ছিল না। তবু যাহা দেখিলাম তাহাও তুচ্ছ করিবার বিষয় নয়। আনুমানিক সিকি মাইল ঊর্দ্ধ হইতে ঠিক সোজাভাবে প্রকাণ্ডকায় একটা জলস্তম্ভ নীচের দিকে পড়িতেছে। উহার বেগ যে সতেজ হইবে তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। যে স্থানে জল আসিয়া পড়িতেছে তাহা সুবৃহৎ কুণ্ডাকৃতি। উহার চারিদিক্ হইতে প্রস্তরময় গিরিপ্রান্ত নাতি-

বক্রভাবে ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়াতে বোধ হয় যেন একটা প্রকাণ্ড ধুস্তুর ফুলকে তথায় বসাইয়া রাখা হইয়াছে। অনেকে কুণ্ডের পারে যাইয়া যেখানে জলধারা পড়িতেছে, সেইখানে স্নানাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পথ দুর্গম বলিয়া আমরা আর নীচে গেলাম না। আরোহণকালে যেমন অবতরণ সময় তেমনই উৎসাহের সহিত শ্রীমান্ দীনেশ চলিয়া আসিলেন, অথচ আমি শ্রান্ত হইয়াছিলাম। আসিবার সময় পথে বিশপ্‌স্ ফল্ (Bishop's fall) নামক অতি সামান্য রকমের আর একটা জলপ্রপাত দেখিয়া আসিলাম।

লাবান-শৃঙ্গ।

বলা বাহুল্য এই পর্ব্বত এবং জলপ্রপাত দর্শনে স্বভাবতঃই মনে উচ্চ ভাব উদয়ের সম্ভাবনা। কিন্তু আমার শুষ্ক হৃদয় বিগলিত হওয়ার আশা অত্যল্পই। তবু যাহা কিছু হইয়াছিল সঙ্গীগণসহ তাহা বিনিময় করিবার অবকাশ না পাওয়াতে সেই অল্পমাত্র ভাবোচ্ছ্বাস সহজেই শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। সকলের এক রকম বিশ্বাস না থাকাতেই ভাববিনিময় হইতে পারে নাই। যাহা হউক, আমার এই ক্ষোভ অনেক

দিন রহিল না। কারণ ইহার অনতিকাল পরেই আর এক দিন আমি শ্রীমান্ দীনেশকে লইয়া লাবান-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম। এই শৃঙ্গের উপর দিয়াই পদব্রজে চেরাপুঞ্জি যাইবার পার্ব্বত্য পথ। সেই দিন বড়বাজারের হাটবার; সুতরাং পাহাড়ে উঠিবার কালে আমাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক খাসিয়াদের সাক্ষাৎ হয়—তাহারা পণ্য সামগ্রী লইয়া হাটে যাইতেছিল। শৃঙ্গটা উচ্চ ছিল বলিয়া উঠিতে আমার খুব কষ্ট হইত; কিন্তু দীনেশ অনায়াসেই উঠিতে লাগিলেন। আরোহণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে এমন সময় বিশ্রামার্থ আমরা একটা বড় পাতরের উপর বসিলাম। তথায় উপবিষ্ট হইয়া উত্তর দিকে দৃষ্টি করা মাত্রই দূরস্থ হিমাচলের চিরতুষারাবৃত ধবলাগিরির শুভ্র শৃঙ্গরাজি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। এই মনোহর দৃশ্য দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম,—ক্রমে ক্রমে হৃদয়মন পঙ্কিল সংসারের নীচ ভাব চিন্তাবিমুক্ত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের নানা অবস্থা চির সুহৃদের ন্যায় আমাদের চিত্তকে ঊর্দ্ধের দিকে টানিয়া তুলিল। সকলই অনন্তের ভাবে পরিপূর্ণ।

ধবলাগিরির চূড়া লাবান হইতে যেরূপ, এস্থান হইতেও ঠিক সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। দীনেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "তুমি কি বোধ কর সম্মুখস্থ ধবলাগিরির উপরে উঠিলে আমরা উচ্চতার শেষ সীমায় পৌঁছিব?" শ্রীমান্ বলিলেন, "তাহা কি আর হইতে পারে?—উচ্চতার তো সীমা নাই!" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই অনন্তত্বের সঙ্গে অনন্ত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ আছে কি না?" তিনি উত্তর করিলেন, "এই যে অনন্ত আকাশ দেখিতেছি, ইহা তো এখন আর আমার নিকট নিরাকার শূন্যতা বলিয়া বোধ হয় না—ইহা যে সেই অনাদি, অনন্ত, পূর্ণপ্রেম স্বরূপ মহাপুরুষের গম্ভীর আবির্ভাবে পরিপূর্ণ।" এইরূপে কতক্ষণ ধবলাগিরির উচ্চতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা অনন্ত পুরুষের ভাবে ডুবিয়া রহিলাম। তদনন্তর পার্ব্বত্য ভৌতত্ত্বিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে কালসম্বন্ধীয় আর এক অভিনব অনন্ততা আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। আমাদিগের চারিদিকে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেকগুলি আস্তৃত (stratified)। এগুলি যে কোন

দিন সমুদ্রতলস্থ ক্রমশঃসঞ্চিত বালুকারাশি মাত্র ছিল, হঠাৎ সেই কথা স্মৃতিপথবর্ত্তী হইল। সাগরতল হইতে এই বালুকারাশিকে ভূবায়ুর মধ্য দিয়া অভ্রভেদী পর্ব্বতের উচ্চতা প্রাপ্ত হইতে,কতকালের যে প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা কে করে? কতকালে আবার স্তূপীকৃত এই বালুগুলি নানাবিধ ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া প্রস্তরের আকার এবং কাঠিন্য লাভ করিল, তাহারই বা নির্ণয় কে করে? বলা বাহুল্য যে, সময়ের অসীমত্বও আমাদিগকে সেই অনাদি কারণস্বরূপ পরম পুরুষের দিকে লইয়া গেল। শিলং পর্ব্বত যদিও ঘন গভীর কানন কিংবা বনরাজি-পরিবৃত না হউক, তথাপি অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, লতা, তৃণাদির আয়তন, আকার ও রচনা-বৈচিত্র্য; পত্র, পুষ্প, ফলের সৌন্দর্য্য ও বর্ণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য; এবং প্রস্তরময় পর্ব্বতে এ গুলির পরিপোষণকার্য্য সম্পাদনার্থ নানারূপ ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত দেখিয়া এবং এ সকলে ভগবানের অনন্ত জ্ঞান, বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্য এবং প্রেমিক হৃদয়ের রসগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়া আমরাও ভাবরসে ডুবিয়া গেলাম। এইরূপে কতক্ষণ করুণা-

নিলয় অনন্তপুরুষের সহবাসসুখ সম্ভোগ করিতে করিতে এক দিকে গতক্লম, আর দিকে স্বর্গের শান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। এই সম্ভোগের ব্যাপারে প্রাণের দীনেশ আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহানুভূতি রাখিতেছেন, ইহা জানিয়া আমার আনন্দ দ্বিগুণিত হইল। তৎপর আমরা শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিলাম। সেই স্থানটী সমতল ভূমি। মাঝে মাঝে গবর্ণমেণ্টের সংরক্ষিত সরল বৃক্ষ (a kind of pines) দ্বারা পরিবৃত। নিকটবর্ত্তী একটা টীলার উপর উঠিয়া আমরা নিম্নস্থ শিলং নগর দেখিতে লাগিলাম। সহরটা ছোট একখানি সরার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তথা হইতে নীচে আসিয়া আমরা একটা "সরল" বৃক্ষতলে বসিলাম। এ স্থানটী এমনই মনোরম বলিয়া বোধ হইল যে, আমরা মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া কিছুকাল কাটাইবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু ঘটনাক্রমে আমাদের আর এস্থানে আসা হইল না।

এখন ডিসেম্বর মাস (১৮৯৪) প্রায় শেষ হইয়া আসিল; বড়দিন নিকটে। শ্রীমান্ দীনেশ সাহেবদের মন্দিরে যাইয়া বড়দিনের উপাসনা দেখিবার ইচ্ছা

জ্ঞাপন করিলেন। চেপ্‌লেন্ (Chaplain) সাহেবের অনুমতির কথা বলাতে, তিনি নিজেই যাইয়া অনুমতি লইবেন বলিলেন। এবং তদনুসারে পাদরী সাহেবের অনুমতি লইয়া বড়দিনের উপাসনা দেখিয়া আসিলেন।

সেকাল।

এসময় এক দিবস শ্রীমানের সহিত আমাদের পরিবার সম্বন্ধে আলাপ হয়। একালের বালকদের সঙ্গে আমাদের বাল্যকালের তুলনা করিলে গভীর পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। আমাদের গুরুজনেরা শিশুকালেই আমাদিগকে নিজ বংশের নাম গোত্রাদি শিখাইয়া পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিতেন। পিতৃ-কুলের দিকে পিতা, পিতামহ; প্রপিতামহ এবং বৃদ্ধ-প্রপিতামহের নাম শিখাইতেন। মাতৃকুলের দিকে মাতামহ এবং প্রমাতামহের নাম শিখাইতেন। তার উপর আবার "গাঁই", গোত্র, জাতি, কুল, কৌলীন্য প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা আমাদিগকে শিখিতে হইত। এ সকল বিষয় লইয়া গ্রামবাসী বালকদের মধ্যে খুব আন্দোলন হইত। বিবাহাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া এক গ্রামের বালকেরা অন্য গ্রামে

গেলে, সেই গ্রামের বালকদের সঙ্গে আগন্তুকদিগের বিশেষ বিচার হইত। জয় পরাজয় অবধারণ করিবার জন্য সভাতে বয়স্থেরাও উপস্থিত থাকিতেন। বালকেরা উৎসাহের সহিত "বিচার" কার্য্য সম্পাদন করিতেন। আমি এই "বিচার" কার্য্যে বড় অপটু ছিলাম। সুতরাং কালীকচ্ছ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রামে যাইতে আমি বড় ভয় পাইতাম। যাহা হউক, শ্রীমান্ দীনেশের সঙ্গে সেই দিন আমাদের পরিবার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা যতদূর আমি জানি, তদ্বিষয় অনেকক্ষণ আলাপ করিলাম। শ্রীমান্ বিশেষ আগ্রহের সহিত সে সকল কথা শ্রবণ করিলেন।

মাঘোৎসব।

দেখিতে দেখিতে মাঘোৎসবের সময় আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল। শিলঙ্গে যে ব্রাহ্মসমাজ আছে তাহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শাখা। সুতরাং মিল হইবার কথা নয়। তবু তথাকার ব্রাহ্মগণ আমার সঙ্গে প্রথম হইতেই শিষ্ট ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। প্রথমতঃ লাবান সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাকার্য্যের ভার প্রায়ই আমাকে দিতেন। বিশেষ কার্য্যাদি

উপলক্ষে উৎসব হইলেও লাবান সমাজ এবং কাহারো কাহারো বাড়ীর উপাসনাকার্য্যের ভার আমাকে দিতেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মূল সমাজের বেদীতে কোন কার্য্য করিবার ভার পাই নাই। যাহা হউক, মাঘোৎসবের কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণের সভায় আমাকে আহ্বান করিয়া, উৎসবের মধ্যে দুইদিনকার বেদী সম্বন্ধীয় কার্য্যভার আমাকে দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। যদিও আমি ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মদের নিকট খুব কৃতজ্ঞ হইলাম, তবু আমি আমাকে বিশেষরূপে সঙ্কট-গ্রস্ত মনে করিলাম। তথাকার ব্রাহ্মগণ দৃষ্টতঃ খুব উদার হইলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুগমন ব্যাপারে উহাঁদের একটুকু গোঁড়ামি আছে। মাঘোৎসবের কিছু দিন পূর্ব্বে কোন বন্ধুর প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, তথাকার ব্রাহ্মগণ নববিধানাশ্রিত প্রচারক, উপাসকাদিসম্বন্ধে এরূপ একটী নিয়ম করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহাদের যাঁহারা বেদীর কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইবেন তাঁহাদিগকে নববিধান সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না, 'এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। যদিও তাঁহারা আমাকে এই নিয়ম সম্বন্ধে কোন কথা জানান নাই,

তথাপি আমি এরূপ নিয়মের কথা যখন খুব বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম, তখন আর কেমন করিয়া চুপ করিয়া থাকি? বাস্তবিক এই দূষিত নিয়মের কথা অবগত হইয়া অবধিই ব্রাহ্মদের সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ দেখিতেছিলাম। প্রণালী অবধারণের সভাতে ভগবান্ সেই সুযোগ সংঘটন করিয়া দিলেন। সভ্যগণ যখন আমাকে বেদীর কার্য্যের ভার দিয়া আমার সম্মতি চাহিলেন, তখন আমি সম্মতি না দিয়া "এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে", এই মাত্র জ্ঞাপন করিয়া সভার কার্য্য শেষ করিতে বলিলাম। কার্য্য সমাধার পর তাঁহারা আমাকে আমার বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে বলিলেন। আমি সেই অপকারী নিয়মের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে নিয়মের কথা স্বীকার করিলে পর আমি বলিলাম যে, আমি বেদীর কার্য্য করিতে পারি কিম্বা তাহা আমার কার্য্য ইহা আমি কখনও মনে করি না। বস্তুতঃ আমার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র শরীর বিভাগে, আত্মাসম্বন্ধে নয়। তবু যদি ঘটনাক্রমে কদাচিৎ কখনও এই গুরুতর কার্য্যের ভার আমার স্কন্ধে আসিয়া চাপে, তখন কাজ করিতে

পারি আর না পারি, নববিধান প্রচার করা ভিন্ন আমার লক্ষ্য এবং চেষ্টা আর কিছুই হইতে পারে না। ফলে এরূপ একটি নিয়ম বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহারা যেমন আমাকে বেদীর কার্য্য করিতে বলিতে পারেন না তেমন আমিও তাহা করিবার জন্য সম্মতি দানে অক্ষম। শেষ তাঁহারা অন্য লোককে সেই দুই দিনের কার্য্যভার দিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। সভাভঙ্গের পর সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সদয়চরণ দাস মহাশয় আমাকে উৎসবে যোগদানের জন্য নিজ পক্ষ হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি যে নিয়মিত-রূপে যোগ দিতে পারি না, তদ্বিষয় উল্লেখ করাতে সদয় বাবু বলিলেন আমি না আসিলে তাঁহার উপা-সনার ব্যাঘাত হইবে, সুতরাং উৎসব তিনি সম্ভোগ করিতে পারিবেন না। এ কথার পর আমি আর উপস্থিত থাকিতে সম্মতি প্রদান না করিয়া পারি-লাম না।

এদিকে শ্রীমান্ দীনেশের ইচ্ছা আমরা স্বতন্ত্রভাবে ১১ই মাঘ কিছু করি। আমি দেখিলাম পূর্ব্বের সঙ্কল্পানুসারে ১১ই মাঘ সমস্ত দিবস লাবান পর্ব্বতের

চূড়ার উপর কাটাইলেই ভাল হয়। শ্রীমান্‌কে এই প্রস্তাব জানাইলাম। বলা বাহুল্য, শ্রীমান্ সাতিশয় উৎসাহের সহিত সেই প্রস্তাবে সায় দিলেন। আমরা সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। সদয় বাবু সেই দিন আমার অনুপস্থিতি জন্য মনে কোন প্রকারের কষ্টানুভব না করিতে পারেন এই উদ্দেশ্যে ১১ই মাঘ নিকটবর্ত্তী হইলে এক দিবস ১১ই মাঘ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্কল্প তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে অথচ প্রশস্ত মনে সম্মতি দিয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে বলিলেন "সেই দিন প্রার্থনার সময় আমাকে স্মরণ করিবেন।" আমরা এইরূপে পর্ব্বতের উপরে উৎসব করিবার আয়োজন করিতেছিলাম বটে, কিন্তু ভগবান্ তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য সংসাধনের আয়োজন আর একদিক দিয়া করিতে লাগিলেন। ১১ই মাঘ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া কুয়াশা ও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু ইহাতে বাঞ্ছাকল্পতরুর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইল দেখিয়া আমরা বাড়ীতে বসিয়াই উৎসব সম্ভোগ করিলাম। দুঃখের বিষয় এই, আমার

সেইদিনকার অনুপস্থিতি শিলং ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্যদের মনে নানা সংশয় উপস্থিত করিয়া তাঁহা-দিগকে খুব ব্যথিত করিয়াছিল। সংশয় এত দূর দুরপনেয় হইয়া পড়িয়াছিল, সে আমাকে যাঁহারা বন্ধু বলিয়া আদর করেন, তাঁহাদের নিকট প্রকৃত অবস্থা ব্যক্ত করিলেও তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইল না।

৬। যোগবর্ত্ম
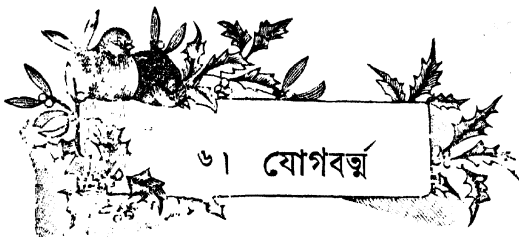
জ্বর প্রত্যাবর্ত্তন।

শ্রীমান্ দীনেশের শরীরের অবস্থা ডিসেম্বর (১৮৯৪) মাসের প্রথম হইতেই অল্প অল্প করিয়া খারাপ হইতেছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপাতে মাঘোৎসবের সময় পর্য্যন্ত অবস্থা এমন হয় নাই যে, জ্বরের সময় ব্যতীত শ্রীমান্‌কে শয্যায় থাকিতে হইত। বাস্তবিক জ্বর পরিত্যাগ হইলেই খাওয়া লওয়া, চলা ফেরা সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইত না। কিন্তু ১৮৯৫ সালের ২১শে জানুয়ারি হইতে শরীর দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করিল। কষ্ট যন্ত্রণাও বিলক্ষণ বাড়িল। এবারকার জ্বরের দুইটি লক্ষণ বড় সুবিধাজনক ছিল না—১ম, ক্ষুধামান্দ্য;

২য়, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। ক্ষুধামান্দ্যের দরুণ শ্রীমান্‌কে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। একেত স্বল্পাহার জন্য দুর্ব্বলতা, তার উপর আবার আমার দৃঢ় অনুরোধ—এতন্নিবন্ধন কত সময় অন্ন সম্মুখে লইয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছে, কত সময় অন্ন মুখে লইয়াও নিগরণে অসমর্থ হইয়াছেন, কত বার বা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নিগরণকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহার উপর আবার নাসিকা হইতে রক্তস্রাব। রক্তস্রাব সময় মর দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়িত—এক দিবস তজ্জন্য ডাক্তার কেরল্ (Dr. Carroll) সাহেবকে ডাকিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্য বশতঃ যদিও তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার করুণা এবং শিষ্টাচারে সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মর্য্যাদার জন্য নিয়মিত ১৬৲ টাকা যে বন্ধু দিতে গিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া টাকা ফিরাইয়া দিলেন "আপনি কি জানেন না যে, ইনি একজন এসিষ্টেণ্ট্ সার্জ্জন এবং আমার সমব্যবসায়ী লোক? আমি তাঁহার নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিতে পারি না।"

এইরূপে জানুয়ারি হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত, অল্পই হউক আর অধিকই হউক, জ্বর প্রায় সর্ব্বদাই হইত। আহারাদি সম্বন্ধেও কোন উন্নতি দৃষ্ট হইল না। মাঝে মাঝে রক্তস্রাবও হইতে লাগিল। কাজেই এবার শরীর একটু বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অধিক চলা ফেরা করিতে পারিতেন না এবং নানা দিক্ দিয়া কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত শিলং অবস্থানের শেষ দিক্ দিয়া যকৃৎটাও বিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্লীহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা এবার খারাপ দেখা গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এ সকল উপদ্রব সত্ত্বেও শ্রীমানের মানসিক স্থিরতা এবং সন্তুষ্টি হ্রাস মাত্র হইল না। জ্বরের সময় চুপ করিয়া থাকা পূর্ব্বে যেরূপ তাঁহার অভ্যাস ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপই দেখা গেল। জ্বরের বিচ্ছেদ হইলেই রীতিমত হাস্য, আমোদ এবং প্রশস্ত মনে আলাপাদি করিতে প্রস্তুত ছিলেন। শিশুরা আসিলে কিম্বা কখনও বা তাহাদের বাড়ী গিয়া তাহাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিতেন। মেয়েরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। মাঝে মাঝে

তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ করিতেন। কোন কোন বাড়ীর মহিলাগণ তাঁহার জন্য নিজেরা ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া পাঠাইতেন। জ্বরের সময় শ্রীমানের ধৈর্য্য দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতেন।. আমি নিজে কতবার সকৃতজ্ঞহৃদয়ে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছি, "ঠাকুর আমার যেরূপ অবস্থা তাহাতে রোগযাতনায় দীনেশ অস্থির হইলে আমি যে কি করিতাম বলিতে পারি না। ধন্য পাপীর প্রতি তোমার স্নেহ!" কি দেখিয়া কি ভাবিয়া শ্রীমান্ এতাধিক পরিমাণে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেন তাহার কারণ জানিয়া আমি বাস্তবিকই অবাক্ ও আশ্চর্য্য হইয়াছি। লোকে বলে যে আমার প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল. তাহাই তাঁহাকে রোগযাতনা সহ্য করিতে সমর্থ করিত। আমার শত সহস্র অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমার প্রতি তাঁহার যে বিশেষ ভালবাসা ছিল, তাহা অস্বীকার করিয়া আমি শ্রীমানের নিকট অকৃতজ্ঞ এবং ভগবানের সম্মুখে অপরাধী হইব না। কিন্তু কে না বুঝিতে পারে যে এতাধিক সহিষ্ণুতা মানব শক্তির অতীত ব্যাপার? ফলে নানা ঘটনাদ্বারা ইহা প্রমা-

ণিত হইয়াছে যে, যাতনার সময় লুকাইয়া থাকিবার জন্য তিনি একটা নিরাপদ স্থান পাইয়াছিলেন। সেই স্থানটী আনন্দময়ী মার শান্তি-ক্রোড়। যখন যখন ব্যথা বেদনাদিতে ক্লিষ্ট হইয়া কাতর নয়নে আমার পানে তাকাইয়া বলিতেন "বাবা, আর তো সইতে পারি না", আমি বলিতাম "বাবা, সমুচিত চিকিৎসা হইতেছে, ভগবানের দিকে তাকাও এবং তাঁহার উপর নির্ভর কর", তখন অমনি চুপ করিতেন। ইহা অনেকবার দেখিয়াছি। বলা উচিত এবার পীড়া বৃদ্ধি হইলে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া সঙ্গীত ও একটী প্রার্থনা করিতাম। তিনি শান্ত সমাহিত-চিত্ত হইয়া আমার সঙ্গে যোগ দিতেন। আমার ভুল হইলে কিম্বা সময় অতীত হইয়া গেলে, তিনি নিজে বলিয়া সঙ্গীত করাইতেন।

শুশ্রূষার প্রয়োজন।

শ্রীমানের শারীরিক অবস্থা এখন যেরূপ হইতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার সেবাশুশ্রূষার বিশেষ বন্দোবস্ত হওয়ার প্রয়োজন হইল। সুতরাং ঢাকা হইতে শ্রীমান্ জ্ঞানেশ ও শ্রীমতী বধূমাতাকে শিলং আসিতে হইল।

দেশীয় ভৃত্যের অভাবে অনেক অসুবিধা থাকিলেও শুশ্রূষার খুব সুবিধা হইল। তাঁহারা দুই জনেই সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগের অবস্থায় বিশেষ কোনরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল না। জ্বর প্রত্যহই আসিতে লাগিল। যকৃৎ ও প্লীহা-বিবৃদ্ধির অবস্থা পূর্ব্ববৎ রহিল। শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শীর্ণ হইয়া পড়িল। এ দিকে শীতকাল শেষ হইয়া যাওয়াতে তথাকার বায়বীয় অবস্থাতে নানা প্রকারের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ফেব্রুয়ারি মাসে তথায় প্রবল বেগে দক্ষিণবায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, আকাশ প্রায় সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং উহা অনেক সময় কুজ্ঝটিকার আকার ধারণ করিয়া বায়ুপ্রবাহে ঘরের ভিতরে আনীত হয়। সূর্য্যের সঙ্গে প্রায় দেখা হয় না। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও পড়ে। তাহাতে আবার বাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া যে বাড়ীতে আসিয়াছিলাম তাহা পার্ব্বত্য একটা জলা ভূমির সন্নিকট ছিল। এ সমস্ত কারণেই বোধ হয় শ্রীমানের শরীরে এ সকল পরিবর্ত্তন ঘটিল।

ব্যবসায়ের প্রস্তাব।

শ্রীমানের অবস্থা যখন অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল,

তখন শ্রীমানের সঙ্গে নানা বিষয়ের সৎপ্রসঙ্গ হইত। মাঝে মাঝে তিনি পুস্তকাদিও পাঠ করিতেন। আমি তখন এবট্‌কৃত নেপোলীয়ন্‌ বোনাপার্টের জীবনী পাঠ করিতাম। সময় সময় সেই মহাযোদ্ধার জীবনের কোন কোন ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণন করিতাম। তিনি সেই জীবনী পড়িবেন, এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। এক দিবস তাঁহার ভাবী জীবন সম্বন্ধে কথা উপলক্ষে বলিলেন, "এখন তো লিখাপড়ার বয়স প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। আমার ইচ্ছা ঠাকুর-দাদার (জ্ঞানেশের) সঙ্গে কোন এক ব্যবসায়ারম্ভ করি। তিনি একাকী যে কিছু করিয়া উঠিতে পারি-বেন, তাহার গতিক বড় দেখি না। বোধ হয় দুই জনে মিলিয়া কাজ করিলে সুবিধা করিতে পারিব। এ সময় শ্রীমান্‌ জ্ঞানেশ দুগ্ধের ব্যবসায় করিবার পরামর্শ করিতেছিলেন। এজন্য আমি যে বাড়ী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে কিছু অধিক ভূমিও রাখিয়াছিলাম। যাহা হউক, অকালে বর্ষারম্ভ হওয়াতে বাড়ী প্রস্তুত হইল না এবং ঘটনানুরোধে আমাদিগকে শিলং পরিত্যাগ করিতে হইল।

শিলং থাকিতে শ্রীমান্ তাঁহার মেজেদাদাকে যে কয়েক খান চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি এখানে প্রদত্ত হইল :—

শিলং। ১৫ নবেম্বর। ৯৪

মেজেদাদা—

তোমাকে প্রত্যেক বুধবার পত্র লিখার কথা ছিল। কিন্তু বাবা কাল তোমাকে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আজ আমাকেই লিখিতে বলিলেন। আমাদের জিনিষ যদি এখনও না পাঠাইয়া থাক তবে এই সঙ্গে বাবার জন্য ১টা ভাল মলিদার টুপি পাঠাইবে। আমি এখানে আসিয়া অবধি ঈশ্বর ইচ্ছায় ভাল আছি। Spleen খুব কমিয়াছে। এবং খুব খাইতে পারি। এখনও কেবল Fowl curry খাই। অন্য কিছু বড় খাই না, ঢাকার পত্র কি পাইয়া থাক? বোধ হয় বোঠানের —— হওয়ার কথা শুনিয়া থাকিবে। বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। ঈশ্বর কৃপায় ভাল হইতেছেন। তোমার কি আর [illegible] হইয়াছে? খুব সাবধানে থাকিবে।

দীনেশ।

শিলং। ২৩ নবেম্বর। ৯৪

মেজেদাদা—

তোমাকে প্রত্যেক বুধবার পত্র লিখার কথা ছিল কিন্তু ভুলে এবারও ঠিকমত লিখিতে পারি নাই। আশা করি ভবিষ্যতে নিয়মমত লিখিতে পারিব। ইতিমধ্যে তোমার পত্র পাইবার আশা ছিল কিন্তু না পাওয়াতে কিছুটা চিন্তিত আছি। ৩রা নবেম্বরের পরে আর তোমার কোন পত্র পাই নাই। আমাদের জিনিষ বোধ হয় পাঠাইয়া থাকিবে। ঈশ্বর কৃপায় আমি এখানে আসিয়া বেশ ভাল আছি। খুব বেড়াইয়া থাকি। Continually ৩।৪ মাইল পাহাড়ের রাস্তায় বেড়াই। এখন খুব শীত। এর ভিতর ২দিন বরফ পড়িয়াছিল। মেঘের জন্য সর্ব্বদা পড়িতে পারে না। আমরা যেখানে থাকি সে পাহাড় অনেক উচু। এর নীচে (প্রায় ১॥ মাইল) যেখানে বশম্বদারা থাকে সেখানে নাকি খুব পড়ে। তোমার শরীর কেমন।

ভুতু।

Shillong, the 28th Nov. 94.

মেজেদাদা—

তোমার ২০শে তারিখের পত্র পাইয়াছি। এত দিন মুজা না পাঠানে কিছুটা অসুবিধা হইতেছে। Value payable এ পাঠাইলেও যে পারিতে। যদি সেই রকম full মুজা না পাও

তবে অল্প দামে অন্য কোন রকম হইলেও পাঠাইবে। তাহা না হইলে কেবল half ই পাঠাইবে। কিন্তু আমার এক জোড়া খুব গরম full আবশ্যক। আমার জন্য এক জোড়া full পাঠাইবে। সতীশ কাকার ছেলের জন্য তোমার আঙ্গুলের ৯ আঙ্গুল মাপের ২ জোড়া full এবং ২ জোড়া half আমাদের জাতীয় মুজা পাঠাইবে। full না পাইলে ৪ জোড়াই half পাঠাইবে। বাবার জন্য এক জোড়া Gloves এবং ১টা শালের টুপি দিবে। Gloves ॥০ মধ্যে পাঠাইবে। আমরা ভাল আছি।

দীনেশ।

শিলং। ৭ই ডিসেম্বর। ৯৪

মেজেদাদা—

তোমার ২৬শে তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। মোজা সম্বন্ধে যাহা ভাল বোধ কর তাহাই করিবে। যদি না পাঠানই হয় তবে শীঘ্রই লিখিয়া জানাইবে, কারণ আমাদের অন্য কোথাও হইতে আনাইতে হইবে। এখানে বড় শীত পড়িয়াছে। মোজার অভাবে কিছুটা কষ্ট পাইতে হয়। আজ কত দিন যাবৎ আমার কিছুটা জর হইতেছে। এক দিন ১০২.৬° হইয়াছিল, এ ছাড়া ১০১°এর বেশী বড় হয় না। ক্ষুধাও মন্দ হয় না, তবে কিনা পূর্ব্বাপেক্ষা কম। তোমার শরীর কেমন আছে? এখনও কি জর হয়? বাবার শরীর ভালই আছে। কালী-

কচ্ছের শরৎ দত্তের মেয়ের সঙ্গে যোগেশের বিবাহ স্থির হইয়াছে শুনিয়া থাকিবে। ২৭শে অগ্রহায়ণ কলিকাতায় বিবাহ হইবে। আর কিছু লিখিবার নাই। ইতি—

দীনেশ।

শিলং। ২২শে ডিসেম্বর। ৯৪

মেজেদাদা—

তোমার ১০ই তারিখের পত্র এবং প্রেরিত জিনিষ যথাসময়ে পাইয়াছি। ইতিমধ্যে বাবা তোমাকে এক খানা পত্র লিখিয়াছেন। বোধ হয় এত দিনে পাইয়া থাকিবে। তাহাতে তিনি খাঁ সাহেব হইতে ঔষধ আনিয়া তোমাকে খাইতে লিখিয়াছেন। আশা করি তুমি এত দিনে ঔষধ সেবন আরম্ভ করিয়াছ। তুমি এ বিষয়ে একটুও তাচ্ছিল্য করিবে না। যাহাতে খুব সাবধানে থাকিয়া পুনরায় সুস্থ শরীর হইয়া খুব মনোযোগের সহিত পড়িতে পার তাহারই চেষ্টা করিবে। এ বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব? আমার general health মন্দ improve করিতেছে না, কিন্তু এখনও মাঝে মাঝে বিকাল বেলা অল্প সময়ের জন্য একটুকু জ্বর হইয়া থাকে। general health যখন improve করিতেছে, তখন আশা করা যায় কিছু কালের মধ্যে ভগবানের কৃপায় ইহাও সারিয়া যাইবে। এখানে খুব শীত পড়িয়াছে। শুনিতে পাই বশম্বদাদের বাসার ও দিকে বাহিরে

কিছুতে জল রাখিলে তাহা জমিয়া বরফ হয়। আমি দুদিন তাদের বাসায় গিয়াছি। তাদের বাসা অনেক দূরে।

দীনেশ

Shillong, the 28th Dec. 94.

মেজেদাদা—

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমার আবার জ্বর হইতেছে শুনিয়া তুমি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছ দেখিতে পাইলাম। এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নাই। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাই তিনি সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁর কৃপায় আমার শরীর ক্রমেই—যদিও খুব slowly—ভাল হইতেছে। জ্বর অল্প কয়েক দিন মাত্র হইয়াছিল, তাও খুব বেশী নয়। আজ কয়েক দিবস যাবৎ একেবারেই হয় না। তোমার শারীরিক অবস্থার কথা তুমি ভাল করিয়া কিছুই লিখ নাই। তাহাতে আমরা কিছুটা ব্যস্ত আছি। আশা করি আগামীতে স্পষ্ট করিয়া সমস্ত লিখিবে। এই পত্র পাওয়া মাত্র ১ ডজন ।১০ দামের মোজা এবং দুই রকমের ছয়টা দস্তানা পাঠাইয়া দিবে। মোজা এই দরে না পাইলে বেশী দরের টাই দিবে। এবং ৩ জোড়া ৵১০ দরের দিও। V. P. তে পাঠাইবে। এই ফরমাস বশম্বদার জামাইর এবং ভাসুরের। শীঘ্র না পাইলে বড় লজ্জিত হব। বাবা লজ্জায় পড়িয়া তাঁর ২ জোড়া হইতে ১ জোড়া এখনি তাঁকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

দীনেশ।

Shillong, 21st Jan. 95.

মেজেদাদা—

কয়েক দিবস গত হইল তোমার একখানা পত্র পাইয়াছি। আমার দুখানা পত্রের এখনও উত্তর দাও নাই বলিয়া এত দিন লিখি নাই। আমি এখনও ঈশ্বরকৃপায় পূর্ব্ববৎ ভালই আছি। যদিও মাঝে মাঝে একটুকু জ্বর হয়। প্লীহা এখনও আছে। তুমি দক্ষিণা বাবুদের জিনিষ কেন পাঠাইতেছ না? বাবা ভাল আছেন। আজ বড় তাড়াতাড়ী।

তোমার ভাই দীনেশ।

Shillong, 18th Feb. 95.

মেজেদাদা—

তোমাকে নিয়মমত পত্র লিখি না বলিয়া তুমি প্রত্যেক পত্রেই অনুযোগ দিয়া থাক; আশা করি এখন হইতে নিয়মিত মত পত্র দিতে পারিব। ইতিমধ্যে আমার জ্বর খুব বেশী হইয়াছিল। ঈশ্বর ইচ্ছায় আজ ৪।৫ দিন যাবৎ আর জ্বর হয় না। দাদা ও বৌঠানকে এখানে আসিতে লিখা হইয়াছে। একটী ভদ্রলোক পরিবার সহ এখানে আসিতেছেন, যদি তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে পারেন তবে বোধ হয় ২৬।২৭ শের মধ্যেই এখানে পৌঁছিবেন। আর যদি সে সঙ্গে না আস্রেন তবে আমাদের অন্য বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আনাইতে হইবে। ইহাতে

কিছু বিলম্ব হইবার কথা। যাহা হউক পরে সমস্ত জানিতে পারিবে। মোজা না পাঠানেতে আমি বড় লজ্জিত আছি।

তোমার দীনেশ।

শিলং। ২৩শে ফেব্রুয়ারী। ৯৫

মেজেদাদা—

তোমার পত্র আমরা পাইয়াছি। ইতিমধ্যে তুমিও আমার পত্র পাইয়া থাকিবে। ঈশ্বর-ইচ্ছায় আজ কাল শরীর এক প্রকার ভালই আছে। তবে কি না মাঝে মাঝে নাক দিয়া বড় bleeding হয়। তাতে অনেক রক্ত যায়। আমার বোধ হয় এই bleeding না হইলে general health আরো শীঘ্র শীঘ্র improve করিত। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক। দাদারা বোধ হয় ৭ই মার্চ্চ এখানে রওয়ানা হইবেন। পরে জানিতে পারিবে। ইতি—

তোমার স্নেহের দীনেশ।

Laban ; Shillong. 13-3-95

মেজেদাদা—

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। Botany খানা পাওয়া গেল কি না জানাইবে। না পাওয়া গেলে শীঘ্র আর এক খানা কিনিয়া নিবে। অন্যথা পড়ার ব্যাঘাত হওয়ার কথা।

দাদাদের এখানে আসার কথা তোমাকে পূর্ব্বপত্রে জানাইয়াছি। গতকল্য তাঁর একখানা Telegramএ জানিতে পারিলাম তাঁহারা গত পরশু রওয়ানা হইয়াছেন। বোধ হয় আগামী শনি, রবিবার এখানে পৌঁছিবেন। বোধ হয় জান মেজ কাকার Influenza হইয়া Pneumonia হইয়াছিল। পীড়া অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক ছিল। এমন কি বাঁচিবার আশা ছিল না। ঈশ্বর-কৃপায় এখন নাকি আরোগ্য লাভ করিতেছেন। আমার শরীর মাঝে মাঝে ভাল থাকে আবার খারাপ হয়। ইতিমধ্যে কয়েক দিন জ্বর হইয়াছিল। এখন ভাল আছি।

তোমার দীনেশ।

Laban, 21-3-95.

মেজেদাদা—

দাদাদের এখানে আসার কথা পূর্ব্বপত্রে তোমাকে জানাইয়াছি। ঈশ্বর-কৃপায় গত শনিবার তাঁহারা এখানে মঙ্গল মত পৌঁছিয়াছেন। বৌঠানের এখানে আসিয়া একটু পেটের অসুখ করিয়াছে। আমারও আজ কয় দিন যাবৎ সর্দ্দি হইয়াছে। তাই এর পূর্ব্বে তোমাকে পত্র দিতে পারিলাম না। আজ কয়েক দিন যাবৎ আমার শরীর ভালই আছে। তোমাদের পরীক্ষা কোন্ মাসে হবে? সর্দ্দির জন্য বেশী লিখিতে পারিতেছি না।

তোমার দীনেশ।

শিলং পরিত্যাগ।

১৮৯৫ সনের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে আমি শ্রীমান্ দীনেশকে লইয়া শ্রীমান্ চন্দ্রনাথ ডাক্তারের সঙ্গে চেরাপুঞ্জির দিকে রওয়ানা হইলাম। ভগবানের কৃপায় তার পরের দিন শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তীর "মিশন হোমে" আসিয়া রহিলাম। পরদিন এখান হইতে রওয়ানা হইয়া যথাসময় ঢাকাতে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাস্তায় আর বিশেষ কোন উদ্বেগ হয় নাই। ছাতকে যে দিন আসিয়া পৌঁছি, সেই দিন রাত্রে জাহাজ না আইসাতে আমাদিগকে নৌকাতে থাকিতে হয়। শিলং হইতে আসিয়া বাঙ্গালার গ্রীষ্ম সহ্য করা বড়ই কষ্টের ব্যাপার। শ্রীমান্ দীনেশ বিলক্ষণ কষ্ট ভোগ করিতেছিলেন। কষ্ট দেখিয়া আমি যখন একটুকু বিরক্তির ভাবে বলিলাম "এই জন্যই ত আমি এ সময় আসিতে চাই নাই।" শ্রীমান্ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া এবং নিতান্ত নিরুপায়ের ভাবে বলিলেন, "এখন আসি... পড়িয়াছি, এখন আর কি করি?" এ কথাগুলি আমার হৃদয়ে লাগিল, বলিলাম "বাবা! কোন চিন্তা নাই, আমি তোমাকে সারা রাত পাখা দিয়া বাতাস

দিব, তুমি শয়ন কর।" পাখার বাতাস পাইয়া শ্রীমান্ নিদ্রিত হইলেন।

ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন।

ডাক্তারদের নিষেধ থাকাতে ঢাকায় আসিয়া আমি আর আমার বাড়ীতে গেলাম না—সাময়িকরূপে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে রহিলাম। তিনি খুব যত্নের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পরে আর একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া আমি শ্রীমান্‌কে লইয়া তথায় রহিলাম যদিও ইউ-রোপে যাইব বলিয়াই শিলং পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, তথাপি আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ শশিভূষণ রায় এবং শ্রীমান্ দীনেশের নিজের অনুরোধে ঢাকাতে কিছুকাল থাকিয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সান্ন্যাল মহাশয়ের চিকিৎসাতে শ্রীমান্‌কে রাখিলাম। এখানে আইসার পর শ্রীমানের অবস্থা অপেক্ষাকৃত একটুকু ভাল ছিল। এই অবকাশে আমি বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ গুতা-উড়াস্থ আমার পৈতৃক বাড়ীতে গেলাম। তথায় আমার মাসাধিক কাল গৌণ হয়। ইহার অধি-কাংশ সময়ই শ্রীমান্ এক প্রকার ভাল ছিলেন—

সর্ব্বদা নিজ হস্তে পত্র লিখিয়া নিজের অবস্থা জানাইতেন। শেষে পুনর্ব্বার জ্বর হইতে আরম্ভ করিল। আমি ঢাকায় আসিয়া শ্রীমান্‌কে লইয়া কলিকাতায় রওয়ানা হইলাম।

চুনার যাত্রা।

আগষ্ট মাসের (১৮৯৫) শেষভাগে আমরা কলিকাতায় আসিলাম। এখানে আসিয়া ডাক্তার ক্রম্বি সাহেবের সঙ্গে ইউরোপ যাওয়াসম্বন্ধে আলাপ করিলাম। আগতপ্রায় শীতকালে ইউরোপ যাওয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দিলেন না—চুনার, এলাহাবাদ, মিরাট ইত্যাদি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় কোন স্থানে যাইয়া থাকিতে বলিলেন। তদনুসারে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আবার আসিয়া চুনার যাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। অবশেষ নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে চুনারে আসিলাম। এখানকার আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ঘোষ মহাশয় খুব যত্নের সহিত আমাদের তত্ত্বাবধান এবং শ্রীমানের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

চুনারে পৌঁছিয়া শ্রীমান্ একটা দৈনলিপি রাখিতে

আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই লিপিতে প্রথম কয়েক দিনের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা অবগত হওয়া যায়। অতএব এখানে উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

৬ই নবেম্বর, বুধবার ১৮৯৫।

অদ্য ১০টার Passenger গাড়ীতে আরা হইতে চুনার রওয়ানা হইয়া ৪টার সময় চুনারে পৌঁছিলাম। ঘোড়ার গাড়ীতে বাড়ী পৌঁছিতে প্রায় ৫।২০ মিনিট হইল। আমাদের বাসা হইতে ষ্টেসন প্রায় ২ মাইল। Third classএ আসিলাম। প্রথমে অপরিষ্কার দেখিয়া কিছু কষ্ট বোধ করিতেছিলাম। শেষে কিছু কাল পরে আর তাহা রহিল না। দীননাথ কর্ম্মকার কাশী হইতে আসিয়া “মোগলসরাইতে” আমাদের সঙ্গে মিশিলেন। রাস্তায় দিদির কথা অনেকবার স্মরণ হইল। এবার আরায় অবস্থানকালে দিদির সম্বন্ধে যে আমার একটা ভ্রম বিশ্বাস ছিল তাহা দূর হইল। আমি ভাবিতাম তাঁর আমাদের প্রতি তত একটা টান নাই; কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত দেখিলাম। যে কয়দিন সেখানে ছিলাম, দেখিলাম সর্ব্বদাই আমার সুখের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত। সর্ব্বদাই আমার জন্য দুবেলা পাক করা, খাওয়ার সময় আমার নিকট বসিয়া থাকা এবং মাঝে মাঝে “তোকে খাওয়াইয়া দেই” বলিয়া জিজ্ঞাসা করা এবং আমার ভাল্‌ টাত মাখিয়া দেওয়া প্রভৃতি তার প্রমাণ। আমাদের চুনারের ব্যব-

হারের নিমিত্ত তাঁর অনেকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিল। খাওয়ার জিনিষও অনেক দিয়াছে। "মোগলসরাইতে" কলাই-করা এক প্রকার সুন্দর গ্লাস ছিল। দিদির তার বড় সখ ছিল। কিনিতে যাইয়া দোকান বন্ধ দেখিয়া মনে বড় কষ্ট হইল যে দিদির মনের সাধ পূর্ণ করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় ভাতের জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছিল। কিছু রাত্রিতে বাবা ডাক্তারের বাড়ী হইতে ভাত পাঠাইয়া দিলেন। তাহা খাইয়া সমস্ত রাত্রির জন্য বিশ্রাম নেওয়া গেল। বাবা রুটি এবং দিদির প্রদত্ত কোপ্তা, আম্‌লেট্ এবং fowl curry খাইলেন। দীনু বাবু এবং চাকর লুচি তরকারী খাইলেন। রেলে বসিয়া ২।৪ বার ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়াছিলাম। বাড়ীতে আসিয়াও তাঁকে স্মরণ হইল।

৭ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার।

অদ্য প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া চা খাইতে প্রায় ৮॥টা হইয়া গেল। বেলা অনেক হওয়াতে বেড়াইতে বাহির হইলাম না। বাড়ীটী প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিলাম, ছোট রকমের একটী ফল বাগান আছে ; এখন তাহাতে আতা, পেয়ারা, লেবু এবং জাম্বুরা পাওয়া যায়। পেয়ারা বেশ সুমিষ্ট। আতা পাড়িয়া ঘরে রাখা হইয়াছে। বাড়ীটী বেশ সুন্দর তবে খুব খোলা নয়। চারিদিকেই সব Retired Soldier দের বাড়ী। এটী একটী মস্ত পাড়া। এরা সব বেশ লোক। ভগবান্‌কে মাঝে মাঝে স্মরণ

হইয়াছে। তবে এই প্রকার স্মরণে যেন মন তৃপ্ত নয়। ইহা যেন এক প্রকার জোর করিয়া স্মরণ করার মত।

পৌনে দু সের করিয়া দুগ্ধ লওয়া হইতেছে।

৮ই নবেম্বর শুক্রবার।

চা খাইতে প্রায় ৭॥টা হইল। তৎপর আমি এবং দীনু বাবু গঙ্গার ধার দিয়া বাজারের দিকে যাইয়া ২খানি চামিচ এবং এক দোয়াত কালি ১৲ দিয়া খরিদ করিয়া প্রায় ৯॥ টার সময় বাড়ী ফিরিলাম। জিনিষ দেখিয়া বাবা বড় তুষ্ট হন নাই। লোকের অভাবে খাওয়া দাওয়ার বড় সুবিধা হইতেছে না। কলিকাতা হইতে আনীত একটা মাত্র চাকর সঙ্গে। বাবুরচি অন্বেষণ করা হইতেছে, কিন্তু পাওয়া যাইতেছে না। বিকাল বেলা বাবা এবং দীনু বাবু দুজনেই বাজার যাওয়াতে আমার বাহিরে যাওয়া হইল না। ভগবান্‌কে মাঝে মাঝে স্মরণ হইয়াছে। রাত্রিতে নিজেই কেরোসিনের চুলাতে ডিম এবং ফুল কপি দিয়া একটা তরকারী রাঁধিয়া নিলাম। কপি এখানে বেশ সস্তা। সমস্ত জিনিষই বেশ সস্তা কেবল চাউলের বড় দাম। ৬।৭ সের টাকায়।

৯ই নবেম্বর শনিবার।

৭। টার সময় চা খাইয়া দীনুবাবুর সঙ্গে Fort পর্য্যন্ত গেলাম। Fortটী গঙ্গার একেবারে উপরে একটী পাহাড়ের উপর স্থিত। খুব উচ্চ। বাসায় ফিরিয়া আসিতে ৮॥ টা বাজিল। আসিয়া ধোবাকে কাপড় দেওয়া গেল। খাইতে ২ প্রায় বেলা

১টা বাজিল। কিছু বিশ্রাম করিতে বিছানায় শুইলাম। এমনি নিদ্রা আসিল, ৪॥টার সময় বাবা ডাকিয়া তুলিলেন। তারাতারী কাপড় পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেলা ছিল না বলিয়া অল্প ঘুড়িয়াই চলিয়া আসিলাম। আজও ডিম এবং কফি দিয়া একটি তরকারী পাক করিয়া নিলাম। ভগবান্‌কে অন্যান্য দিনের (ন্যায়) আজও মাঝে মাঝে স্মরণ হইয়াছে। কিন্তু সন্ধ্যা (বেলা) বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম যে এই প্রকার স্মরণে মনে বড় তৃপ্তি বোধ হয় না। কল্য হইতে এক স্থানে স্থির ভাবে বসিয়া দুবেলা নিয়ম মত তাঁকে ডাকিতে হইবে। এবং তাঁহার জন্য খুব ব্যাকুল হইতে হইবে।

১০ই নবেম্বর রবিবার।

৭টার সময় চা রুটি খাইয়া আলিয়ারকে সঙ্গে নিয়া দীনু বাবুর সহিত বাজারে গেলাম। বাজার হইতে তৈল, ঘী, তরকারী ঘটি প্রভৃতি কিনিয়া তাকে বিদায় দিয়া আমরা চিনির অন্বেষণে যাই। অনেক দূর যাইয়া ১ সের চিনি (দোবারা) ।/১০ দিয়া খরিদ করি। এখানকার ডাক্তারের গাড়ী তখন Jail দেখিয়া বাড়ী আসিতেছিল আমরা ডাকিয়া তাতে চরিলাম। ঈশ্বরকে এই আরামের জন্য ধন্যবাদ। নৈলে কিছুটা কষ্ট হইত। বাড়ী আসিয়া দেখি একটী বাবুরচি নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে মনে আনন্দ হইল। নূতন বন্দোবস্ত বলিয়া রান্না হইতে প্রায় ১২॥ টা হইয়া গেল। খাওয়ার পর বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরদাদা

এবং আশু বাবুকে একখানা পত্র লিখিলাম। বিকাল বেলা দীনু বাবুর সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়া Post officeএ গেলাম। তৎপর office ঘুরীয়া বাজারে গেলাম। বাজার হইতে ২টা প্লেট, ডাক কাগজ এবং বৈয়াম খরিদ করিলাম। একটি Dismissed Driver এর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিল। সঙ্গে কিছু না থাকাতে প্রাতে বাড়ী আসিতে বলিলাম। বাড়ী ফিরিতে ২ প্রায় ৬টা হইল। কিছু বিশ্রামের পর আহার করিলাম। আহারের পর উরুতে একটা ব্যথা অনুভব করিলাম। ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে ২ অসহ্য হইল। প্রায় ১০॥ টার সময় অনিয়ার দ্বারা একটা লিনামেণ্ট মালিস করাতে ঘণ্টা দুই একটু আরামে ছিলাম। তৎপর পুনঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়; আবার লিনামেণ্ট মালিস করি, এবারে একটুকুও কমিল না। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই ভগবানকে স্মরণ করিয়াছি তাঁকে মাঝে মাঝে ডাকিয়াছি। কিন্তু মনে খুব সাই(য় ?) দেয় নাই। ইহাতেই যন্ত্রণা কিছু অধিক কষ্টদায়ক হইয়াছিল। তাঁর জন্য মন খুব ব্যাকুল হইতেছে না। প্রাতঃকালে এক কোণে বসিয়া দুটা সঙ্গীত করি ও একটী প্রার্থনা করি। এখনও প্রার্থনার সময় মন স্থির হয় না। বিকাল বেলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া তাঁকে ডাকা হয় নাই। কেবল মনে মনে স্মরণ করিয়াছি।

১১ই নবেম্বর সোমবার।

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা না হওয়াতে ভোর বেলা একটু ঘুম হইয়া-

ছিল। প্রাতঃকালে উঠিতে প্রায় ৭॥টা হইল। চা, রুটি খাইতে খাইতে ৮।০ টা বাজিল। বেদনাও কিছু কম। বেড়াইতে গেলাম না। পূর্ব্ব দিনের কথামত Dismissed Driver টি আসিলে তাকে ।০ আনা পয়সা দিলাম। আহার করিতে ২ আজও ১টা বাজিল। আহারের পর নিদ্রা গেলাম। উঠিতে ২ ৪॥টা হইল। দুগ্ধ আর ৩ খানা বিস্কুট খাইলাম। বাবা ও দীনুবাবু বেড়াইতে গেলেন। আমি এ বেলাও বাহির হইলাম না। সমস্ত দিন ভালরূপ কাটাইতে পারি না এটা বেশ অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁকে ডাকিবার সময় নানারূপ ওজর আপত্তি আসে। আর যেও ডাকি তাও যেন অভ্যাসবশতঃ। এক বেলাও স্থিরভাবে বসিয়া তাঁকে ডাকি নাই। কেবল মনে মনেই স্মরণ করিয়াছি।

১২ই নবেম্বর মঙ্গলবার।

নিদ্রা হইতে উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল। মুখধোয়ার সময় কিছু রক্ত পরিল। রক্ত বন্ধ হইতে কিছু সময় লাগিল। কাজেই চা, রুটি খাইতে ২ প্রায় ৮॥০ টার অধিক হইল। বেড়াইতে যাই নাই। আজ দুপ্রহরে খাওয়া শীঘ্রই (১১টার সময়) হইল অত্যন্ত ক্ষীধা হয়। মাংস এবং তরকারী খুব খাইতেছি। ভগবানকে ইহার জন্য ধন্যবাদ। আজ নিদ্রা যাই নাই। আচার্য্য জীবনী কিছুটা পাঠ করিলাম। ঠাকুর খুড়াকে এক খানা পত্র লিখিলাম। কিছু খাইয়া দীনুবাবুর সঙ্গে মাঠ দিয়া বেড়াইয়া

গঙ্গার ধারে যাইয়া একটু বসিলাম। মনে একটু আনন্দ বোধ করিতে লাগিলাম। কয়েক বার তাঁকে স্মরণ করিলাম কিন্তু মন ততটা উন্মুখ হইল না। রাস্তায় বাবার সহিত সাক্ষাৎ। তিনি ওস্থানে বসা সুবিধাজনক বোধ করিলেন না। বালুচর হইতে ম্যালেরিয়া উঠে। সন্ধ্যার সময় ভগবানকে একটু স্মরণ করিলাম। তাঁকে মন প্রাণ দিয়া ডাকিতে পারি না বলিয়া মনটা তত সুখী নয়। কিন্তু সে জন্য যে খুব ব্যাকুল হইয়া তাঁর নিকট প্রার্থনা করা তাও হচ্চে না।

১৩ নবেম্বর (১৮৯৫) হইতে আর দৈনলিপি লিখা হয় নাই। কিন্তু শরীরের অবস্থা ঈশ্বরকৃপায় বড় মন্দ ছিল না। ১৭ নবেম্বর হইতে ৭ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শরীর উত্তাপ ১০২° (ফেরেণহীট্)র ঊর্দ্ধে উঠে নাই—বরং অনেক দিন তাহার নীচেই থাকিত। ১লা ও ৫ই ডিসেম্বর শ্রীমান্ তাঁহার মেজ্‌দাদাকে যে ২ খান চিঠি লিখেন, তাহাতে তাঁহার অবস্থা ভাল বলিয়াই জানা যায়। পত্র দুই খান এই :—

24, Lower Lines, Chunar, 1. 12. 95.

My dear Mejedada,

This is just to let you know that we are all right here. Father has written to Madhu Babu at

Calcutta to send you Rs. 18 (Rs. 15 for yourself and Rs. 3 for fruits). Benoy Babu has come here on a trip from Arrah. I shall write to you every thing by and by. Yes, we have got a *Baburchi* here. Excuse haste.

Yours affly
Dines

24, Lower Lines, Chunar, 5. 12. 95.

My dear Mejedada,

We have received your P. C. of the 1st instant. You seem to be very anxious on my account. I did not know it before that father was not writing to you for the last 15 days as you say. You must have recevied my last P. C. by this time, and learnt from it that I am a little better now. The temperature does not rise above 100° now, and there is no bleeding for sometime. Yes, I had a pain in my thigh which gave me great trouble. Glad to say it did not do me any harm.

Yours affly
Dines

---

* বাস্তবিক এই সময় শ্রীমান্ এক রকম ভালই ছিলেন। আহার বেশ করিতে পারিতেন। চলা

ফিরার শক্তিও মন্দ ছিল না। শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমান্ প্রায়ই বেড়াইতে যাইতেন। তখন প্রায়শঃ তাঁহার সঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গ করিতেন—কখন কখন উপাসনাও হইত। মাঝে মাঝে নিকটস্থ একটা বাগান হইতে গোলাপ ফুল আনিয়া উপাসনার জন্য ফুলগুলি একটা পুষ্পাধারে তোড়ার ন্যায় সাজাইয়া রাখিতেন। আমাদের দৈনিক উপাসনাতে প্রায়শঃ দুই বেলাই যোগ দিতেন। এ সময় বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতার একটী যুবক তথায় বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গী চলিয়া যাওয়াতে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকিতে চান। শ্রীমান্ দীনেশ এবং দীনুবাবুরও ইচ্ছা তাঁহাকে বাসায় রাখেন। কিন্তু আমি দেখিলাম, শ্রীমান্কে লইয়াই যখন সময় সময় বিভ্রাটে পড়িতে হয়, তখন আর এক জন রোগীর উচিত শুশ্রূষা কোন মতেই হইবে না। সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও যুবটীকে বাসায় রাখিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তাঁহাকে আমাদের নিকটস্থ একটী বাঙ্গালী বাবুর বাড়ীর নিকট রাখিয়া যতদূর পারা যায়, তাঁহার যত্ন করিতে লাগিলাম। তিনি

আহার এবং নিদ্রার সময় ব্যতীত প্রায়ই দীনেশের নিকট থাকিতেন। মাঝে মাঝে দীনেশ তাঁহাকে খাওয়াইতেন। তাঁহারা পরস্পরকে বেশ প্রীতি করিতেন। শ্রীমান্ দীনেশ আমাদের প্রতিবেশী দুই এক জন সাহেবের সঙ্গেও পরিচিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীমানের বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন।

শ্রীমানের শরীর মোটের উপর এক রকম ভাল থাকিলেও চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি নাই। প্লীহা ও যকৃৎবিবৃদ্ধি প্রায় পূর্ব্ববৎই ছিল। নাসিকার রক্তস্রাব শ্রীমান্‌কে সময় সময় খুব কষ্ট দিত। উরু এবং উদরে বেদনা হওয়াতে দু এক বার তাঁহাকে সাতিশয় যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় দুর্ব্বলতা অনিবার্য্য। জ্বর বেশী হইলে সকল যন্ত্রণাই বাড়িত। মাঝে এক দিন মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। তৎপর আহার করিতে বসিয়া দুই বার মৃদুস্বরে "বাবা" "বাবা" শব্দ উচ্চারণ করিলেন। আমরা তখন উপাসনা করিতেছিলাম। প্রথমতঃ এই শব্দের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু আবার যখন

এই শব্দ হইল, তখন আর তাঁহার নিকট না গিয়া পারিলাম না। যাইয়া দেখি শ্রীমান্ আসনের উপর শুইয়া আছেন। শরীর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। নাড়ী দুর্ব্বল, কথা বলিতে এক প্রকার অক্ষম। জিজ্ঞাসা করাতে কষ্টে বলিলেন, "শরীরের ভাব ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, তবে এই মাত্র যে দুর্ব্বলতা খুব আছে।" অনাহার জন্য এরূপ হইয়াছে জানিয়া, দুগ্ধ খাওয়াইলাম। ঈশ্বরকৃপায় তাহাতেই ফল দর্শিল। তৎপর আহার করিয়া শ্রীমান্ সুস্থির হইলেন।

এসময় মিরটে যাওয়ার প্রস্তাব হইতেছিল। লক্ষ্ণৌ হইয়া যাওয়ার জন্য তথা হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভুবন-মোহন রায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিক শীত পড়াতে এবং সেই সময় লক্ষ্ণৌতে ইনৃফ্লুয়েনৃজা রোগ উপস্থিত থাকাতে ১৬ই ডিসেম্বর (১৮৯৫) আমরা আরাতে ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে শ্রীমতী বিনোদমণি আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভাই তথায় গেলে, শ্রীমতী তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কোন দিক্ দিয়া শ্রীমানের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় সেই জন্য তিনি

সদা ব্যস্ত থাকিতেন। শ্রীমান্‌ও দিদির যত্নে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিতে লাগিলেন। ১৯শে ডিসেম্বর হইতে জ্বরও ছাড়িল। এখন খাওয়া লওয়া, চলা ফিরা বেশ এক প্রকার করিতে পারিতেন। মাঝে মাঝে ভোর ফিরিতে যাইতেন। দিদির সঙ্গে নানা বিষয় আলাপাদি এবং তাঁহার খুকী খোকাদিগকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া একটুকু আরামেই রহিলেন। ডিসেম্বর মাস এই ভাবে কাটিয়া গেল। কিন্তু ১৮৯৬ সনের ১লা জানুয়ারি হইতে পুনরায় জ্বর আরম্ভ হইল। জ্বরের উত্তাপ প্রথমতঃ ১০২° ফেং নীচেই থাকিত—একদিন মাত্র ১০৩.২° ফেং হইয়াছিল। এই ভাবে জানুয়ারি মাস গেল—কিছু কিছু জ্বর হইলেও শরীর খুব খারাপ হয় নাই। তাঁহার শরীরের তদানীন্তন অবস্থা নিম্নলিখিত দুই খানি চিঠিতে অবগত হওয়া যায় :—

Arrah, 6. 1. 96.

মেজেদাদা—

"চুনারে কয় দিন খুব বেশী জ্বর হওয়াতে হঠাৎ চুনার ছাড়িয়া চলিয়া আসি। আরাতে অসিয়াই জ্বর একেবারে ছাড়িয়া যায়;

বোধ হয় ১৪।১৫ দিন একেবারেই জ্বর ছিল না। কিন্তু গত পূর্ণিমার দিন Temperature বাড়ে এবং সেই অবধি আর কমে নাই। ১২ টা হইতে উঠিতে থাকে এবং ৭।৭॥ টা পর্য্যন্ত ১০১.৪ কি ৬ উঠিয়াই কমিতে আরম্ভ করে। আজ তোমাকে ১৮৲ পাঠান গেল। ২৲ টাকা উমেশ বাবুকে দেওয়া গেল। ঠাকুর কাকা পরশু চলিয়া গিয়াছেন, এখানে সকলে ভাল। তোমার কাশীর সংবাদে চিন্তিত আছি। এখনও কি ঔষধ খাও? কাশীর জন্য।

দীনেশ।

আরা, ২৮শে জানুয়ারী (১৮৯৬)

শ্রীচরণকমলেষু—

বৌ ঠান্‌, আপনার দুখান পত্রই যথাসময়ে পাইয়াছি। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অলসতার দরুণ এত দিন উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। আশা করি ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আপনাদের পত্র পাইলে মনে যে কত আনন্দ হয় তাহা বোধ হয় আপনারা বুঝিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে বোধ হয় আরও ঘন ঘন পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে সুখী করিতেন। মুন্সীগঞ্জের জগৎ বাবুর (পানী বাবুর বন্ধু) সঙ্গে খুকীর জন্য একটা গ্লাস দিয়াছিলাম, পাইয়াছেন কি না জানিতে পারিলাম না। খুকী কি এখনও আমাদের কথা খুব জিজ্ঞাসা করে? জানি না কবে আর আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

আমার শারীরিক অবস্থার আমি কোনই পরিবর্ত্তন দেখি না। কত দিন যে এভাবে থাকিতে হইবে ভগবানই জানেন। দুর্গা-নাথ বাবুর লিখা অনুসারে পুল্‌টিস্‌ ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন ফল দেখিতেছি না। তিনি লিখিয়াছিলেন ইহা ব্যবহারে প্লীহা এবং লিভার হইতে জল বাহির হইবে, কিন্তু আমার এক দিনও বাহির হয় নাই। তিনি যদি ঢাকায় থাকিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে একথা বলিবেন।

এখানে খুব সুখে আছি। দুবেলাই দিদি আমার মনের মত নানারূপ তরকারী মাংস ইত্যাদি পাক করিয়া দেয়। আমাকে প্রায় হাতে খাইতে দেয় না। খাওয়াইয়া দিলে বেশী খাইতে পারি বলিয়া প্রায়ই খাওয়াইয়া দেয়। দিদি আমার জন্য অত্যন্ত পরিশ্রম করে। ছোট খোকা বড় হাসীখুসী হইয়াছে। সর্ব্বদাই হাসে, কান্না নাই বলিলেই হয়। বড় খোকাও তার বয়স আন্দাজে অত্যন্ত পাকা। এমন সব কথা বলে যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক দিন বাবা ওর হাতের টাকার চাম ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া খুব ধমক দিয়াছেন। তাতে ও তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল আমি ভাঙ্গি নাই কাঠবিড়ালী খেয়ে ফেলেছে। কোন জিনিষ যখন সে খা[illegible] আর যদি কেহ তাহা চায় তবে ভারী গম্ভীরভাবে বলে এটা খেলে অসুখ করবে। এটা খায় না। এখন হইতেই নানারূপ পশুপাখীর ডাক ডাকিয়া সকলকে হাসায়। এমনে খুব আমোদী কিন্তু মিজাজ বড় গরম।

ঠাকুরদাদাকে বলিবেন আজ লাঠি পৌঁছিয়াছে। সকলেই পাইয়া খুব খুসী! আজ তবে এই শেষ।

আপনার স্নেহের
দীনেশ

পশ্চিমে যাওয়ার চিন্তা এ সময় বারবার মনে উঠিয়াছে; কিন্তু আবস্থিক নানা প্রতিকূলতা নিবন্ধন যাওয়ার পরামর্শ স্থির হইল না। চতুর্দ্দিকে ইন্‌-ফ্লুয়েন্‌জার প্রাদুর্ভাব,তাহাতে মিরটের শৈত্যাতিশয্য, এই অবস্থায় শ্রীমানকে মিরটে নিয়া শুশ্রূষার ত্রুটি-মধ্যে ফেলা কোন মতেই কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল না। শ্রীমান্‌ও আরা পরিত্যাগ করিবার জন্য বড় ইচ্ছুক ছিলেন না। এদিকে আরাতেও ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা উপ-স্থিত। এখানকার এই রোগের প্রকৃতি মৃদু রকমের হইলেও, তাহার ব্যাপকতা বিলক্ষণ—চারি দিকে লোক পীড়িত হইতেছে। সংক্রমণ দ্বারা শ্রীমানের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বিলক্ষণ। কি করা যায়? অনেক ভাবিয়া, এবং ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, আরাতে থাকাই স্থির করিলাম। কারণ

আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, তাহা একটা বাগানের মধ্যে—নিকটে লোকের বসতি তত নাই।

দেখিতে দেখিতে ফেব্রুয়ারি মাস আসিয়া পড়িল। এসময় শ্রীমানের শরীরের অবস্থা বড় সুবিধাজনক ছিল না। জ্বরের প্রকোপ বিলক্ষণই ছিল। নাসিকা হইতে রক্তস্রাবও হইতে লাগিল। জ্বরের সময় শরীরের উত্তাপ ১০২° হইতে ১০৩° ফেং পর্য্যন্ত বাড়িতে আরম্ভ করিল। এদিকে সহরময় ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা ছড়াইয়া পড়িল—লোক যাতায়াতে বিষ সংক্রমণের উপায় বাড়িল। যাহা হউক, যত দূর সাধ্য আমরা সাবধানতা অবলম্বন করিলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত শ্রীমানের অবস্থা প্রায় একভাবেই ছিল।

ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা।

ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখ পর্য্যন্ত শরীরের অবস্থা প্রায় একভাবেই ছিল। কিন্তু ১৩ তারিখ রাত্রি ৯॥টার সময় জ্বরীয় উত্তাপ ১০৩.৬° ফেং হইল। ১৪ তারিখ উত্তাপের পরিমাণ ১০৩° ফেং দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই দিবস নিশীথকালে, অর্থাৎ ইংরেজী মতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পূর্ব্বাহ্ন ১২½ টার সময় হঠাৎ বক্ষো-

দেশে একটা সুতীক্ষ্ণ বেদনা উপস্থিত হওয়াতে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। শারীরিক উত্তাপের পরিমাণ ১০৪° ফেং। বক্ষঃ-পরীক্ষায় কোন রোগ-নিদর্শন পাওয়া গেল না। কিন্তু বেদনার জন্য শ্রীমান্ খুব কাতর হইয়া পড়িলেন। ঈশ্বরের দিকে তাকাইবার জন্য শ্রীমান্‌কে অনুরোধ করিয়া যথোচিত চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে বেদনা অনেকটা কমিল। এবং রাত ১টার সময় উত্তাপ ১০৫° ফেং হইলেও ভগবানের কৃপায় শ্রীমান্ একপ্রকার আরামেই নিদ্রা সম্ভোগ করিলেন।

১৫ তারিখ প্রাতে ৮½ টার সময় হইতে সারা দিন উত্তাপ ১০১.৮° ফেং ছিল ; কিন্তু রাত্রি ১১½ টার সময় ৯৯.৬° ফেং দৃষ্ট হয়। বেদনাও খুব কমিয়া গেল ; কিন্তু বক্ষঃ পরীক্ষায় প্লুরিসি ও ব্রঙ্কাইটিসের ভৌতিক নিদর্শন পাওয়া গেল। শরীরের অবস্থানুসারে এই পীড়া সাতিশয় আশঙ্কাপূর্ণ। কাজেই আমার মন খুব খারাপ হইয়া পড়িল। যাহা হউক, ১৬ই অবস্থা একটুকু ভাল দৃষ্ট হইল। পূর্ব্বাহ্ণ ১২-২৫ সময় উত্তাপ ৯৮.২° ফেং ছিল—সারা দিনের মধ্যে

পূর্ব্বাহ্ণ ১০½ টার সময় একবার ১০১.২° ফেং এবং রাত্রে ১০০° ফেং এর কিঞ্চিৎ মাত্র অধিক হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় শ্রীমানের শারীরিক অন্যান্য অবস্থাও এক প্রকার ভাল বলিয়াই বোধ হইল। তবে ইহা বলিতে হইবে দুর্ব্বলতা এবং ক্লেশবোধ বিলক্ষণ ছিল। শরীরের শীর্ণতাও বাড়িতে লাগিল। এইভাবে ১৮ই পর্য্যন্ত চলিয়া আসিল। ১৯শে তারিখ জ্বর আবার বাড়িল—উত্তাপের পরিমাণ ১০৩·৮° ফেং হইল, নিউমোনিয়া রোগের চিহ্ন স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে কষ্ট, যন্ত্রণা, দুর্ব্বলতাদি অন্যান্য লক্ষণ সকলও খারাপ হইয়া উঠিল। মনে মনে খুব আশঙ্কা। তত্রাপি বলিতে হইবে এই সকল উৎকট রোগেতে যত দূর খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা, ঈশ্বরের কৃপায় শ্রীমানের শারীরিক অবস্থা তদ্রূপ হয় নাই। শ্রীমান্‌কেও তাহা জানাইতে ক্রটি করি নাই। এই দিবস বেলা অপরাহ্ণ ৫½ টার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে শ্রীমানের এইরূপ আলাপ হয় :—

"বাবা বলেন অবস্থা ভাল; কিন্তু আমি তো খুব কষ্ট বোধ

করি। কষ্টের সময় দয়াময়কে স্মরণ করিলে কষ্ট অনেক নিবারণ হয়। কিন্তু সকল সময় তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারি না। আপনি এখন যেরূপ আমার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিলেন, এইরূপ সৎপ্রসঙ্গ হইলে আমার মন একটুকু ভাল থাকে।"

গুরুদাস বাবু যখন রোজ আসিবেন বলিলেন, তখন শ্রীমান্ এরূপ ভাব ব্যক্ত করিলেন যে, শশী (শ্রীমানের একজন বন্ধু)র মত সম-বয়স্ক লোকের সঙ্গে আলাপ হইলে আরো ভাল হয়। তাঁহার সঙ্গে আর এক দিন এরূপ কথা হয় :—

"ব্রাহ্মসমাজে আমরা মতে অনেক কথা শিখিয়া রাখি কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করি না।"

২০ তারিখের অবস্থা প্রায় পূর্ব্ব দিবসের ন্যায়। কিন্তু জ্বরের প্রকোপ অধিক—উত্তাপ পূর্ব্বাহ্নে ১০৪.৬° ফেং। অপরাহ্নে ১০১.২° ফেং।

২১ তারিখ ভোরে ৫ টার সময় শ্রীমান্ নিজেই দীনু বাবুকে সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে দীনু বাবু আমাদের সকলকে লইয়া প্রথমতঃ আমার কথা মতে "শুনেছে তোমার নাম," এই সঙ্গীতটী করেন। তৎপর শ্রীমান্ নিজে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী করিবার জন্য বলিলেন :—

রাগিণী আলেয়া—তাল ঝাঁপতাল।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা॥
যথা আমি যাই নাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়নজলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সঙ্গোপনে, জাগিতেছে সদা মনে,
তিলেক বিচ্ছেদ হলে না দেখি কূল কিনারা;
কখনও বিপথে যদি, যাইতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ওমুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥"

ভগবানের অপার দয়াগুণে এই দিবস জ্বর বেশী হয় নাই—উত্তাপ সকাল হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত প্রায় স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু রাত্রে ১০২° ফেং হইয়াছিল। দুর্ভাগ্য বশতঃ রাত্রি ১০টার সময় হঠাৎ একটা শুষ্ক কাশী আরম্ভ হওয়াতে শ্রীমানের যন্ত্রণা বাড়িল। কফ্ বাহির না হওয়াতে কাশী বার বার হইতে লাগিল; ক্লেশ তজ্জন্যই। বহুক্ষণ পরে ফেনিল শ্লেষ্মা বিনির্গত হইলে একটুকু আরাম বোধ হইল; কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী—অচিরে আবার কাশীর পর্য্যায়ারম্ভ হইয়া পূর্ব্ববৎ যন্ত্রণা আনয়ন করিত। রোগ যে ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা, এখন আর সে বিষয় আমার মনে সংশয়

রহিল না। তবে বক্ষঃ সম্বন্ধীয় গুরুতর ভৌতিক নিদর্শনগুলি সম্বন্ধে আমি নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারি নাই, লাভ করা উচিত বলিয়াও মনে করি নাই। কেন না চিকিৎসার ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহারা উভয়েই সুযোগ্য লোক—আমার অতীব বিশ্বাসের পাত্র। তাঁহারা রোগের অবস্থানুসারে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

এই দিন হইতে আমার মনে গুরুতর আশঙ্কা উপস্থিত হইল। এতদ্দ্বারা আমি ইহা বলিতেছি না যে, পূর্ব্বে যে সকল রোগের লক্ষণ টের পাইয়াছিলাম, তাহা আমি কোন রূপে উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে করিতেছিলাম। ফলে এখন যে ইনফ্লুয়েন্জা উপস্থিত হইল, তাহার গুরুত্ব সেই পূর্ব্বপ্রকাশিত ঔপসর্গিক রোগনিচয়েতেই। যাহা হউক, বাস্তবিকই আমি এখন নানা প্রকার দৌর্ব্বল্যের নিষ্পীড়নাধীন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু ইহা যে ভগবানের শুভ কামনা-অভিব্যক্তির অব্যর্থ প্রমাণ, তাহা এজন্য বুঝিতে পারিলাম যে, মনের সেই ভয়ানক অবস্থায়, আপ-নাকে নিতান্ত নিরুপায়, নিঃসহায় মনে করিয়া এই

পাষাণ মন বারংবার করুণানিলয়ের পানে তাকাইতে এবং তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইত। এই দিনই দয়াময় আমার হৃদয়ে শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের সুন্দর একখানি ছবি আঁকিয়া দিলেন। শ্রীমানের অনুরোধে দীনুবাবু যখন, "তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা," এই সঙ্গীতটী করিতেছিলেন। তখন শ্রীমানের দিকে তাকাইয়া সুস্পষ্ট ঈশ্বরালোকে তাঁহার সমগ্র জীবনের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। দেখিলাম তিনি অনন্তধামের যাত্রী, যোগজীবন লাভ করিয়া, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় আনন্দময়ী মার কোলে বোসে তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া থাকিবার জন্যই তাঁহার জীবন।

এই সময় তাঁহার দাদাদের এখানে আসিবার কথা শ্রীমান্‌কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। মেজদাদা সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিলেন যে, এখন আসিলে পড়ার ক্ষতি হইবে। ঠাকুরদাদা (বড় দাদা) সম্বন্ধে বলিলেন, কোন প্রয়োজন নাই। বধূ-ঠাকুরাণীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে আগ্রহের সহিত তাঁহাকে আনাইতে বলিলেন। বধূমাতা তখন কলি-

কাতায় ছিলেন, টেলীগ্রাফ করিয়া পরদিন তাঁহাকে আনান গেল। ঘটনাক্রমে শ্রীমান্ জ্ঞানেশ এবং আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ দ্বিজদাস রায়, ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ গিরিজারঞ্জনও সেই সময় আরাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২২ ও ২৩ তারিখে আরোগ্যের দিকে আর কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় নাই—জ্বর, কাশী, শ্বাসকৃচ্ছ্র, দুর্ব্বলতা, গ্লানি-বোধ প্রভৃতি সমুদায় লক্ষণই কেবল বৃদ্ধির দিকে। আলম্বিত ভাবে শয্যায় আর শয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। সময়োচিত ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা যত দূর বল ও আরাম বিধান করা যায়, তাহা করিতে ত্রুটি হইল না।

কিন্তু কৃপাময়ীর কৃপাগুণে যাতনা-জনিত শারীরিক এই সকল ঘোর পরীক্ষার মধ্যেও শ্রীমানের মনের অত্যাশ্চর্য্য স্থৈর্য্য। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে বেশী নড়াচড়া নাই—কোঁকান, কান্না, চিৎকার ইত্যাদি আর্ত্তরব একবারে পরিশূন্য। মানসিক যাতনার কোনও লক্ষণ নাই—এত ক্লেশ, এত যাতনা; তারি মধ্যেও স্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত-চিত্ত! বার বার ঔষধ

পথ্যাদির প্রয়োজন; কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে বিন্দু-মাত্রও বৈমুখ্য বা বিরক্তি নাই। ইহার মধ্যে একদিন তাঁহার নিউমোনিয়া হইয়াছে কি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমার মনে সংশয় ছিল বলিয়া আমি ডাক্তারগণকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। আমার কথা তিনি বুঝিলেন তাহা ঠিক; কিন্তু "না" বলিতে পারিলাম না বলিয়া তিনি কখনই আশ্বাসিত হইতে পারিলেন না। বিশেষতঃ ভিতরের অবস্থা তিনি নিজে বুঝিতে না পারিতেন এমন নয়। তবু নৈরাশ্যের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন না—শান্ত, ধীর, গম্ভীর যোগমগ্ন হইয়া পরীক্ষা বহন করিতে লাগিলেন।

করুণা-নিধান ভগবান্ এই তরুণ বয়সে শ্রীমান্ দীনেশের সুকোমল অঙ্গে উৎকট রোগ সঞ্চার করিয়া কেন যে তাঁহাকে ঘোরতর পরীক্ষার ভিতরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা শ্রীমানের রোগকালীন মনের অবস্থা জানিতে পারিলে কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শ্রীমানের মনটা কোন্ দিকে ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস উপরে যাহা লিখিলাম তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া

যায়। কিন্তু এস্থলে তাঁহার মেজদাদা, দিদি এবং শ্রীমান্ শশিকান্তের পত্র হইতে নিম্নলিখিত যে ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিলে দীনেশের ধর্ম্ম, নীতি এবং সত্যনিষ্ঠা যে ঈশ্বর-বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমিতে সংস্থাপিত ছিল—এই ধর্ম্ম-নীতি-এবং সত্যনিষ্ঠা-ব্রত পালনে যে তাঁহার উন্নত মন শান্তি লাভ করিত, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় :—

শ্রীমান্ পরেশের পত্র হইতে উদ্ধৃত :—

"গত বৎসর কুমিল্লার ঘাটে নৌকায় একদিন তাহার অত্যন্ত মাথাব্যথা হয়। আমি তাহার মাথায় Lavender water (লেভেণ্ডার ওয়াটার) দিতেছিলাম। সে চুপে চুপে আমাকে বলিয়াছিল মেজদাদা, যে ভয়ানক মাথাব্যথা হইয়াছে Lavenderএ তার কি করিতে পারে? মায়ের হাত ছাড়া আর ঔষধ নাই। তাই চুপ করিয়া আছি।"

শ্রীমতী বিনোদমণির চিঠি হইতে উদ্ধৃত :—

"একদিন অসুখের সময় তাঁহার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভুতু' বড় কষ্ট হইতেছে? সে তখনই একটী সুন্দর হাসি দিয়া বলিল 'দিদি আমার আর কি কষ্ট? অন্ধ, আতুর কুষ্ঠ-রোগীদের যে ভয়ানক কষ্ট তাহার নিকট ত আমার এই কষ্ট কিছুই নয়।' ...আরাতে এই অসুখের সময়

মাঝে মাঝে দেখিতাম সে সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ঘরটীতে দুই হাত জোড় করিয়া এমন ব্যাকুলতার সহিত সঙ্গীত করিত যেন তাহাতে মনে হইত যে, ভগবানের সহিত তাহার আত্মার মিলন হইয়াছে এবং সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার সহিত মনখুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে।"

শ্রীমান্ শশীর পত্র হইতে উদ্ধৃত :—

"অন্যায় অসত্যকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। সত্য প্রকাশ করিয়া অনেক সময় তাঁহাকে নির্যাতিত হইতে হইয়াছে। যাঁহাকে তিনি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, এমন কোন গুরুজন সম্বন্ধে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন :—"আমাকে misunderstand করিয়া তিনি আমার প্রতি ঠিক ব্যবহার করেন নাই। তবু আমার ইচ্ছা ছিল, একদিন তাঁহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহাকে সব বুঝাইয়া দিব। আর ইহাতে আমার অন্যায় থাকিলে, তাঁহার কাছে সেইজন্য ক্ষমা চাই। কিন্তু আর হইল না*।"

---

* দীনেশের শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন এই গুরুজন যিনিই হউন না কেন, উপরে শ্রীমানের শেষ বাক্যরূপে যে কয় পঁক্তি লেখা হইয়াছে তাহা যদি সেই মহাত্মার চক্ষে পড়ে, তবে তাঁহার নিকট এই ভগ্নহৃদয় হতভাগা জীবনী-লেখকের সানুনয় নিবেদন, তিনি কৃপা করিয়া এই নির্দ্দোষ পবিত্রহৃদয় যুবক সম্বন্ধে যে মিথ্যা সংশয় করিয়াছিলেন তাহা যেন এখন হইতে বিস্মৃত হইয়া যান। এবং দীনেশকে কখনও স্মরণ করিলে সদ্ভাবের সহিত করেন।

৭। অধিরোহণ

রোগপ্রাবল্য।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি সোমবার প্রাতে অবস্থা খুব ভয়ানক হইয়া উঠিল। জ্বর প্রবল, নাড়ী ক্ষীণা, দৌর্ব্বল্য যৎপরোনাস্তি, শ্বাসকৃচ্ছ্র সাতিশয়, যাতনা দুর্ব্বিষহ। মনে হইতে লাগিল প্রাণবায়ু বা এখনই চলিয়া যায়। এ সময় স্বভাবতঃ সকলকেই সেই মহাপরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় থাকিয়া প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছিল।* আমার

---

* এস্থলে সেই দিনকার একটা ক্লেশকর ঘটনার উল্লেখ করা বিধেয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ের সাহায্যার্থ শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয় উপস্থিত এবং প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু সেই সময় কলিকাতাস্থ একজন শ্রদ্ধেয় প্রেরিত মহাশয়ও আরাতে উপস্থিত ছিলেন। দয়া এবং স্নেহপরবশ হইয়া তিনি আমাকে নানারূপে উপকৃত করিতে লাগিলেন। ইহাতে এক দিকে যেমন বিশেষরূপে

তখনকার অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহা বলা অসাধ্য হইলেও সহজে অনুভবনীয়। তবে কিনা করুণানিধানের একটা কৃপা আসিয়া মধ্যে মধ্যে আমাকে সাবধান করিয়া দিত। প্রাতঃকালে শ্রীমানের ভয়ানক অবস্থা দেখিয়া মন যখন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল,

---

লাভবান্ হইলাম, অপর দিকে আমার একটা আশঙ্কা হইতে লাগিল। ইদানিক কলিকাতা এবং ঢাকার মধ্যে যে আশা-এবং ঔচিত্যানুরূপ সদ্ভাব নাই, ইহা গুপ্ত কথা নয়। ইহার কিছু কিছু লক্ষণ আমি সেই সময়ও দেখিতে পাইলাম। এ অবস্থায় আমার সম্মুখে গুরুতর একটা সমস্যা উপস্থিত। আমি অমিলের চির শত্রু। তাহাতে আমার অবস্থা সঙ্কটে পরিপূর্ণ—অগ্রণীদ্বয়ের মধ্যে অশান্তির হেতু বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহাদিগ হইতে আমার তৎকালোচিত সাহায্য লাভে বিঘ্নাতিশয্য উপস্থিত হইবে। বিচারতঃ প্রেরিত মহাশয়ের পক্ষটা দুর্ব্বল। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে একটুকু বিচার করার প্রয়োজন। বিচার প্রণালী ধরিয়া বিবাদমীমাংসা করা আমাদের দেশের রীতি নয়—ধর্ম্মকে বিচারের অধীনে আনা আর ধর্ম্মাবমাননা একার্থব্যঞ্জক। প্রেরিত মহাশয় সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমার তৎকালীন বিপদ সহজে অনুভবনীয়। ইহার মধ্যে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। শ্রীমান্ দীনেশের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলেই তাঁহার মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ, সময়োচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তজ্জন্য ব্যস্ত। শ্রদ্ধেয় প্রেরিত মহাশয়ও বারাণ্ডায় আছেন। তখন আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠিল। মৃত্যুশয্যায় শয়ান লোকদের সুকোমল, দুর্ব্বল, পতনোন্মুখ, স্নায়ুমণ্ডলসম্বন্ধে অন্তিমকালের অবসাদজনক সমাচার কত যে অনিষ্টকর, তাহা চিকিৎসক ভিন্ন আর কেহ জানে না। এদিকে মুমূর্ষু লোকদিগকে, পরলোকযাত্রাকালে, সাহায্য করা ধর্ম্মাচার্য্যগণের গুরুতর কর্ত্তব্য। আমি কি করি? চিকিৎসার জন্য যাঁহারা দায়ী তাঁহারা উভয়ে অনুপস্থিত। আমি আশা এবং নিরাশার সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান—আমি চিকিৎসকদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠানের ঔচিত্য বুঝিলেও

তখন ভিতর হইতে, “সোণার পুতুল যে দিয়াছি, আবার কেন মাটির পুতুল নিয়া টানাটানি?” এই চৈতন্য-বিধায়িকা আশাবর্দ্ধিকা বাণী উত্থিত হইয়া আমার অবসন্ন হৃদয়ে বল বিধান করিল—বার বার করিতে লাগিল।

সারাদিন এই ভাবে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ভগবানের অপার করুণাগুণে শ্রীমানের অবস্থা বহুলাংশে ভাল হইল। সায়াহ্ন ৭ টার সময় একটুকু আরাম বোধ হইলে শ্রীমান্ নিজেই সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভগবদর্চ্চনার জন্য সকলে সমবেত হইলে, শ্রীমান্ নিম্নলিখিত দুইটী সঙ্গীত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দ্বিতীয়টীর “পড়ে

তাহার দায়িত্ব নিজস্কন্ধে লইতে সাহসী হইলাম না। আমার মনের শান্তি এবং তৃপ্তির হেতু এই, আমার মনের সঙ্কল্প শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের ইচ্ছানুযায়ী বলিয়া জানিতে পারিলাম। কারণ একবার একটুকু অবকাশ পাইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলাম “বাবা, এখন কি একবার ঈশ্বরের নাম করা যায়?” প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, “এখন না।” যাহা হউক, কিছুকাল পরে ডাক্তারগণ আসিলে, তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিলাম। নৃত্যগোপাল বাবু প্রার্থনার ভাবে ক্ষণকাল ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন :—“প্রার্থনাদি হওয়া উচিত কিন্তু তাহাতে এমন কোন ভাব ব্যক্ত হওয়া নিষিদ্ধ, যাহাতে শ্রীমান্ তাঁহার আসন্নকাল সন্নিকট ভাবিয়া ভয়প্রাপ্ত হইতে পারেন।” ডাক্তার ঘটকও এই মতের অনুমোদন করিলেন। তাঁহাদের এই মত নৃত্য বাবু প্রেরিত মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলেন।

অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে", এই অংশটুকু তিনি বলিয়া দিলে আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম "'এত দয়া পিতা তোমার', এই সঙ্গীতটী কি?" তখন তিনি বলিলেন, "হাঁ এইটী।"

(১)

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশি দিন অচেতন ধূলি সমান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে,
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে, ফুটে ফুলরাশি
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি;
তব মাধুরী কেন জাগে না প্রাণে
কেন হেরি না তব প্রেম-বয়ান।
পাই জননীর, অযাচিত স্নেহ,
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ;
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে,
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ।

(২)

রাগিনী ঝিঝিঁট-খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

এত দয়া পিতা তোমার, ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।
দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীনহীন আমি অকিঞ্চন হে ;
তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার।
পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে
কোথা দয়াময় বলে হে ;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।
কে জানে এমন করে, ভালবাসিতে পাপীরে,
তোমার মত ভূমণ্ডলে হে ;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্ব্বলে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানা মতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাই আর আপনার হে ;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
নিজ গুণে পাপিজনে কর ভবে পার।

দিবসাপেক্ষা রাত্রে শরীরের অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল থাকিলেও রোগের অবস্থায় আশাপ্রদ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। শরীর ও মনেতে স্পষ্টরূপে কোন ভয়াবহ লক্ষণ উপস্থিত না হইলেও এতদুভয়েতেই অব্যক্ত অথচ সুবোধ্য এমন সকল ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হইল যাহাতে আমি নানা অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া পারিলাম না।

২৪শে হইতে ২৯শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত রোগের অবস্থা প্রায় একই রকম রহিল। চিকিৎসাদি চলিল। দীনুবাবু নিকটে থাকিয়া যতদূর পারেন আধ্যাত্মিক সাহায্য প্রদান করিতে লাগিলেন। আমাদের দৈনিক উপাসনা শ্রীমানের কামরাতেই হইত। ইহার মধ্যে আমি নিজে ইনফ্লুয়েন্জা রোগে আক্রান্ত হইলাম। প্রথমতঃ পীড়া কঠিন বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু ১লা মার্চ্চ রবিবার এত যন্ত্রণা হইল যে, এক এক বা[illegible] মনে হইত, প্রাণের দীনেশের পূর্ব্বেই বা আমি চলিয়া যাই। সারাদিন শয্যা হইতে উঠিতে পারিলাম না। শ্রীমান্‌কেও বড় দেখিতে শুনিতে পারি নাই। রাত্রটা এক প্রকার অস্থিরতা ও অনিদ্রায় অতিবাহিত হয়।

শ্রীমানের কাশী না উঠিলে মনে হয় আজ বুঝি তিনি ভাল আছেন—হৃদয়ের ভার কমিয়া যায়, আশায় প্রাণ একটুকু ভাসিয়া উঠে। রাত্র ভোর হয় হয় এমন সময় দীনু বাবু আসিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "একবার আসিয়া দীনেশকে দেখুন।" ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শ্রীমানের নিকটে গেলাম। দেখিয়া সব ভ্রম দূর হইল, সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। এখন শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।
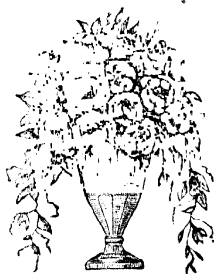
৮। উত্তরণ

স্বর্গের বায়ু।

২রা মার্চ্চ (১৮৯৬) সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ২½ ঘটিকার সময় দীনুবাবুর আহ্বানে আমি শ্রীমানের শয্যার পার্শ্বে আসিলে তিনি আমার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা আর তো পারি না।" আমি বলিলাম "বাবা, মা আনন্দময়ীর কোলে প্রবেশ কর, আরাম সেখানে।" শুনিয়া মস্তক অবনত করিলেন. "বাবা আর তো পারি না," এই তাঁহার মধুর কণ্ঠের স্ফুরিত শেষবাক্য, এই তাঁহার পবিত্রমুখের সুধামাখা শেষ "বাবা" ডাক, এই তাঁহার পার্থিব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে—পরিবার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব

সকলের সঙ্গে বিদায়গ্রহণসূচক আত্মপরিচায়ক দৈহিক শেষ সঙ্কেত। অধোবদন হইয়া কি ভাবিলেন, অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ বুঝিল না। কিন্তু মুখে শান্তির চিহ্ন। দৈহিকভাবে কষ্টের কারণ যথেষ্ট—শ্বাসকৃচ্ছ্র সাতিশয়, নাড়ী ক্ষীণা, মগ্নশীলা, ডুবুডুবু হইয়া আসিতেছে, ললাট ঘর্ম্মাক্ত, মুখ মলিন; মনে হয়, এই বুঝি সময় আসিল। আমার নিজের শরীরও অবসন্ন—কিন্তু এখন কি আর প্রাণাধিককে ছাড়িয়া যাইতে পারি? শয্যার পার্শ্বে বসিলাম; ভাবিলাম শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই সুন্দর মুখচন্দ্রমার দিকে চাহিয়া থাকিব, তাহার অস্তগমন প্রতীক্ষা করিব, প্রাণের পুতুলকে জলে ভাসাইয়া যাইব। কিন্তু তা হইল না, পোড়া শরীর শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কিছুকাল যে যাতনা সহ্য করিব, তা আর হইতে দিল না, কাছে বসিয়া থাকা অসাধ্য হইয়া পড়িল। অগত্যা নিজের বিছানায় গিয়া পড়িয়া রহিলাম—সময় ৫½ কি ৫¾টা।

ইতঃপূর্ব্বে আমাকে জাগাইয়া দিয়া দীনু বাবু ডাক্তার ঘটককে আনিতে গিয়াছিলেন। আমি বিছানায় গিয়া শয়ন করিলে পরই তিনি ডাক্তারকে

লইয়া আসিলেন। তাৎকালিক অবস্থার কথা আর কি বলিব? সময় উপস্থিত। দীনু বাবু আমাকে ডাকিলেন—দেখিলাম প্রাণপাখী পলায়ণপরায়ণ হইয়াছে। সময়োচিত প্রার্থনা করিবার জন্য দীনু বাবুকে বলিলাম। তিনি অন্য কি কাজে আবদ্ধ থাকাতে আর প্রার্থনা করিতে পারিলেন না। এ দিকে আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া আসিল। কি দেখিতেছি? ভিতরকার শারীরিক অবস্থা টের পাইতেছি। শ্লেষ্মাপূর্ণ শ্বাসনলীর অবরুদ্ধতা নিবন্ধন ভিতরে বায়ু খুব কম যাইতেছে—নাক মুখ চাপিয়া ধরিলে লোকের যে অকথ্য কষ্টানুভব হয়, এখন সেই অবস্থা উপস্থিত। মুখের দিকে কি আর তাকান যায়? তবু মুখে যাতনার চিহ্ন বড় একটা দেখা যায় না—হইয়া গেল কি? ঠিক তাই কি ভাবিতেছিলাম? এই নিদারুণ, নিষ্ঠুর ভাবকে মনে স্থান দিয়াছিলাম, মন যে এখনও তা বিশ্বাস করিতে চায় না। কিন্তু সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম, তা তো আর অবিশ্বাস করিতে পারি না। দাঁড়াইয়াছিলাম বটে, কিন্তু মানুষ না চিত্রিত মূর্ত্তির ন্যায়? শ্বাসকৃচ্ছ্রের যাতনা ভাবিয়া যেমন ক্লিষ্ট হই, মুখমণ্ডলে

শান্তির লক্ষণ দেখিয়াও ঠিক তেমনি কষ্টানুভব করি! এই কি চিরশান্তি রাজ্যের আগমন? যে দেহের রূপলাবণ্য বাইশটী বৎসর কত কত নয়নের তৃপ্তি সাধন করিল, যাহার যত্নের জন্য কমলার অমল প্রেম স্বর্গ হইতে ধরায় আসিয়া কত শত হৃদয়কে পাগল করিল, যাহার অন্তরস্থ ভালবাসার সৌরভে কত নর নারী বিমোহিত হইল, তাহাই কি এখন একটা সামান্য বস্তু মাত্র হইয়া পড়িল—প্রেমের আবাসস্থান কি এখন জড়শক্তির ক্রীড়নভূমি হইল? কৈ, তাও তো নয়— আবার যে ক্লেশ, আবার যে নিশ্বাসবায়ু গ্রহণজন্য প্রয়াস! কি অচিন্ত্য, অভাবনীয় ব্যাপার! এ যে স্বর্গ আর মর্ত্ত্য লোকে দৌড়াদৌড়ী, এ যে ইহপর-লোকের সীমান্তরেখায় দণ্ডায়মান থাকা; এ যে ভব-সাগরের পারে দাঁড়াইয়া স্বর্গের শোভা সন্দর্শন করা। মনের ভিতরে কত ভাবই না উঠিতেছে পড়িতেছে! ইচ্ছা হয় শ্রীমানের ভিতরে প্রবেশ করিয়া একবার তাঁহার যাতনার পরিমাণ করিয়া আসি। যাতনাই বা বলি কেমন করিয়া? এ যে ম্লানপ্রায় মুখকমলের শান্তি-আভা। না হয় মধ্যে গিয়া ইহাই একবার

অনুভব করিয়া আসি। তাড়িৎ-বেগে অন্তরের ভিতরে ইত্যাকার কত না ভাবের লহরী খেলিতেছে। বাহিরের অবস্থাও সময়ের উপযোগী। সজল নয়নে, অনিমেষদৃষ্টিতে প্রাণের দিদি শিওরে দাঁড়াইয়া মুখ পানে চাহিয়া আছেন; বউঠাক্রুণ তাঁহার পা. দণ্ডায়মানা; দাদাব চোক দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতেছে; কাকা, ভাই প্রাণের বয়স্য শশী প্রভৃতি সকলেই গলদশ্রুনয়নে রোগশয্যার চতুষ্পার্শ্বে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। গৃহটী নিস্তব্ধতায় পরিপূর্ণ, রজনীর অন্ধকার আগতপ্রায় দিবালোককে আলিঙ্গন করিবার জন্য দু হাত বাড়াইয়া রহিয়াছে; কি সাধ্য মানবের যে, সে মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গভীর ভাবরসে বিভোর না হয়? কোন্ দিকে তাকাই? কি ভাবি, কি চিন্তা করি? কে ইহা বলিতে পারে? আমি কি দেখিতেছি—স্বপ্ন, না প্রকৃত ঘটনা? সত্য সত্যই কি অসম্ভাবিত সম্ভাবিত হইতে চলিল? নয়ন, তুমি কেমন প্রহরী, তুমি কি দেখিতেছিলে? তোমায় ফাঁকি দিয়া যে তিনি চলিলেন? হাত, তুমি কি করিতেছিলে, তোমার বল কোথায় গেল? তুমিও

যে ধরে রাখ্‌তে পাল্লে না! হৃদয়, তোমার কেমন ভালবাসা? প্রেমরজ্জুও দেখ্‌চি ছিন্ন হইতে পারে! ভাবে বিহ্বল, চিন্তায় আকুল হইয়া এদিক্ ওদিক্ দেখ্‌চি। গাম্ভীর্য্যের ভাব ক্রমে গাঢ়তর হইয়া হৃদয় পরিপূর্ণ করিল; মন শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিল; আমি [illegible] এই প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করিল :—

"মা আনন্দময়ি! এই দৃশ্য ছবি তো এখন চক্ষের আড়াল হইতে চলিল। প্রাণের পুতুল তো এখন চিরজীবনের তরে তোমার কোলে লুকাইয়া পড়িতেছে। এখন আর এই ভূতময় মুখের দিকে তাকাইয়া কি করিব? সেই দিন তুমি মাটির ঘটের মধ্যে যে "সোণার পুতুল" দেখাইয়াছ, এবং যে পুতুল তোমাকে "জীবনের ধ্রুবতারা" করিয়া রাখিয়াছেন, এখন আমাদিগকে মা তাহাই দেখাও। এই যে, মা, সেই সুন্দর শিশু-আত্মা পৃথিবীর যন্ত্রণা এড়াইয়া স্বর্গের আরামস্থল যে তোমার প্রেম-ক্রোড়, তাহাতে প্রবেশ করিতেছেন। এই আশ্চর্য্য দৃশ্য, এই স্বর্গের শোভাই তো, মা, এখন আমাদের তাপিত হৃদয়ের শান্তিবারি হইবে। মা, বালকের সুকোমল আত্মাকে তুমি

তোমার শান্তি-ক্রোড়ে গ্রহণ করিলে, দেখিয়া আমরা ধন্য হইলাম। তুমি তাঁহাকে চিরদিন যতনে রাখিও, মা, তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।”

প্রার্থনা শেষ হইতে না হইতেই সংশয় দূর হইয়া গেল। এক দিকে যেমন দিন রাত দুই ভাগ হইল, অপর দিকে তেমনি আত্মা দেহবিমুক্ত হইয়া জীবন মৃত্যুর প্রভেদ দেখাইয়া দিল। এত দিন ভাবিতাম জীবনই সত্য, মৃত্যু কল্পনা মাত্র। কিন্তু সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল ; এখন যে মৃত্যুই সত্য এবং জীবন কল্পনা হইয়া দাঁড়াইল! আর যে দেখ্‌চি না, শুন্‌চি না, ধর্‌তে ছুঁইতে পাচ্চি না। কৈ, সব যে অন্ধকার, সব যে নিস্তব্ধ—বাবা বলে ডেকে কেও তো আর প্রাণ শীতল করে না। প্রাণের দীনেশ তো আর দৌড়ে এসে বাবার কখন কি দরকার দেখ্‌চেন না। বাবার কাপড়, চোপড়ই বা কোথা, বাবার টাকা কড়িরই বা হিসাব রাখে কে? কে বাবার আজ্ঞাপালনের জন্য ব্যস্ত সমস্ত? বাবার বইগুলিতে তো আর কেউ নম্বর দেয় না? কোথায় রে দীনেশ! আমি যে তোকে নিয়ে ইউরোপে যাই। এখন তুইবা কোথা, আমিইবা কোথা? কৈ, তোর জন্য

না আমি সদা সশঙ্কিত থাকিতাম, এখন যে তুই চলে গেলি, আমি তো তোর সঙ্গে গেলাম না! অজানিত অপরিচিত অনন্তরাজ্যে পাঠায়ে দিলাম একটী লোকও সঙ্গে দিলাম না! কেমন করে তুই একাকী এতদূরের পথ যাইবি? তুই যে ভয়েতেই মরে যাবি। পাষাণ প্রাণ আমার, তাই তোকে বিদেশে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত আছি। হৃদয়, তুমি বাস্তবিকই কঠিন, নইলে এখনই ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে। হায়! এই কি ভাল-বাসা? যাকে প্রাণের চেয়ে অধিক বলিয়া মনে করি-তাম, এখন সে গেল চলে, আমি রইলাম বসে! কিছু না, সবই দেখ্‌চি ফাঁকি! কেবা কার বাপ্, কেবা কার ছেলে? এই যে এখন দু এক ফোঁটা চোকের জল পড়্‌চে, আর দু দিন পরে তাই কি পড়্‌বে? মুহুর্ত্তকাল পূর্ব্বে যে দেহকে পবিত্র দেব শরীর, এত যত্ন এত আদরের জিনিষ, এত অমূল্য রত্ন মনে করিতাম তাহা যে এখনই অনাদৃত শবমাত্র হইয়া পড়িল! ইহার মূল্য যে এখন একগাছি তৃণের তুল্য আছে বলিয়াও মনে হয় না। হা! এই সোণার শরীর এখনই যে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্‌বে! ওরা কি আমার কথা শুন্‌বে?

আমিই কি ওদের সঙ্গে বিবাদ করিতে প্রস্তুত? আমার নাসিকাদি ইন্দ্রিয়নিচয়, সর্ব্বপ্রকার সংস্কার এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, এ সমুদায় যে এখনই আমার সঙ্গে দ্রোহিতা করিতে আরম্ভ করিবে! তাই বলি, কেউ কারো নয়, সকলই মিছা—দীনেশ নাই, "আমি" নাই, "তুমি" নাই, তুনিয়ার কিছুই নাই। আত্মন্! সাবধান। জয় সচ্চিদানন্দ হরি।

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই বুঝিলেন দীনেশ আমাদের ক্রন্দন বিলাপ শুনিলেন না—তাঁর "জীবনের ধ্রুবতারা" তাঁকে যে দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন তিনি সেই দিকেই চলিয়া গেলেন। আমরা সকলে যথাসম্ভব হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সম্বরণ পূর্ব্বক শ্রীমানের পবিত্র দেহ পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ কর্ম্মকার মহাশয় এ সময়ের উপযোগী প্রার্থনা করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আসিলেন। কিছুকাল আলাপা-দির পর—অর্থাৎ শ্রীমানের স্বর্গারোহণের পর তুই ঘণ্টাকালের মধ্যে—তিনি দেহ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া একটী প্রার্থনা করিলেন। আমরা দেহ লইয়া বাহিরে

আসিলাম। নব সংহিতার ব্যবস্থানুসারে স্নানকার্য্য দ্বারা দেহ পরিশুদ্ধ করিয়া তাহাতে সুগন্ধ তৈল ও চন্দন লেপন করা হইল। তদনন্তর নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া পুষ্পসজ্জিত নব খট্টোপরিস্থ পরিষ্কার শয্যায় শায়িত করান গেল। ক্রমে ক্রমে বন্ধু বান্ধব সকলে সমাগত হইলেন। বেলা পূর্ব্বাহ্ণ ১০॥টার সময় পরিবারবর্গ এবং বন্ধুগণ দেহ পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে, ভাই দীননাথ প্রার্থনা করিলেন। তৎপর পর্য্যঙ্ক স্কন্ধে করিয়া সকলে শ্মশানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রুগ্ন শরীরে আমার আর শ্মশানে যাওয়া পরামর্শসিদ্ধ হইল না। শ্রীমান্ জ্ঞানেশই আমার স্থানীয় হইয়া যথাকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। দেহসংস্কার কার্য্য শেষ করিয়া ভস্মসহ ভাই দীননাথ কর্ম্মকার ও শ্রীমান্ জ্ঞানেশ বেলা আনুমানিক অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেহ লইয়া নিম্নলিখিত আত্মীয় ও বন্ধুগণ শশ্মানে গমন করিয়াছিলেন :—
শ্রীযুক্ত দীননাথ কর্ম্মকার, শ্রীযুক্ত নবকুমার রায়, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুন্দর সিংহজি, শ্রীমান্ ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীমান্

শশিকান্ত মিত্র, শ্রীযুক্ত দেওরাজ সিংহ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীমান্ জ্ঞানেশরঞ্জন রায়।

সঙ্গীত।

কি ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়;
সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাক্‌লে তাঁরে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু দেখাদিবেন তোমায়।
কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে, গাইয়ে তাঁহার জয়।
শুনেছি আশা বচন, মরিলে পাব জীবন,
চিরকাল থাকিব সুখে, এই তাঁর অভিপ্রায়।
তাঁর কাছে খাঁটি হয়ে, থাক রে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে বসে বল জয় জয় দয়াময়।
নির্জ্জন হৃদিকুটীরে, লয়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দ আহ্লাদে সদা করিব জীবনক্ষয়॥

স্বর্গারোহণের পর।

শ্রীমান্ দীনেশকে বিদায় করিয়া দিয়া আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। পোড়া শরীর আজ খুব ভাল রহিল। আমরা সকলে মিলিয়া কিরূপ শোক-চিহ্ন ধারণ করিব এবং তাহার কাল ই বা কত হইবে এসব ঠিক করিলাম। শ্রাদ্ধ ঢাকাতে করাই স্থির হইল। শ্রাদ্ধের দিন পর্য্যন্ত নবসংহিতার ব্যবস্থানুসারে দৈনিক জীবনযাপনের নিয়ম করা হইল। এতন্মধ্যে প্রাতঃকালীয় সমবেত উপসনা এবং সায়ংকালীন সঙ্গীত ও প্রার্থনা, অন্যতর দুইটী বিষয়।

উপাসনাতে প্রতিদিন আমি একটী করিয়া প্রার্থনা করিতাম। ৪ঠা মার্চ্চ হইতে প্রার্থনাগুলি আমি লিখিয়া রাখিতাম। তাহার সার নিম্নে দেওয়া গেল। কিন্তু অগ্রে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করা বিধেয়। শ্রীমানের রোগ যখন খুব কঠিন হইয়া পড়িল, তখন কলিকাতা গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেল (Great Eastern Hotel) হইতে একটা এয়ার-বেড (Air bed) পাঠান জন্য লিখা যায়। শৈথিল্য বশতঃ তাহা আর উচিত সময়ে আইসে নাই। ইচ্ছা ছিল সেইটা ফিরাইয়া দি। কিন্তু দুঃখী কাঙ্গালীদের প্রতি শ্রীমানের প্রগাঢ় ভালবাসার কথা স্মরণ হওয়াতে আরার হস্পিটেলে নিম্নলিখিত চিঠি সহ তাহা প্রদত্ত হয়:—

From

Babu Doorga Doss Roy

Retired Asstt. Surgeon

To

W. F. Murray Esq. M. B.

Civil Surgeon of Shahabad.

Dated, Arrah the 7th March 1896.

Sir

I beg to send herewith an air-bed just received from the Great Eastern Hotel of Calcutta. The

history of the air-bed is full of melancholy interest to me. It was ordered for my son Sriman Denesh Ranjan Roy, whom you once kindly saw here, and about whom I spoke to you only the other day. It came too late to be of any use to my boy, whom it has pleased the Lord to take away from me on the 2nd March 1896. It would be a great consolation to me now if the sick poor of the Arrah Charitable Dispensary find from the air bed that relief which it was intended to give to the boy, who would himself, if living, delight to see such use made of it. May I therefore solicit the favor of your accepting the air-bed for the use of the Dispensary?

I have, &c.
Doorga Doss Roy.

এয়ার-বেডের উপর নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা লিখা আছে :—

To
THE SACRED MEMORY OF HIS BELOVED SON
SRIMAN DENESH RANJAN ROY
THIS AIR-BED IS PRESENTED TO THE ARRAH CHARITABLE DISPENSARY.
By
Doorga Doss Roy
Retired Asst. Surgeon
Arrah, 6th March 1896.

দৈনিক প্রার্থনা।

আরা, ৪ঠা মার্চ্চ ১৮৯৬, বুধবার—মা, আরাধনায় শুনিলাম, আমাদের প্রাণের সুন্দর পুতুলটী লইয়া গিয়া তুমি এখন আমাদের ভাল মা হইয়াছ। দীনেশ যাঁহাকে "জীবনের ধ্রুবতারা" করিলেন, যিনি স্বীয় কোমল কোলে প্রাণের দীনেশের শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট মস্তকটী সাদরে গ্রহণ করিলেন, তিনি আমাদের ভাল মা বৈ আর কি হইতে পারেন? দীনেশ তোমাকে ভালবাসিলেন, তুমি দীনেশকে ভালবাসিলে; তবে তো মা তোমার সঙ্গে আমাদের প্রেমের একটা নূতন সম্বন্ধ হইল। জননি! কৃপা করিয়া, এই সম্বন্ধ দৃঢ় করিয়া দাও।

৫ই, বৃহস্পতিবার—আজ তিন দিন গত হইল প্রাণের দীনেশ চোকের আড়াল হইয়াছেন। কিন্তু এর মাঝেই যে তাঁহার সেই সুন্দর মুখখানি অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে! মা, তবে আর দুদিন পরে কি হইবে? আমরা তো আর চেষ্টা করিয়াও সেই মুখের ছবি হৃদয়পটে আঁকিতে পারিব না। এই কি তাঁহার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ? না মা, তা কেন হইবে?—এক দিক্ দিয়া যেমন "মাটির পুতুল" অস্পষ্ট হইতেছে, আর এক দিক্ দিয়া তেমনি "সোণার পুতুল" আসিয়া হৃদয়াধিকার করিতেছে। আহা! দীনেশের শিশু আত্মা অনিমেষনয়নে তাঁহার "জীবনের ধ্রুবতারার" পানে তাকাইয়া আছেন,—এ কি সুন্দর দৃশ্য! জননি, এ পরিবার যেন তোমাকেই "জীবনের ধ্রুবতারা" করিতে পারে।

৬ই, শুক্রবার—মা "মাটির পুতুল" নিলে, "সোণার পুতুল" দিলে, একি একটা কথার কথা ? তা যদি হইবে তবে আর আজ কেন দীনেশের সুন্দর শিশু আত্মার শৃঙ্খলা-ও সৌন্দর্য্যানুরাগ আমাকে এত পাগল করিবে ? "জীবনের ধ্রুবতারার" সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া দীনেশ যে, মা, আমাদিগকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। দয়াময়ি, আশীর্ব্বাদ কর, আমরাও সেই সৌন্দর্য্যে মাতিয়া যাই।

৭ই, শনিবার—মা, আজ তোমার স্বর্গের শিশুর বয়স পূর্ণ পাঁচ দিবস হইল। আজ তুমি তাঁহার সহিষ্ণুতা মূর্ত্তিমান্ করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলে। মাতৃহীন শিশু দীনেশের কোন আদর নাই, যত্ন নাই, তবু শিশু হাস্যমুখে, সন্তুষ্টচিত্তে জীবনের ভারবহন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের আরমাণী-টোলাস্থ প্রজার অন্যায় প্রহার সহ্য করিয়া কেমন আনন্দমনে তাহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন ! শিশু দীনেশের শেষ জীবনের সহিষ্ণুতা বীরজনোচিত, সন্দেহ নাই। রোগ-শয্যায় কেমন ধৈর্য্য—কেমন শান্তিসম্ভোগ ! বাস্তবিক তাঁহার সহিষ্ণুতাতে যীশু প্রকৃতির একটুকু পরিচয় পাইতেছি। মা, এই পরিবার দীনেশের পদতলে বসিয়া সহিষ্ণুতা শিক্ষা করুক।

৮ই, রবিবার—মা, আজ তোমার স্বর্গের "সোণার পুতুলের" পরদুঃখকাতরতা আমাদের চক্ষের উপরে ধরিলে। শিশু সাধ্যানুসারে যে দুঃখী কাঙ্গালীর সঙ্গে সমদুঃখী হইয়া তাহাদের

ক্লেশমোচনের জন্য কত যত্নই না করিয়াছেন,—নিজের রোগ যন্ত্রণার ভিতরেও কেমন অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠরোগীর জন্য ভাবনা! মা, ভিতরে ভিতরে এই শিশু কোথা হইতে পাপী, তাপী, দুঃখীকে ভালবাসিতে শিখিলেন? বাস্তবিক মা তাঁর রক্তে যীশু কেলি করিতেছিলেন বলিয়াই তিনি পরের জন্য এত ভাবিতে পারিতেন। জননি! আমাদিগকে প্রাণের দীনেশের সঙ্গে একাত্মা কর। মা, এখন আর একটী বিষয় তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি। বৃদ্ধ কালীকিশোর বিশ্বাস মহাশয় পুত্রহারা হইয়া মা কি অবস্থায় আছেন তাহা তুমি জান। আমরা দুর্ব্বল, আমরা তাঁহার যাতনা মনে করিতেও কষ্টানুভব করি। আমরা এতদিন প্রস্তুত হইয়াও যখন যাতনার একশেষ অনুভব করিতেছি, বৃদ্ধ যে পুত্রকে কোলে করিবেন বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই পুত্রকে হঠাৎ হারাইয়া কিরূপে স্থির থাকিবেন? দয়াময়ি! তাঁর অন্তরে তুমি প্রকাশিত হইয়া শান্তিবারি বর্ষণ কর।

৯ই, সোমবার—দয়াময়ি! আজ যে মন বড় অস্থির, তা তুমি জান। মা, আজই আমরা প্রাণের পুতুলকে এ সংসার হইতে বিদায় দিয়াছি, এই সোমবারেই তো তোমার দীনেশ দেহমুক্ত হইলেন। তা বলিয়া কি বলিব, দীনেশকে আমরা হারাইলাম? না মা, দীনেশ যে "সোণার পুতুল" হইয়া আমাদের হৃদয়ের ভিতরে রহিয়াছেন। আজ তাঁর বয়স পূর্ণ সাত দিন হইল।

শিশুর চিন্ময় রূপের কত ছটা এই কয় দিনই দেখাইলে! আজ তাঁর সত্যনিষ্ঠা এবং ন্যায়পরতা আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। নাট্যশালার ব্যবহারে কি দেবভাব! যেখানে মানুষের চক্ষু যায় না, যেখানে স্বার্থের দিকে দেখিয়া কার্য্য করিলে কেউ দেখ্‌তে পাইত না, সেখানে দেবতা ভিন্ন কে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে? সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতার এই দৃষ্টান্ত মা, আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শক হউক।

সন্ধ্যার সময় ভস্মের সম্মুখে—জননি! শরীরের দিক্ দিয়া দেখিলে তো হৃদয়ধনের পরিণাম কেবল এক মুষ্টি ভস্ম। তবে আমার দীনেশ কি ছাই মাত্রই? তা কখনই নয়। দীনেশের দেহ এখন বিশ্বব্যাপী—উহার পরমাণুগুলি কোথায় তোমার কি অভিপ্রায় সংসাধন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে করে? এই ভস্মের এক একটী পরমাণু কি সামান্য জিনিষ? উহাদের ভিতর যে আত্মার পরিচয় পাইতেছি—দীনেশের আত্মা, যোগেশের আত্মা, রাসমণির আত্মা, আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর আত্মা, মুসা ও ঈশার আত্মা এবং তোমার আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছি। মা! আশীর্ব্বাদকর আজ হতে এই ভস্মগুলি যেন আমাদের পবিত্র তীর্থস্থান হয়।

১০ই, মঙ্গলবার—জননি! আজ তুমি দীনেশের বিশ্বাসের দিকে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছ। মানব অগ্রে জড়েতে, তৎপর মাতাপিতার প্রেমরূপ আত্মাতে এবং শেষে ঈশ্বরেতে বিশ্বাসী

হয়। সকলেই ইহা টের পায়—নববিধানের গুণে আমরা ইহা দেখিতেছি। প্রাণের দীনেশের বিশ্বাস যে খাঁটি ছিল, শ্রীমানের রোগ-শয্যায় তাহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। রোগ-শয্যায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া যে কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন, এবং আনন্দময়ী মার কোলে মাথা রাখিয়া যে আরাম বোধ করিতেন, তাহাই তাঁহার বিশ্বাসের প্রমাণ। মা, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এইরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাস পাই।

১১ই, বুধবার—দয়াময়ি! আজ তোমার স্বর্গের শিশুর নির্ভর-শীলতা আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিলে। জননি! শিশু বাস্তবিকই তোমাকে সার করিয়া তোমার উপর নির্ভর স্থাপন করিয়া অনায়াসে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সকলেই মা স্বভাবতঃ এই অনিশ্চিততাপূর্ণ সংসারে অটল আশ্রয় যে মা তুমি তোমাকেই ধরে; কিন্তু চারিদিকের অবস্থা ও দৃষ্টান্তে শীঘ্রই লোক সেই অটল আশ্রয়কে ছাড়িয়া সংসারের উপর নির্ভর করে। তোমার শিশু চিরদিন তোমাতেই নির্ভর করিয়া গেলেন—দুঃসহ রোগ-যাতনাতেও তোমাকে ছাড়িলেন না। মাতঃ, আমরাও যেন চিরদিন তোমাকে ধরিয়া থাকিতে পারি।

১২ই, বৃহস্পতিবার—কৃপাময়ি! আজ তুমি দীনেশ চরিত্রের যোগভাবটা আমাদিগকে দেখাইলে। যোগজীবন লাভ করিয়া দীনেশ পৃথিবীতে আসিলেন, তাই বাল্যখেলায় এতটা পটুতা এবং সাংসারিক কার্য্যে নিবিষ্টচিত্ততা দেখাইলেন। যোগ-

বলে তব ক্রোড়ে মাথা রাখিয়াই তো তিনি রোগ-যাতনা সহ্য করিতে পারিতেন। সময় সময় তিনি যে নির্জ্জনে বসিয়া তোমার সহবাস-সুখ সম্ভোগ করিতেন তাহা তো কতবার আমরাও দেখিয়াছি। চুনারের দৈনলিপিও তাঁহার যোগ-স্পৃহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। মা! তোমার শিশু যোগীকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিলে। আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তাঁহার মত যোগী হইতে পারি।

কলিকাতা, ১৩ই, শুক্রবার—জননি! আজ সেই "সোণার পুতুলের" বাধ্যতা দেখিয়া পূর্ণ বিশ্বাস ভিক্ষা করিতেছি। আজ কয় দিন ধরিয়া দীনেশাত্মার নানা দিক্—তাহার বিশ্বাস, নির্ভর, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি,দেখাইয়া আমাদিগকে স্বর্গের দিকে টানিতেছ। বাধ্যতা বাস্তবিকই শিশু দীনেশের অঙ্গভূষণ ছিল। পার্থিব নানা ঘটনাতে ইহা আমরা বারবার দেখিয়াছি। অবিশ্বাসী বলিয়া এই বাধ্যতাকে আমরা সংসারের সামান্য জিনিষ জ্ঞান করিয়াছি। সংসারের আশা ছাড়িয়া দিয়া রোগের সময় তিনি যে অলৌকিক বশ্যতা দেখাইয়া গিয়াছেন, সেইটী তো স্বর্গের জিনিষ—পাষাণ-প্রাণ হইয়া কি মা তাহাতে সংশয় করিব? মা, আমার ঢের অবিশ্বাস আছে। নৈলে তোমার তিরস্কারবাণীকে অবহেলা করিয়া ভিতরে ভিতরে কেন "মাটির পুতুল" লইয়াই টানাটানি করিব? কেন আজ শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের সম্মুখে এক মুষ্টি ভস্ম লইয়া আসিয়াছি বলিয়া মন কাতর হইতেছে? এই ভস্মের এক একটী পরমাণুর

ভিতরে দীনেশ, যোগেশ, তাঁহাদের মাতা, আমার পিতৃদেব ও মাতৃদেবী—কেবল তা নয়, ছোট বড়, ইহপরকালস্থ সমুদায় মানবাত্মা—ঈশা, মুসা, জনক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যেখানে তোমার সব, সেখানে তো তুমি আছই। যেখানে ভস্ম, সেইখানে বিশ্ব; যেখানে ভস্ম কি বিশ্ব, সেখানে দীনেশের শরীর, সকল মানুষের শরীর, ঈশা, কেশবের শরীর—সেখানে দীনেশের আত্মা, কেশবের আত্মা, ঈশার আত্মা। ধন্য মা তুমি! আজ অচেতন সচেতনের প্রভেদ ঘুচিয়া গেল, আজ পৃথিবী স্বর্গ হইল। কিন্তু মা! আমরা অবিশ্বাসী; ভয় হয় পাছে এই দৃশ্যটা ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র হইয়া পড়ে। অতএব এই ভিক্ষা, তুমি নববিধানের বিশ্বাস দাও, যাহা দৃশ্যমণ্ডলীর সমবেত বিশ্বাস। আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন মণ্ডলীর ছোট বড় সকলকে বিশ্বাস করিতে পারি। নচেৎ আমাদের ক্ষুদ্র বিশ্বাস ভাব-রাজ্যের তরল বায়ুতে বিলীন হইয়া যাইবে।

১৪ই, শনিবার—মা! কল্য বিজ্ঞানালোকের মধ্য দিয়া দেখাইলে দীনেশের দেহ বিশ্বময় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার আত্মা যে উন্নত লোকে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা দেখাইতেও ত্রুটি কর নাই—এই ১২ দিনের মধ্যেই ফুটন্ত আত্মার নানা দিক দেখাইয়া দিলে। আজ আবার তাঁহার ব্যাকুলতা দেখাইয়া আমাদিগকে ধন্য করিতেছ। জননি! যে আত্মা দেহে থাকিতে "কেন জাগে না জাগে না অবশপরাণ" বলিয়া গান করিলেন, আজ তো মা

সেই "অবশ পরাণ", সেই শিশু আত্মা জাগিয়া "তব মাধুরী" সম্ভোগ করিতেছেন। দয়াময়ি! দয়া করে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় কর যেন আমরা এই স্বর্গের দৃশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি।

১১ই, রবিবার (জাহাজে)—করুণাময়ি! আজ তুমি দীনেশের স্বর্গীয় দীনতার ছবি আমাদিগকে দেখাইলে; মা, সশরীরে তিনি যতদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন, আমরা তাঁহার দীনতার মূল্য বুঝিতে পারি নাই—আজ সেই দীনতাই কি অপূর্ব্ব বেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। রোগশয্যায় দীনবেশে দীনেশ যে ভয়াহত মেষশাবকের ন্যায় তোমার পানে চাহিয়া থাকিতেন, ইহার মর্ম্ম এখন আমরা বুঝিতেছি—এই করিয়াই তো তিনি তোমার কৃপা ভিক্ষা করিতেন। মা, আমরা কি এখনও দীন হইব না?

১৬ই, সোমবার (ঢাকা)—মঙ্গলময় ঈশ্বর! কাল তোমার এখানকার ভক্তমুখে বসিয়া, প্রাচীন এক বিশ্বাসীর নিকট যে তুমি পুত্র-বলিদান চাহিয়াছিলে, তাহার কথা বলিলে; তাহাতেই সাহসী হইয়া তুমি আমার নিকট হইতেও যে পুত্র বলিদান লইয়াছ, তাহা বলিতে আসিলাম। তুমি চাহিয়াছ, আমি দিয়াছি—স্বাধীন ইচ্ছায়, সজ্ঞানে, খুব রাজি হইয়া দিয়াছি। কিন্তু প্রভো! এব্রাহেমের বিশ্বাস জগৎকে দেখাইবার জন্য তাঁহা হইতে যে বলি লইলে, অবিশ্বাসী হইতে সেই বলি কেন লইলে? যদি

বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য তাহা করিয়া থাক, তবে হে নাথ! দয়া করিয়া বিশ্বাস দাও। করুণাময়! এই কয়দিনের মধ্যেই শিশুর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে স্বর্গের কত শোভাই না দেখাইলে! ধ্বংস-রহিত জড়, ধ্বংসরহিত আত্মা—জড়েতে আত্মা, আত্মাতে জড়—জড় ও আত্মা উভয়েতে তুমি; হে বিপুল বীর্য্যধারী ঈশ্বর! এ সকল গূঢ় তত্ত্ব তুমি আমার প্রাণপুতুলের পবিত্র দেহাবশিষ্ট এক মুষ্টি ভস্মের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিলে। আরো কত দেখাইলে, কি বলিব? আজ শিশুর স্বর্গীয় প্রেম দেখাইয়া কৃতার্থ করিলে। স্বর্গের আরম্ভ পৃথিবীতে—ভাই বোনের ভালবাসা রূপেই প্রেম অঙ্কুরিত হয়। দীনেশ দিদিকে ভালবাসিয়া, দিদির সমগ্র হৃদয়ের প্রেমে ভাসিয়া, জীবনের শেষকালে তোমার প্রেমলীলায় মত্ত হইতে পারিলেন। দয়াময়! আমি ইহার কিছুই ধরিয়া রাখিতে পারিব না। তাই আশীর্ব্বাদ চাই—দলের সহানুভূতি এবং সমবেত বিশ্বাস দাও।

১৭ই, মঙ্গলবার—কৃপাময়ি! আজ দীনেশের ফটোগ্রাফ্ দেখিয়া তোমার প্রদত্ত "সোণার পুতুল" যে কি জিনিষ [illegible] বুঝিলাম, মৃত্যুকে কেন অমৃতের সোপান বলে, তাহা টে[illegible]াইলাম। বিজ্ঞানবলে জড় ও আত্মা সেই এক তমসাচ্ছন্ন রহস্যেরই দুই দিক্ মাত্র—জড় আত্মা এবং সেই অবোধ্য রহস্য, এই তিনের একেতে অন্যের জ্ঞান পরস্পর অনুস্যূত। নববিধানে আমরা বাহ্য জগতের মধ্যেই আত্মা এবং সেই অনন্ত পুরুষকে

দেখিতে পাই। ফটোগ্রাফে দীনেশকে আমি একটা অচেতন ছবিরূপে দেখিলাম না—সেই "সোণার পুতুলটী" দেখিলাম, যিনি তোমাকে "জীবনের ধ্রুবতারা" করিয়াছিলেন। মা, মণ্ডলীর সহানুভূতি এবং সমবেত বিশ্বাস দাও যেন আমি এই সুন্দর ছবি খানি ধরিয়া রাখিতে পারি।

১৮ই, বুধবার—জননি! আজ দীনেশের ভক্তি দেখাইয়া আমাকে মোহিত করিলে। নববিধানে ভক্তি দেখা, না, ভক্ত দেখা—শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা দেখা। রামমোহন রায় দেশ বিদেশের শাস্ত্র মন্থন করিয়া একমেবাদ্বিতীয়মকে বাহির করিলেন—সমুদায় সত্যের সমষ্টি এক অদ্বিতীয় পুরুষকে বাহির করিলেন। অগ্রে তিনি সকলের সঙ্গে এক হইয়া একটী পূর্ণ মানুষ হইলেন; তার পর পূর্ণ ঈশ্বরকে দেখিলেন। নববিধানমণ্ডলী আমাদের সকলের—পৃথিবীর সকলের প্রতিনিধি একজন মানুষ; মা, সেই বিরাট মানুষকে বিশ্বাস না করিলে আমি তোমাকে দেখিতে পাই না, তোমার পুত্রকে—আমার দীনেশকে দেখিতে পাই না। দয়াময়ি, দলকে বিশ্বাস করিতে দাও।

১৯শে, বৃহস্পতিবার—মা, আজ দীনেশের বৈরাগ্য তুমি আমাদের সম্মুখে ধরিলে। ইহার সঙ্গে তাঁহার গুরু অন্নদার বৈরাগ্য, ঈশার বৈরাগ্যও দেখিতেছি। একি মা, একটা ভাব মাত্র? "সুখ দুঃখ যাহা দিবে সহিব" দীনেশজীবনে এই বাক্যের প্রমাণ পাইয়াছি। অন্নদার বৈরাগ্যও দেখিয়াছি, তবু কি বলিব

এ একটা ভাব মাত্র? জগতের জন্য যীশু যে রক্ত কলসে কলসে ঢালিয়াছেন, নববিধানের ভক্তেরা, ঢাকার ছোট ছোট বৈরাগীগণ না হয় সেই রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া দিতেছেন; জিনিষ তো একই। তাই তব চরণে এই ভিক্ষা, মণ্ডলীকে বিশ্বাস করিয়া যেন আমি দীনেশের বৈরাগ্য মূর্ত্তিমান্‌রূপে দেখিতে পাই।

২০শে, শুক্রবার—করুণাময়ি! যত দিন যাইতেছে তত শিশু দীনেশের স্বর্গীয় জীবন আমাদের নিকট উজ্জ্বল হইতেছে। আজ মা আমরা অনুরাগী দীনেশকে দেখিতেছি। তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যে দিন ঢাকার নিকট বিদায় লইলেন, সেই দিন হইতে বৈরাগী দীনেশ অনুরাগী প্রেমভিখারী হইয়া তোমার বুকের ভিতর লুকাইতে লাগিলেন। এই অনুরাগের বলেই তো মা তিনি তোমাকে "জীবনের ধ্রুবতারা" করিয়া চক্ষের সম্মুখে রাখিলেন। মা, এই অনুরাগ আমাদিগকে দাও।

২১শে, শনিবার—আজ শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন, তুমি তোমার শিশু দীনেশকে বিবেকী সংসারীরূপে আমাদের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলে। দীনেশ আমাদের হিসাবে সংসারী ছিলেন না—তিনি অল্পবয়স্ক, পাঠে রত, তাঁকে কেন লোকে সংসারী বলিবে? কিন্তু তোমার হিসাবে তিনিই প্রকৃত সংসারী। খেলাতে তুমি তাঁহার বিবেক হইয়া তাঁহাকে কাহারো সঙ্গে অসদাচরণ করিতে দাও নাই। তুমি গুরু হইয়া গুরুজনের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার ঠিক রাখিয়াছ; তুমিই তাঁহাকে সর্ব্বদা সুপথে চালাইয়াছ।

মা, আমার ঘরের কাজের মধ্যে যা কিছু আমার তুষ্টিজনক, তা দীনেশই করিয়াছেন। তুমি তাঁহার বিবেক হইয়া স্বার্থনাশে তাঁহাকে সমর্থ করিয়াছিলে। মা, আমাদিগকে বিবেক দাও, আমরাও যেন অনিত্য সংসারে নিত্যধন লাভ করিয়া নিত্যধামের প্রথম সোপানে আরোহণ করিতে পারি।

শ্রাদ্ধ।

১৮৯৬ সনের ২২এ মার্চ্চ (১০ই চৈত্র ১৩০২ বাং) রবিবার নবসংহিতানুসারে শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য ঢাকা নগরে বিধান পল্লীস্থ আমার বাটীতে সম্পন্ন হয়। চৈত্রের (১৮১৭ শক) দ্বিতীয় পক্ষের বঙ্গ-বন্ধু হইতে নিম্নোদ্ধৃত শ্রাদ্ধ বিবরণ সঙ্কলন করিলাম :—

"১০ই চৈত্র প্রাতে আট ঘটিকার সময় বিধান পল্লীস্থ উপাসকগণ শোকার্ত্ত পরিবারের সহিত একত্র স্নান করেন। স্নানের পূর্ব্বে জলেতে ভগবানকে সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া স্নান কার্য্য আরম্ভ হয়। স্নানান্তে শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতা দুর্গাদাস রায় মহাশয় ভস্মপূর্ণ পাত্র হস্তে ধীরে ধীরে গৃহের দিকে যাত্রা করেন। বন্ধু বান্ধবগণ গম্ভীরভাবে ভগবানের জয় ও গুণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করেন। ক্রমে ভস্ম স্থাপনস্থলে উপ-

স্থিত হইলে উপাচার্য্য মহাশয় একটী প্রার্থনা করেন, পরে ভস্ম স্থাপিত হইলে তাহার মুখ বন্ধ করা হইল। প্রার্থনাটী এরূপ গুরুতর ও হৃদয়ভেদী হইয়াছিল যে, যেমন সকলে অশ্রুপাত করিতে বাধ্য হন, তেমনি পরলোকস্থ আত্মার নিঃসংশয় স্থিতির অনুভূতিতে প্রাণে আশাও সঞ্চারিত হয়। পরে শ্রাদ্ধ স্থানে সকলে সমবেত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনান্তে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তা প্রার্থনা করেন। শ্রাদ্ধ কর্ত্তার প্রার্থনার পর নানাশাস্ত্র হইতে সময়োপযোগী কতিপয় শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা পঠিত হয়। আচার্য্যের প্রার্থনার পরে শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের জীবনী পঠিত হইয়াছিল। জীবনী পাঠের পরে দান বিজ্ঞাপিত হয়। দান বিজ্ঞাপনের পর শান্তিবাচন ও কীর্ত্তন হইয়া শ্রাদ্ধ কার্য্য শেষ হয়।

আমার প্রার্থনার সার এই :—

হে পবিত্রাত্মন্! হে স্নেহময়ি জননি! প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারে কার্য্য হইলে অদ্যকার অনুষ্ঠান আর এক রকমে সম্পাদিত হইত—আমি দীনেশের নয়, দীনেশ আমার শ্রাদ্ধ করিতেন। জানি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে; তবু জিজ্ঞাসা করি এটী আমার সম্বন্ধে ঘটিল কেন? জানি, ইহা তোমার আদেশে ঘটিয়াছে, জানি ইহাতে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু নাথ, মন যে মানে না—দীনেশের বিবাহ না দিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছি! ইহা কি প্রাণে সয়? বিকাশোন্মুখ বালকের সমুদায় আশা, ভরসা, উৎসাহ, উদ্যমের

মূলে কুঠারাঘাত করিয়া—আমার শেষ জীবনের অবলম্বন, আশার ঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া তুমি আমার বুক শূন্য এবং তোমার বুক পূর্ণ করিলে! প্রেমময়, এতে তোমার গূঢ় উদ্দেশ্য আছে—আমার মঙ্গল সাধন করিবার ইচ্ছা আছে, তা জানি, তবু তো নাথ মন মানে না। উদ্বেলিত শোকের আবেগ একএকবার আমাকে কিরূপ অস্থির করিয়া ফেলে, তাহা তুমি জান। যাহা হউক, তোমার দয়া অপার। প্রায় ত্রিশ বৎসর গত হইল, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ যোগেশরঞ্জন যখন তোমার আহ্বানে তোমার ক্রোড়স্থ হন, তখনকার দুর্ব্বিষহ যাতনার সহিত তুলনা করিলে এই শোক কিছু নয় বলিলেই হয়। ফলে আমার হৃদয় ভাঙ্গিল না দেখিয়া মনে হয় আমি বা পাষাণ হইয়া গেলাম। কিন্তু পাষাণই হই, আর যাহাই হই, এই ব্যবস্থায়, হে নাথ, তোমার বিশেষ করুণানুভব করিতেছি। পতনোন্মুখ এই শরীরে শোকের আঘাত তেমনি প্রবল হইলে আজ কি আর দেহ ধারণ করিতে পারিতাম? ধন্য নাথ তোমার কৃপা! তুমি জননীরূপে, হে অনন্ত প্রেমের আধার, এই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে আবার শান্তিবারি ঢালিয়া দিলে। হৃদয়ের পুতুল অষ্টাহকাল বাহ্য চক্ষের অন্তরালে গেলে যখন ভস্মের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে করিতে অস্থির হইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, উদ্‌গ্রীব হইয়া দেশে যে সকল বন্ধুবান্ধব আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, অবশেষে কি তাঁহাদের সম্মুখে একমুষ্টি ভস্ম মাত্র লইয়া উপস্থিত হইব?" তখন তুমি

বলিলে, "না, এ ভস্মের মাঝে যে অসংখ্য তীর্থস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।" মা, যেখানে প্রাণের দীনেশের পবিত্র দেহের অংশ, সেখানেই পূর্ণ দেহ, সেখানেই তাঁহার আত্মা, সেখানেই প্রাণের যোগেশ ও তাঁহার মাতা, আমার পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ, সেখানেই তোমার যতীশ, কৈলাস, রামপ্রসাদ, রমণী, অন্নদা, দীনেশ, কেশব, আর্য্য যোগী মহর্ষিগণ, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, মুশা, ঈশা প্রভৃতি স্বর্গের দেবদেবীসহ তুমি বর্ত্তমান। মা, কেবল তাহাও নয়। এ ভস্মই বা কত দিন থাকিবে? থাকিলেও তাহার ভিতরে এক প্রকারের সঙ্কীর্ণতা রহিয়াছে। এই দেহ আমার, ও দেহ তাহার, এই রকমের সঙ্কীর্ণ ভাব লইয়া আমরা সকল বস্তু দেখি বলিয়া মা, আমাদিগকে অনেক সময় তোমা হইতে এবং তোমার পুত্র হইতে দূরে থাকিতে হয়। জননি, শ্রীমানের দেহ ভস্মসাৎ হইলেও তাহা বিনষ্ট হয় নাই। বিজ্ঞানের আলোকে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি—দেহ রূপান্তরিত হইয়া জগতে তোমার অন্যতর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলেও সেই দেহের একটী উপাদানও বিনষ্ট হয় নাই। "মৃত্যুর পর দেহের পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়", এই প্রাচীন কথাগুলি ঠিক সত্য না হইলেও ইহাতে বৈজ্ঞানিক গভীর একটী সত্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। সেই সত্য এই যে, দেহের উপাদানগুলি রূপান্তরিত হইয়া জগতে তোমার কার্য্য সাধন করিতেছে। মা, যদি তাহাই হইল, তবে ত জগতের

যাবতীয় পদার্থের ভিতরেই দীনেশের দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শরীর যে আত্মা এবং পরমাত্মা হইতে পৃথক্ কোন বস্তু রূপে দাঁড়াইতে পারে না, তাহাও বিজ্ঞান এবং দর্শনে প্রমাণিত হইয়াছে। এখন মা বিশ্বাস চাই, নববিধানের জীবন্ত জাগ্রত বিশ্বাস চাই। মা, আমার এবং আমার পরিবারের পরিত্রাণের জন্য, তুমি যে দৃশ্যবিধানমণ্ডলী আমাদিগকে দিয়াছ, তাঁহাদের চরণ-ধূলি, আশীর্ব্বাদ, প্রার্থনা, সহানুভূতি এবং বিশ্বাস না হইলে বিজ্ঞানের প্রমাণিত জড় এবং অধ্যাত্ম রাজ্য সম্বন্ধীয় এই সত্য-গুলি কিছুকাল পরে ভাব এবং কল্পনা বা মতের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। এই দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের দীনেশের যে "সোণার পুতুল"টী এত স্পষ্টরূপে এখন দেখিতেছি, এবং যাহা দেখিয়া এই শোকদগ্ধ হৃদয়ে একটুকু শান্তির বাতাস লাগিতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। বাস্তবিক মা, দীনেশের বিশ্বাস, নির্ভর, ব্যাকুলতা, প্রভৃতি যাহা আমার সম্মুখস্থ বিশ্বাসী ভক্তমণ্ডলীর এক এক জনকে এক এক দিক্ দিয়া জীবিত রাখিয়াছে, যাহা মূর্ত্তিমান্ হইয়া আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাসকে আকর্ষণ করি-তেছে, তাহাতে বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইলে মা, এই পরিবারের সব আশা ভরসা গেল। তাই তোমার চরণতলে বসিয়া এই প্রার্থনা করি—তুমি দলের সঙ্গে আমাদিগকে এক করিয়া দাও, যেন আমরা তাঁহার ভিতর দীনেশকে পাইয়া পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক।

দীনেশজীবনের স্বর্গারোহণব্যাপারে যাহা যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, এবং তন্মধ্যে যাহা যাহা স্মরণ করিতে পারিয়াছি, যথাসাধ্য তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। পুত্র-বাৎসল্যের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন এই চরিতালেখ্যে যে সকল ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা বাদ দিলেও উহাতে অনেক সার কথা আছে। সেই সার কথা-গুলির ভিতরে স্বর্গের আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি বলিয়াই আমি শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের জীবনকার্য্যকে "স্বর্গারোহণ" নামে অভিহিত করিয়াছি। তবু প্রশ্ন

হইবে, এই জীবনে এমন কি ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়াছে যাহার গৌরবসংরক্ষণজন্য উহাকে "স্বর্গারোহণ" বলিতে হইবে? সচরাচর যে সকল কর্ম্মের চমৎকারিত্বে আমরা স্বর্গের সুগন্ধি অনুভব করিয়া থাকি, এ জীবনীতে তাহা নাই বটে; কিন্তু নববিধানে আমরা পরিমাণ নয় গুণের দিকে দৃষ্টি করি—কার্য্য বেশী কি কম, তাহা আমরা দেখি না, দেখি উহা ভাল না মন্দ। নববিধানে আবার প্রায় সমস্ত বিষয়েই লোকের মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর নববিধানেও একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইবেই হইবে। "পরিবর্ত্তন" বলিলাম বটে; কিন্তু প্রকৃতার্থে উহা ঠিক পরিবর্ত্তন নয়। নববিধান সমাগত হইলে লোকের অন্তর্দ্দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়—পূর্ব্বে যাহা জঞ্জালে জড়িত হইয়া লোকের নিকট দুর্ব্বোধ্য বা অবোধ্য কিংবা বিকৃত হইয়া পড়ে, এই পরিষ্কৃত দৃষ্টির প্রভাবে তাহা সুস্পষ্টরূপে দেখা যায়। এদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের মত ও আচরণ কত পরিবর্ত্তিত, কত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা যাঁহারা এদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমাগত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বকালীন ইতিহাস মনোযোগের

সহিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। জীবাত্মা, পরমাত্মা, স্বর্গ, নরক, ইহকাল, পরকাল, ইত্যাদি বিষয়ে লোকের মনে নানা প্রকারের ভ্রম ও কুসংস্কার আসিয়া কত অনর্থ সংঘটন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করে? ব্রাহ্মসমাজ এ সকল ভ্রমপ্রমাদ দূর করিবার জন্য নানা উপায়াবলম্বন করিয়াও এখন পর্য্যন্ত তাহার মূলোৎপাটনে সুসমর্থ হন নাই। "স্বর্গ" শব্দ আজও লোকের মনে কত সব কল্পনামূলক ভাবরাশি আনিয়া উপস্থিত করে। কল্পনার বলে কেহ বা স্বর্গকে ক্রিয়াহীন নির্ব্বাণের অবস্থা বলিয়া মনে করিতেছ, কেহ বা উহাকে নিত্য সুখসম্ভোগের বিলাসভবনরূপে দেখিতেছ! যাহা হউক, অধুনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোক এদেশে আসিয়া অল্প অল্প করিয়া আমাদের অনেক ভ্রম দূর করিয়া দিয়াছে। আমরা যদি বিজ্ঞান-চক্ষে মানবজীবন সম্বন্ধে একটুকুমাত্র অনুধাবন করি, তাহা হইলে স্বর্গ এবং স্বর্গারোহণের প্রকৃত তত্ত্বলাভে সমর্থ হইব। অতএব আসল বিষয় ছাড়িয়া একটুকু অবান্তরের অনুবর্ত্তন করিতে হইল।

ক্রমোন্মেষের মত সকলেই অবগত আছেন। তর্ক

বিজ্ঞানের বিধি অনুসারে এই মতের প্রামাণ্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকুক বা না থাকুক, সত্তা (being) এবং বিশ্বের তত্ত্বনির্ণয়কার্য্যে উহার প্রভূত ব্যবহারিক সামর্থ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। এস্থলে উন্মেষবাদের জটিল প্রশ্ননিচয়ের গূঢ়ত্বে প্রবেশ করা আমার সঙ্কল্প নয়। আদিতে জগৎ কি অবস্থায় ছিল? ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইল? উৎপত্তির পরে উহাতে কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিল? এ সকল প্রশ্ন এখন আমার বিবেচ্য বিষয় নহে। বিকসিত জগতের রঙ্গভূমিতে মানব আসিয়া যখন অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার উন্মেষ (development) কার্য্যে কি ব্যাপার, কি জন্য, কোন্ উপায়ে সংঘটিত হয়, অতি স্থূলভাবে তাহার আভাসমাত্র জ্ঞাপন করা আমার লক্ষ্য। উন্মুদ্রাবস্থায় (in the developed state) মানব যত কেন আত্মগৌরবে স্ফীত হউন না, গোড়াতে যাবতীয় সত্তাশ্রেণী মধ্যে তাঁহার স্থানের উচ্চতা বড় বেশী বলিয়া বলা যায় না। বাস্তবিক ভাবী কালে যে মানব স্বীয় বাহুবলে সমস্ত প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন, প্রারম্ভে যে তাঁহার দেহের ব্যাসপরিমাণ ১২০ ইঞ্চির

অধিক নয়, ইহা জানিতে পারিলে কে না বীতগর্ব্ব এবং নতশির হইবেন? আর গুণ সম্বন্ধেই বা কি? যিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টির শীর্ষস্থানীয় হইয়া দেবকুমার-রূপে সকলের নিকট সম্মানিত হইবেন, জরায়ুমধ্যে তাঁহার প্রাথমিক বা ভ্রূণাবস্থার পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধনাদির ব্যবস্থা কিনা সামান্য উদ্ভিদাদির ন্যায়! ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই বা আর অধিক কি? শরীরের গঠনের পার্থক্য থাকিলেও দৈহিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নরশিশু আর পশুশিশুতে এমন কি প্রভেদ থাকে, যাহাতে তাঁহাকে বিজাতীয় কোন কিছু বলিয়া মনে করিতে পারি? প্রাপ্তবয়স্ক মানবের আদিমাবস্থাতেও পশুর সহিত তাঁহার প্রাকৃতিগত কোন বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না। নরমাংসাশী এণ্ডেমান্ দ্বীপ নিবাসী অসভ্য, বর্ব্বর মানুষগুলি, সিংহ শার্দ্দূলাদি হিংস্রজন্তু হইতে কত আর উন্নত? কিন্তু ইহারাই আবার কালে নরপ্রেমে পাগল হইয়া যীশুর ন্যায় আত্মশোণিতে জগতের পাপ ধৌত করিবে! যীশু! তিনি কে? অনেকে মনে করে, দুই সহস্র বর্ষ অতীত হইল অকস্মাৎ নেজারতে একটী লোক

জন্ম গ্রহণ করিয়া পরহিতব্রত পালনার্থ নিষ্ঠুর যীহুদীয় লোকগণ কর্ত্তৃক চিরস্মরণীয় ক্রুশোপরি প্রাণদান করিলেন। ঐতিহাসিক ঘটনা তদ্রূপই; কিন্তু জগতের হিতসংসাধন জন্য কি এই ব্যাপার—পবিত্র যীশুজীবন ও তাঁহার বীভৎস হত্যাকাণ্ড—অধ্যাত্ম রাজ্যের কোন সুসমাচার বহন করিতেছে না? আমাদের দেশীয় লোকেরা যীশুর প্রশংসাবাণী শ্রবণ করিলে বলিয়া থাকে, কেন? যীশুর প্রশংসায় প্রয়োজন কি? আমাদের আর্য্য মুনিঋষিদিগের মধ্যে কি এমন লোক জন্মেন নাই, যীশু যাঁহাদের জীবনের প্রতিবিম্বিত ছবি মাত্র? ইহাঁদিগের বাক্যে বিদ্বেষের ভাগ যাহা, তাহা ছাড়িয়া দিয়া, তন্মধ্যে আমরা গূঢ় জ্ঞানের তত্ত্বলাভ করিতে পারি। সেই তত্ত্বটী এই—উন্নত জীবন, আধ্যাত্মিক উন্নত জীবন মানবের সাধারণ অধিকার। উন্নতিসোপানের উচ্চস্থানে যে সকল জাতি অধিরোহণ করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আদর্শ যীশুজীবনের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল তাহা নয়, যে সকল জাতি এখনও সামাজিক উন্নতি সম্বন্ধে অতীব হীন অবস্থায় অবস্থিতি

করিতেছে—যাহারা ডারুউয়িনের মতে সেই দিন মাত্র লাঙ্গুলপরিবর্জ্জিত হইয়াছে—তাহাদের শোণিতেও যীশুশোণিত পরিলক্ষিত হয়। ফলে সৃষ্টির রঙ্গভূমিতে মানবের অবতরণ হওয়ামাত্র সৃষ্টিপ্রক্রিয়াব্যাপারে একটী মৌলিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। মানব-সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতীর কার্য্যে আমরা কি দেখিতেছিলাম? উন্মেষবাদ বলে "জীবন সংগ্রাম" (struggle for existence)। ইহার অর্থ আত্মরক্ষা। পৃথিবীতে যখন জননকার্য্যপ্রভাবে অগণ্য বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী সমাগত হইতে লাগিল, তখন আর সসীম ধরণীতে এসকলের সমাবেশ হয় কেমন করিয়া? "যোগ্যতমোদ্বর্ত্তের" (survival of the fittest) নিয়মানুসারে তাহারই জয়, যাহার জীবন বাহ্যাবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উপযোগী। বর্দ্ধনশীল ধান্য-ক্ষেত্রে কে না দেখিয়াছেন যে, সংখ্যাতীত ধানের গাছ মধ্যে কোনটী বা শুকাইয়া যায়, আর কোন কোনটী বা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া বাড়িতে থাকে? ইহার কারণ এই যে, সকলগুলির বাহিরের অবস্থা সমান নয়—কোন কোনটী উর্ব্বরা ভূমিতে স্থিত, কোনটী অনুর্ব্বর।

ভূমিতে। কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষ্যাদি মধ্যেও বাহ্যোপ-যোগিতার তারতম্যানুসারে এই "জীবন সংগ্রাম" এবং জয় পরাজয়ের অব্যর্থ নিয়ম কার্য্য করিতেছে। এই সকল বিষয়ের উল্লেখ করিবার কারণ এই, সংসারে সংহারের ব্যাপার একটী লক্ষণীয় বিষয়।

কিন্তু সৃষ্টিমধ্যে ইহার সঙ্গে সঙ্গে অথচ ইহার বিপ-রীত এবং এতদপেক্ষা গুরুতর আর একটী কার্য্য দৃষ্ট হয়। সেইটী পরহিতৈষণা, যাহার জন্য সকলকে আত্ম-রক্ষা নয়, পররক্ষার জন্য ব্যাকুল হইতে হয়। এই পরহিতৈষণা ক্রিয়ার বিস্ফারণ অঙ্কুরের আকারে অতি হেয় কীটপতঙ্গাদিতেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কারণ এই হিতৈষণার অনুরোধেই আত্মবিসর্জ্জন করিয়া উহারা স্ব স্ব অণ্ড বা শাবকের পরিরক্ষণে নিয়ত রত—কখন কখন প্রাণদানে উদ্যত। কিন্তু পরহিতৈষণা মানবেতেই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক প্রেম যদি এই হিতৈষণার মূলীভূত হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃতার্থে কেবল মান-বেতেই বর্ত্তমান। কারণ মানব ভিন্ন আর কোন জন্তু প্রেমের অধিকারী নহে। এই প্রেমপ্রস্ফুটনকার্য্য এক দিনে সম্পাদিত হয় না—এক জনের কিংবা একটী

সমাজের জীবনে সংঘটিত হয় না। যুগযুগান্তর চলিয়া গেলে প্রেমের অবতার শ্রী ঈশা রঙ্গভূমিতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু ঈশার জীবন আদর্শ-জীবন হইলেও তাহার সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম্মবীরদিগের,—অতি সামান্য অসভ্য মানবের মানবীয় জীবনের জাতি-গত কোন পার্থক্য নাই। মানবীয় জীবন বলিতে পশ্বেতর উন্নত জীবনকেই আমি লক্ষ্য করিতেছি। এই মানবীয় জীবন মানুষমাত্রের সাধারণ সম্পত্তি। ইহা যেমন ঈশা, মুসা, বুদ্ধ, নানক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়, তেমনি এণ্ডেমান্-দ্বীপ-নিবাসী নরশোণিতলোলুপ লোকমধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—কেবল বিকাশের তারতম্যানুসারে এই দুই শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে জীবনগত এত পার্থক্য।

মানবের মানবত্বসম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম তাহাতে ইহা অবধারিত হইল যে, এই জিনিষটার নাম যাহাই কেন হউক না—উহাকে "ধার্ম্মিকতা" বলি আর "দেবত্ব" বলি, "দ্বিজত্ব" বলি আর "পুত্রত্ব" বলি—উহা মূলে এক, এবং উহা অল্প হউক আর অধিকই হউক, সকল মানুষের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকে।

অপিচ ইহাও বলিতে হইবে যে, সকল মানুষই মানবত্ব-সম্বন্ধে নিজ নিজ এই উচ্চ অধিকারের কথা অবগত আছে। কেবল কর্ষণের অভাব কি সদ্ভাবের প্রভাবে তাহার বিকাশ নানা ব্যক্তিতে নানা রূপ ধারণ করে। এস্থলে আমি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগের কথা বলিতেছি না—তাঁহারা দেবপ্রসাদ লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের জীবনের উৎকর্ষ বিনা কর্ষণে, বিনা ইচ্ছায় বিস্ফুট হইয়া থাকে। সাধারণ মানবের কথা স্বতন্ত্র, তাহাদের জীবনের উন্নতি বহুলাংশে তাহাদের হাতেই। চেষ্টা, উদ্যোগ, যত্নদ্বারা যে যে পরিমাণে শিক্ষা লাভ করে সে সেই পরিমাণে মানবীয় উন্নতির উচ্চ সোপানে সমারূঢ়। কিন্তু এই উন্নতিও সীমাবিশিষ্ট। মানবের প্রকৃত উন্নতিতে—তাঁহার উচ্চ মানবত্ব, দেবত্ব, পুত্রত্ব, বা দ্বিজত্বে—একটা বিশেষত্ব আছে। তাহা অসীম, এই অর্থে অসীম যে, মানব যখন সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন সে এক দিকে সমুদায় মানবজাতি আর এক দিকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যায়। সচরাচর সকল মানবেতেই কিছু না কিছু এই একাত্মতার ভাব বর্ত্তমান থাকিলেও সাধারণ মানব এ কথা

অবগত নহে, সুতরাং তাহার কার্য্য যান্ত্র্য কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না সে নিজে জানিয়া শুনিয়া একাত্মা হয় না বলিয়া তাহার কার্য্য যন্ত্রের কার্য্য বৈ আর কি হইতে পারে? এই অবস্থা মানব তখনই প্রাপ্ত হয়, যখন ভগবান্ জগতের হিতের জন্য নব-বিধান প্রেরণ করেন। মানব তখন পূর্ণ মানবত্ব লাভ করিয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

নববিধান যে উন্মেষ ক্রিয়ার ফল, তদ্বিষয় এখনো কিছু উল্লেখ করি নাই। কিন্তু ইহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, মানবসমাজ অগ্রে প্রস্তুত না হইলে, উন্মেষ ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত না হইলে, বিধান সমাগত হয় না। যখনই পৃথিবীতে বিধান আসিয়াছে, তখনই সমাজের লোকসকল উদ্‌গ্রীব হইয়া বিধানের প্রতীক্ষা করিয়াছে। পাপের উৎপীড়নে উৎপীড়িত পুণ্যনিকেতন ভারতভূমি প্রাকৃতিক নানা শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বাগ্রে যখন আবর্জ্জনাবিবর্জ্জিত হইলেন, তখনই ঊনবিংশ শতাব্দীর এই নূতন বিধান আসিয়া এ দেশকে ধন্য করিল।

এখন দীনেশজীবনকে কেন যে স্বর্গারোহণের ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলাম, তৎসম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

দেবত্ব মানবজীবনের নিয়তি; অথচ সকলে সকল সময় তুল্যরূপে তাহার মর্ম্ম ও গৌরব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। ভূতলে যুগধর্ম্ম সমাগত হইলে মানব যখন চেতনা লাভ করেন, তখনই তিনি মানবজীবনের প্রকৃত এবং গূঢ় গভীর অর্থ বুঝিতে পারেন। কিন্তু বিধানের লোকগুলিও আকস্মিক কোন ঘটনা নয়, উন্মেষ ক্রিয়ার প্রভাব তাঁহাদের জীবনেও সুস্পষ্টরূপেই পরিলক্ষিত হয়। কত যত্ন, কত প্রয়াস দ্বারা— কত উপায়, কত কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিদেবী বিধানান্তর্গত একএকটী আত্মাকে গঠন করেন, যেখানে আমরা অনুসন্ধান করিয়া তাহার তত্ত্ব লাভ করিতে পারি, সেখানেই আমাদিগকে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইতে হয়। সামান্য দৃষ্টিতে দীনেশ জীবনের মূল্য আর বেশী কি? দীন পরিবারে জাত, মাতৃলালন-পরিশূন্য, অযত্নে শিক্ষিত, বুদ্ধি মেধাদির তীক্ষ্নতা-রহিত, অপ্রচুর চেষ্টাপরায়ণ দীনেশ সামান্য একটী

বালক বৈ আর কি ছিলেন? পক্ষান্তরে, দীনেশজীবন গঠন জন্য প্রকৃতির যত্ন কত! ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশিক সুঘন অজ্ঞানতা এবং কুসংস্কারসমাকীর্ণ, পৌত্তলিকতা ও অধর্ম্মের গভীর তমসাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র একটী পল্লীগ্রামে ধ্রুবতারারূপে দেব-শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্রের অভ্যুত্থান; এবং তাঁহার সহিত সুকৃতি মহামায়া দেবীর পরিণয় নিবন্ধন, এই দুইটীই অমানুষ ব্যাপার। তার উপর আবার তাঁহাদের অন্যতর সন্তানের ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক লাভ! এ তো বিধাতার নিবন্ধন বৈ আর কিছুই হইতে পারে না। ফলে যাহার অন্তরের গতি কেবল পাপের দিকে, যে আশৈশব "চুল চিরিয়া" বিচার করিবার জন্য নিয়ত ব্যস্ত, যে পণ্ডিত-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকলের সঙ্গে ধর্ম্মের নানা কথা লইয়া তথ্যাবধারণার্থ বাদানুবাদে সতত নিরত, এবং যে বিনাপ্রশ্নে ও বিনা আপত্তিতে ঈশ্বর, মানবা[illegible] এবং পরলোকসম্বন্ধে কোন কথা স্বীকার করিতে চির-পরাঙ্মুখ, তাহার হৃদয়ে সহসা সুবিমল ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যজ্যোতি প্রতিভাত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। দীনেশ-জীবন-গঠনার্থ এ সকল যে বিধাতার উপাদান-

সংগ্রহমাত্র, এ সম্বন্ধে কি আর বিশ্বাসীর সংশয়ের লেশমাত্র থাকিতে পারে?

শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের জন্মসময় ব্রাহ্মসমাজ "নর-পূজার হুজুক" এবং "বৈরাগ্য বিভীষিকার" ভয়ানক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া সত্যের বিজয়নিশান ভারতাকাশে উড্ডীন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এবং সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের নবীন ভক্তদল বীরজনোচিত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা অথচ সৎসাহসিকতা সহকারে অসত্য এবং ভীষণতার বহুরূপী নির্যাতন সহ্য করিয়া প্রেমের অজেয় বলের পরিচয় দিতেছিলেন। ভগবানের নিগূঢ় লীলামাহাত্ম্যে আমিও সেই সময় ঢাকা নগরীতে আসিয়া অবস্থিতি করি। পত্নীবিয়োগের পর আমার যে নবভক্তগণ সহ বিশেষ রূপে ঘনিষ্ঠতা হয়, তদ্বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮৭৮ সনে কুচবিহার বিবাহের তুমুল আন্দোলননিবন্ধন যখন ব্রাহ্মসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, তখন হইতে এই ক্ষুদ্র ভক্তদলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধনৈকট্য বিশেষরূপে ঘনতম হয়। এসময় হইতে ভক্তবৃন্দের পদধূলি আমার গৃহে ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। সুতরাং

আমার সন্তানগণও তাঁহাদের সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত হওয়াতে ভক্তদলের সাপ্তাহিক প্রকাশ্য উপাসনা অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার বাড়ীতেই হইত। এতদ্ব্যতীত সাময়িক উৎসবাদির কার্য্যও এ দীনের গৃহেই সম্পন্ন হইত। তৎপর যখন "ঢাকা মাইনর স্কুল" সংস্থাপিত হয়, তখন ভক্তদের চরিত্রসৌরভ শিশু-বর্গকে ভাল করিয়া প্রভাবিত করিতে লাগিল। এরূপে যখন নানা দিক্ হইতে নববিধানের স্বর্গীয় প্রভাব আসিয়া আমার দীনদুঃখী পরিবারকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখন কি সরল শিশুমতি দীনেশের কোমল আত্মা সেই দুর্জ্জয় শক্তিকে অতিক্রম করিতে পারে? বিনয়, নম্রতা, উৎসাহ, কার্য্যদক্ষতা, সৌন্দর্য্যানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা, দয়া, প্রেম, বিশ্বাস প্রভৃতি স্বর্গের দূত সকল আসিয়া তাঁহার মনোরাজ্য অধিকার করিয়া লইল। প্রকৃতিদেবী অগ্রে ভূমি প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে ধর্ম্মের বীজ কখনও অঙ্কুরিত হয় না। এ সম্বন্ধেও যে শ্রীমান্ সৌভাগ্যশালী ছিলেন, তাহা আমরা শ্রীমানের শৈশব ও কৌমার চরিত্রের

নানাবস্থাতে, বিশেষতঃ বাল্য-ক্রীড়া-নৈপুণ্য, মিষ্ট-ভাষিতা, বিনয়, নম্রতা, দয়া, সত্য-প্রিয়তাদি গুণেতে দেখিতে পাই। বিধানপ্রভাব এখন শ্রীমান্‌কে বিশ্বাস, প্রেম, এবং বৈরাগ্যের দিকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। শ্রীমান্ এগার বার বৎসর বয়সেই উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তনা-দির রসাস্বাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রার্থনার প্রয়ো-জনীয়তাও তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়া-ছিলেন। এজন্যই কোমল বয়সে নিষ্ঠার সহিত প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনাসম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী তিনি বালকদিগের সভাতে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ। দেবপ্রসাদ লাভ না করিলে এত অল্প বয়সে, নানা ভয় প্রলোভনে পরিবৃত হইয়া, তাঁহার পক্ষে এমন সুনির্ম্মল, সুমিষ্ট চরিত্র প্রদর্শন করা কখনই সম্ভবপর হইত না। বাস্তবিক যেখানে প্রকৃতি সদয়, এবং বিধানের পবিত্র মলয়ানিল মৃদুমন্দ হিল্লোলে বহমান, সেখানে দেবচরিত্র বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। দীনেশ এখন সকলের ভালবাসার পাত্র। কি পরিবার কি বয়স্যগণ মধ্যে, কি আত্মীয় কুটুম্বগণ কি ছাত্রসমাজ সঙ্গে, কি নব-

বিধানের ভক্তমণ্ডলী মধ্যে কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ সমীপে, দীনেশ যেখানে যান সেখানেই সকলের প্রেম ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। আমার শ্রদ্ধেয় কোন এক পাদরী বন্ধুর ভাষাতে বলিতেছি "দীনেশকে জানা আর তাঁহাকে ভালবাসা একই কথা"। ফলে যে পাত্রে স্বর্গের এতগুলি উপাদেয় সামগ্রী একত্রিত তাঁহাতে যদি লোকের চিত্ত বিমোহিত না হয়, তবে আর কিসে হইবে?

দীনেশের বাহ্য চরিত্র এখন এক প্রকার গঠিত। পৃথিবীতে এই চরিত্রের সুগন্ধি বিস্তৃত হইয়া তদ্দ্বারা জনসমাজে ভগবানের শুভাভিপ্রায় যে পরিমাণে সম্পন্ন হওয়ার তাহা যথাকথঞ্চিৎরূপে হইল। এখন আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। বিংশতি-বৎসরবয়স্ক একটী যুবা, আশা উদ্যমে পরিপূর্ণ, নির্দ্দোষিতার অন্তর্ব্বলে বলীয়ান্, পরিবার আত্মীয়-স্বজনের আশাস্থল এবং ভাবী অবলম্বন—যৌবনের প্রারম্ভে এমন একটী যুবক সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন, আপাততঃ ভাবিতে উহা বড়ই ক্লেশকর। কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়ে

বিশ্বাস থাকিলে—ত্রিলোকপালক অনন্ত জ্ঞানের আধার পূর্ণ প্রেমময়ের মঙ্গল ইচ্ছায় বিশ্বাস না করিলেই বা দাঁড়াইবার স্থান কোথা, মনের তৃপ্তি কোথা?—এই রহস্যের মর্ম্মভেদ করা একবারে অসাধ্য ব্যাপার নহে। রোগশয্যায় শয়ান দীনেশের পানে তাকাইলে আমাদের কর্ণকুহরে, স্পষ্টরূপে হউক কিংবা অস্পষ্টরূপে হউক, সেই রাজ্যের সুধাময় শব্দ আসিয়া প্রবেশ করিবেই করিবে, যে দেশের সমুদায় ব্যাপার এ পৃথিবীর সংপূর্ণ বিপরীত। রোগাক্রান্ত হইয়া দীনেশ কি করিতেছেন? যাতনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তরবে সকলকে ব্যস্ত করিয়া ফেলিতেছেন কি? না;—ধীর, গম্ভীরভাবে, বাক্‌শূন্য হইয়া শয্যায় শয়ান। মন কোন্ দিকে? কি খাইব, কি পান করিব, কি করিলে রোগ যাতনা দূর হইবে, চিন্তা সে বিষয়ে নয়—ভাবেন অন্ধ, আতুর, খঞ্জদিগের কষ্টের কথা,—গান করেন এই বলিয়া, "কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়, যেন গো অভয় পায়, ত্রাসে কম্পিত মন"। আরো বলেন, "পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে, কোথা হায় পথ

আছে, দাও তারে দরশন"। কৌমারে শ্রীমান্ যে খেলাতে পটুতালাভ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি; এবং একমাত্র মনঃসংযোগই যে তাহার কারণ, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। এই মনঃ-সংযোগের ব্যাপারটা নানা জনের জীবনে নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের জীবনে ভগবান্ ক্রীড়নসম্বন্ধীয় মনঃসংযোগকে যোগজীবন লাভের প্রারম্ভিক অবস্থা বা সোপানরূপে ব্যবহার করিলেন। রোগ যদি যাতনার হেতু হয়,—সচরাচর রোগকে কষ্টের কারণ বলিয়াই মনে হয়—তাহা হইলে ইহাতে আর মঙ্গলনিলয়ের মঙ্গলসঙ্কল্প দেখিব কি? কিন্তু রোগ যাঁহাকে পরপ্রেমে পাগল করিল, রোগ যাঁহার চিত্তকে ঈশ্বর-প্রেমে চিরদিনের তরে বাঁধিয়া ফেলিল, তাঁহার পক্ষে রোগ যে পরম সুহৃদ, মঙ্গল রাজ্যের শুভ-বার্ত্তাবহ চিরাভীপ্সিত দূত। শ্রীমান্ দীনেশের রোগ যতই বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার যোগ-প্রবণ আত্মা প্রেমধামের নিগূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় কখন বা তিনি আমার সঙ্গে সদালাপ, কখন বা উপাসনা এবং সঙ্গী-

র্ত্তনে যোগদান করেন, কখন বা নির্জ্জনে বসিয়া ধ্যান করেন, আবার কখনও বা আশা ও বিশ্বাসে পূর্ণহৃদয় হইয়া গোপনে ধীরে ধীরে এই সকল সংগীত করেন :—

"কি ভয় ভাবনা রে মন, লয়েছি যাঁর আশ্রয় ;
সর্ব্ব শক্তিমান্ তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাক্‌লে তাঁরে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু, দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে শত্রুগণে, অপমানে নির্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে, গাইয়ে তাঁহার জয়।
শুনেছি আশা বচন, মরিলেও পাব জীবন,
চিরদিন থাকিব সুখে, এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জ্জন হৃদিকুটীরে, লয়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দ আহ্লাদে সদা করিব জীবনক্ষয়।
তাঁর কাছে খাঁটি হয়ে, থাক রে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে বসে বল জয় জয় দয়াময়॥"

"কত ভালবাস গো মা, মানব সন্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা, বহে দুনয়নে। ইত্যাদি

বিরামের অবস্থায়ও মন প্রায় সেই দিকেই। নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য যাহা করিবার তাহা করিতেম বটে ; কিন্তু তাহাতে আর পূর্ব্বের ন্যায় পার্থিব ভাব

নাই, হৃদয় মন বিষয়াতীত রাজ্যের দিকে উন্মুখ ও প্রধাবিত। পর্ব্বতারোহণ করেন আর রাস্তায়ই বেড়ান, নয়ন আর অন্য দিকে ফিরিতে চায় না—দিগ্দর্শনের শলাকার ন্যায় সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের পানে ফিরিয়া থাকে। অত্যুন্নত ধবলগিরির উচ্চতাতে, সাগরগর্ভস্থ বালুকারাশির বর্ত্তমান পার্ব্বত্য প্রস্তরের আকার ধারণ ব্যাপারে এবং শিলং-শৃঙ্গস্থ তৃণ, যবস, লতা, পাতা, বৃক্ষাদির বৈচিত্র্যে সেই ভূমা, মহান্, অনন্ত দেবের সুগম্ভীর আবির্ভাব সম্ভোগ করিবার সামর্থ্য যে তাঁহার জন্মিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য আমি প্রদান করিয়াছি। রাস্তায় চলিতে চলিতে মনে যে সৎপ্রসঙ্গ এবং উপাসনার ভাব হইত, চুনারে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। চুনারের দৈনলিপিতে নির্জ্জন উপাসনার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা কত তাহা স্পষ্টই জানা যায়। বাস্তবিক রোগ শ্রীমান্‌কে কোন্ দিকে টানিতেছিল, তাহা তিনি নিজে বিলক্ষণ টের পাইয়াছিলেন। টের পাইয়া তিনি যে এই সঙ্গীত দ্বারা ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরাও বুঝিতে পারি :—

তোমারে প্রাণের আশা কহিব।
সুখে, দুঃখে, শোকে, আঁধারে, আলোকে,
চরণ চাহিয়ে রহিব।
কেন এসংসারে, পাঠালে আমারে,
তুমি তা জান প্রভু গো;
তোমারি আদেশে, রহিব এদেশে,
সুখ দুঃখ যাহা দেবে সহিব।
যদি বনে কভু, পথ হারাই প্রভু,
তোমারি নাম ধরে ডাকিব;
বড়ই প্রাণ যবে, আকুল হইবে,
চরণ হৃদয়ে লইব;
তোমার জগতে, প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব;
শেষ হয়ে গেলে, কোলে নিও তুলে,
বিরাম আর কোথা পাইব॥

রোগযাতনার সময় তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। ইহার কারণ তিনি শ্রীমান্ পরেশকে নিম্নলিখিত যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহাতে জানা যায়ঃ—

…মেজদাদা যে ভয়ানক মাথাব্যথা হইয়াছে, Lavender water এ তার কি করিতে পারে? মায়ের হাত ছাড়া আর ঔষধ নাই। তাই চুপ করিয়া আছি।"

১৪ই ফেব্রুয়ারি হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শরীরের যাতনা যেমন এক দিকে সীমান্তে গিয়া পোঁছিতে লাগিল, তেমনি শ্রীমানের সুবিমল আত্মাটী আনন্দময়ী মার হস্তস্পর্শসুখ অনুভব করিয়া যোগেতে নিমগ্ন হইয়া পড়িল। মৃত্যুশয্যায় এরূপ ধৈর্য্য, এরূপ সহিষ্ণুতা, এরূপ শান্তি, অমৃত ধামের সুখাস্বাদন ভিন্ন কখনই সম্ভবপর নয়। তাই বলি দীনেশজীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলী স্বর্গারোহণের সুবিরল ব্যাপার বৈ আর কিছুই না। বিরল বটে, কিন্তু "বহুমূল্য মণিমুক্তার সুস্নিগ্ধ জ্যোতি যেমন অতলস্পর্শ সমুদ্রের নিবিড়ান্ধকারে সমাবৃত থাকে; সুন্দর, সুরভি, অসংখ্য কুসুমরাশির মাধুর্য্য যেমন বিজন বন্যবায়ুতে বিলীন হইয়া অপচিত হয়"; তেমনি কত শত শত নর নারীর দেবচরিত্র মানবসমাজে যথোচিত মর্য্যাদা না পাওয়াতে নিষ্ফলপ্রভ হইয়া যাইতেছে। নববিধান সমাগত হইলে এবংবিধ দেবচরিত্র স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়। সামান্য দীনেশচরিতে বিশ্বাসী নব ভক্তদল স্বর্গের সুগন্ধি অনুভব করিবেন এই আমার আশা, এই আমার বিশ্বাস।

পরিশিষ্ট।
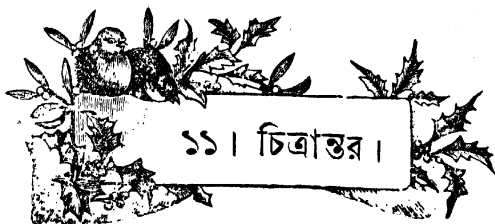
ম. দীনেশ রঞ্জনের বয়স্য, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধবগণ এবং ঢাকাস্থ নব-বিধানমণ্ডলীর শ্রদ্ধেয় কয়েকজন প্রচারক মহাশয়দের নিকট হইতে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি চিঠি পাইয়াছি। তাহা এ স্থানে প্রকাশিত হইল।

আমার একজন ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীমান দীনেশকে শিশু বয়সে জানিতেন, তিনি শ্রীমান সম্বন্ধে এরূপ লিখেন ;—

ভুতুর প্রকৃতি ভাল। সরল, শান্ত ছিল। আমরা তাহাকে খুব ভাল বাসিতাম। এই ছেলে বয়সেও সে কলহপ্রিয় ছিল না।

অমায়িক ভাবে সকলের কাছে আসিত। ভাইয়েরা মারিলে কি কষ্ট দিলে সে সহ্য করিত। আমরা নিষেধ করিলে সে কোন কার্য্য করিত না।

(স্বা) শ্রীমহিমচন্দ্র দত্ত

আমার জ্ঞাতি এবং ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীমান্ আনন্দকিশোর রায়ের পত্র হইতে নিম্নলিখিতরূপে সার উদ্ধৃত করিলাম।

শৈশবে দীনেশ ও বিনোদমণির প্রকৃতিতে অনেক সাদৃশ্য ছিল। তাহার শান্ত প্রকৃতি, মধুরস্বভাব, সুশীল ও সচ্চরিত্র ছিল। তাহাদের পিতামহী বলিতেন শিশুকালে দীনেশের ন্যায় তাহার খুড়ার স্বভাব ছিল। বিনোদমণি দীনেশকে খুব ভাল বাসিত। আমোদ করিয়া পরেশ অনেক সময় দীনেশকে শক্ত আঘাত করিত। বিনোদ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দীনেশকে পুনর্ব্বার আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিত — অনেক সময় তাহা করিতে যাইয়া সে নিজেই মার খাইয়া আসিত। বাস্তবিকই বিনোদ ও দীনেশের মধ্যে বড়ই প্রণয় ছিল। শিক্ষকগণের সাধু চরিত্র এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয়দের সদ্দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া দীনেশের চরিত্র সুগঠিত হইয়াছিল। এবং সমুচিত অনুশীলন দ্বারা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি বিশেষরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার মধুর প্রকৃতি এবং অমায়িক ব্যবহার এবং সরলতা দ্বারা সে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। উপাসনায় তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। এবং ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে মাতিয়া উঠিত। প্রফুল্লতা সর্ব্বদা তাহার মুখে বিরাজ করিত। তাহার সঙ্গে যে মিশিয়াছে সেই তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়াছে। কিন্তু পরম করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা আমরা বুঝিতে পারি না। কেন যে তিনি সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই দীনেশকে ইহলোক হইতে অবসৃত করিলেন, তাহার গূঢ় রহস্য কে ভেদ করিবে? কিন্তু দেহ নশ্বর হইলেও আত্মা অমর। এই অমরাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিবার জন্য চিরদিন ব্যগ্র। জীব পৃথিবীতে যতদিন থাকে ততদিন ধ্যান, ধারণা, উপাসনাদি দ্বারা এবং সদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাকে মুক্তি লাভের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা দীনেশের আত্মা যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়া গিয়াছে, তাহাতেই আমরা আশা করিতে পারিতেছি যে তাহার অনন্তজীবনের পথ খুব পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

(স্বা) শ্রীআনন্দকিশোর রায়

বিধানপল্লীস্থ আমাদের একটী স্নেহের কন্যা স্বামীর আলয় হইতে শ্রীমান সম্বন্ধে একখানি পত্রে এইরূপ কয়েকটী কথা লিখিয়াছেন ;—

"যখন সেই আরমাণিটোলার বাড়ীতে প্রথমে তাঁহার সঙ্গে একত্র হয়ে লিখাপড়া করি এবং প্রায় সময়ই তাঁহার সঙ্গে মিশি, তখন হইতে স্বভাবতঃই যেন তাঁহার প্রতি আমার একটা ভালবাসা জন্মিয়াছিল। ভুতুও আমাকে একেবারে নিজ ভগিনী জ্ঞানে ভালবাসিত। এমন কি যখন আমরা এই পাড়াতে আসি, তখন আমার সহিত এক সঙ্গে খাইত, একসঙ্গে সর্ব্বদা আলাপ করিত। সেইজন্য কত সময় কেহ কেহ তিরস্কার করিয়াছেন। একদিন তাঁহাকে আমার সঙ্গে খাইতে দেখিয়া একটী বাবু তাঁহাকে এবং আমাকে তিরস্কার করিলেন। তাহাতে ভুতু আমাকে বলিল 'দিদি, উনি যে মন্দ বলিলেন তাহাতে কি তোমার মনে কোন কষ্ট হইতেছে ?' তাহার উত্তরে আমি বলিলাম, 'ভুতু উহাঁরা আমরা দুজনে মিলি মিশি বলে খারাপ মনে করেন, তখন নাহয়, তুমি আমার কাছে বেশী এসো না।' তখন ভুতু বলিলেন, 'দিদী ভগবান দেখিতেছেন, আমরা কোন অন্যায় কাজ করি না। আমাদের দুজনের ভিতরে যদি কোন অন্যায় ভাব থাকে তাহা হইলে, মানুষের তিরস্কার আর কি বেশী ?

ভগবান গুরুতর শাস্তি আমাদিগকে দিবেন।’ তখন আমি বাস্তবিক বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার কেমন ভগবানের প্রতি দৃষ্টি এবং তাঁহার কেমন পবিত্র স্বভাব। আমি যখন প্রথম…যাই, তখন যখন আমার নিকট বিদায় হইতে আসিলেন, তখন আমাকে এমনি মিষ্টভাবে বলিলেন যে, ‘দিদী আমরা তোমাকে আর ঢাকাতে দেখিতে পারিব না। কিন্তু ভগবানের দিকে তাকাইয়া যদি তোমাকে দেখিতে চাই, তবে অন্তরে তোমাকে দেখিব। আমি গেলে, ঢাকা হইতে ভুতু আমাকে যে সব চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা ছিল। কিন্তু সেই সব চিঠি অযত্নে আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং সেই সব লিখিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে কি জানিতাম যে, স্নেহের ভাই আমাদিগকে ফেলিয়া এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন।”

শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্র সেনের চিঠি হইতে নিম্নলিখিত রূপে সার সংগ্রহ করিলাম ;—

আপনারা যখন নয়াবাজারের বাসায় থাকিতেন ভুতুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁহার বয়স ৬।৭ বৎসর ছিল। তিনি আমাকে খুব ভালবাসিতেন। আমরা উভয়ে একত্র খেলা করিতাম, তিনি খুব ঘুড়ী উড়াইতে পারিতেন। ঘুড়ী উড়ান

বিষয়ে তিনি বিলক্ষণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অন্যের ঘুড়ী খুব কাটিতে পারিতেন—তাঁহার ঘুড়ী কম কাটাযাইত। তিনি বেশ ভাল ভাল ঘুড়ী কিনিয়া আনিতেন। মণ্ডু নামক উৎকৃষ্ট ঘুড়ীওলার দোকান হইতে ঘুড়ী ক্রয় করিবার জন্য একদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে ঘুড়ী আনিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা ঘুড়ী উড়াইলাম। মার্‌বেল্ খেলাতেও তিনি সুদক্ষ ছিলেন। "গোল্লাপার" নামক খেলায় আমাদের মধ্যে তাঁহার ন্যায় কেহই দৌড়িতে পারিত না। আমি ছোট থাকিতে ঘুড়ী উড়ান খেলাতে যখন 'ধরাইর' কাজ করিতাম, তখন অন্য কোন বয়স্যের ঘুড়ী ছিঁড়িলে, তিনি আমাকে মারিতেন কিন্তু ভুতু দাদার ঘুড়ী ছিঁড়িলে, তিনি কখনও মারিতেন না, কেবল মন্দ বলিতেন। তাহাও সর্ব্বদা নয়। এজন্য আমি তাহার সঙ্গে খেলা করিতে ভালবাসিতাম। খেলা ছাড়া অন্য সময়ও তিনি খুব ভাল ব্যবহার করিতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে কখনও ঝগড়া করেন নাই। তবে তিনি মাঝে মাঝে বড় দুষ্টামি করিতেন। আমরা তাঁহাকে প্রায় কখনও রাগ করিতে দেখি নাই। স্কুলের ছাত্রদের সঙ্গে অতিশয় সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি সমপাঠী বন্ধুগণকে খুব ভালবাসিতেন। মডেল্ এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের অন্যান্য ছাত্রদিগকেও ভালবাসিতেন। কলীজিয়েট্ স্কুলে গিয়া তাঁহাদের সেক্‌সনের প্রায় সকলের সঙ্গে অত্যল্পকালের মধ্যে

মিল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়ে অন্যান্য ভাবাপেক্ষা ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তাঁহার উপর নির্ভর বিশেষ প্রবল ছিল। আহারাদি বিষয়ে কখনও তাঁহার স্বার্থপরতা দেখি নাই। অন্যকে না দিয়া তিনি নিজে কখনও বেশী খাইতে চাহিতেন না। আমাদিগকে কখনও কিছু খাওয়াইলে, সমানে সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন। কোন ভাগ ছোট হইলে, নিজে তাহা লইয়াই তুষ্ট হইতেন। বাস্তবিক অন্যকে খাওয়াইবার ভাব তাঁহার মধ্যে খুব প্রবল ছিল। সুযোগ এবং সুবিধা পাইলেই তিনি সেই ভাব চরিতার্থ করিয়া সুখী হইতেন। গরীব দুঃখীর প্রতি তাঁহার বড়ই কোমল ভাব ছিল। তাঁহার পকেটে প্রায়ই পয়সা থাকিত, গরীব আসিয়া চাহিলেই তাহাকে পয়সা দিতেন। তখন না দিতে পারিলে অন্য সময়ে আনিয়া দিতেন; কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। দুঃখীদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা থাকাতে সুযোগ পাইলেই তাহাদিগকে কিছু না কিছু দিতেন।

(স্বা) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন।

শ্রীমানের একজন বয়স্য ও বন্ধুর পত্রের সার এই ;—

দীনেশের বয়স যখন ৯ কি ১০ বৎসর তখন তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। সেই অবধি তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, প্রায় একত্র বাস করিয়াছি। এত অনেক সময় একত্র

থাকিতাম বলিয়া বাহিরের লোক আমাদিগকে দুই ভাই বলিয়া জানিত। ছোটকালে আমাকে প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ীতে রাখিতেন। তখন হইতেই তাহার অন্তরের কোমল ভাব টের পাইতাম। তদানীন্তন একটী ঘটনা মনে পড়িল। একদা আমরা একখানি বই পেয়ে যখন একজনের প্রতি আর একজনের অত্যাচারের কথা পড়িতেছিলাম, তখন দেখি তাঁর দুটী চক্ষু দিয়া অবিরল জল পড়িতেছিল। আহা! তার ছোট কোমলহৃদয়ে কতই না আঘাত লাগিয়াছিল! এই কোমলতা তাঁহার হৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। এজন্য তাঁহাকে কখনও রাগ করিতে দেখি নাই। শিশুকালে কি যৌবনে বন্ধুদিগের সহিত সর্ব্বদা মিশিতেন, আলাপ করিতেন, আমোদ করিতেন, খেলা করিতেন; কিন্তু কাহারো প্রতি রাগ কি বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। আমরা তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছি, রাগ করিয়াছি। এমন কি তাঁহাকে মারিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার নির্ব্বিকার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। কাহারো অন্যায় ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে অন্তরে মালিন্য আসিত না। মিষ্ট ব্যবহারে সকলকে ভুলাইতেন। নিজে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতেন। কেহ তাঁহার প্রতি রাগ করিয়া অনেকদিন সেই ভাবে থাকিতে পারিত না। তাঁহার হাসিমাখা মুখ দেখিলে রাগ ভুলিয়া যাইত। শিশুকাল হইতে খেলা খুব ভালবাসিতেন এবং

ভাল খেলিতে পারিতেন। মার্‌বেল, ঘুড়ী, ক্রিকেট্, ফুট্‌বল্, হকি, গল্‌ফ্ ইত্যাদি খেলাই ভালবাসিতেন। ক্রিকেটের উপ-করণাদি ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং একটী ক্লব বা সভা গঠন করিয়া খেলার উন্নতি বিষয় আলোচনা করিতেন। খেলাতে কখনও তাঁহার রাগ, ধৈর্য্যচ্যুতি,কিম্বা প্রবঞ্চনা প্রকাশ পায় নাই। খেলার দলগড়িবার সময় অন্যের সঙ্গে বিবাদোপস্থিত হইলে তিনি নিজে যত অপটু খেলু লইয়া বিবাদ ভাঙ্গিয়া দিতেন। তিনি হৃদয় খুলিয়া বয়স্যগণকে ভালবাসিতেন, সুতরাং সকলেই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। বন্ধুর সঙ্গে কপট ব্যবহার করাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এজন্য সকলেরই সঙ্গে তাঁর প্রাণের মিল ছিল। অন্যের কপট ব্যবহারে খুব ব্যথিত হইতেন এবং তাহার অন্যায় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন। কাহারো প্রতি সংশয় জন্মিলে সে কথা গোপন না রাখিয়া তাহাকে সরলভাবে তাহা বলিতেন। অন্যায় অসত্যকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। সত্য প্রকাশ করিয়া অনেক সময় তাঁহাকে নির্যাতনপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। যাঁহাকে তিনি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, এমন কোন গুরুজন সম্বন্ধে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি এই ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন;—“আমাকে misunderstand করিয়া তিনি আমার প্রতি ঠিক ব্যবহার করেন নাই। তবু আমার ইচ্ছা ছিল একদিন তাঁহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলিয়া

তাঁহাকে সব বুঝাইয়া দি। আর ইহাতে আমার অন্যায় থাকিলে, তাঁহার কাছে সেইজন্য ক্ষমা চাই। কিন্তু আর হইল না।"

কোন ভালবস্তু দেখিলে বন্ধুদিগকে তাহা খাওয়াইতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। এ তাঁহার জীবনের একটী বিশেষ ভাব। অপরের সঙ্গে যত, নিজে নিজে খাইয়া তিনি তত সুখী হইতেন না। উৎসবের সময় ভক্তমণ্ডলী ও অপরাপরকে খাওয়াইবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে কত উৎসাহ দেখা যাইত! গরীবের প্রতি তাঁর বড় দয়া ছিল। পথের ভিখারীদিগকে পয়সাতো দিতেনই, আবার তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দুখের কত কথা কহিতেন, কত সহানুভূতি, কত দুঃখব্যঞ্জক ভাবপ্রকাশ করিতেন! ঘর সাজান এবং পুস্তক, কাপড় ইত্যাদি গুছাইয়া রাখা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কাজ ছিল। তাঁহার দিদি এক দিবস এসম্বন্ধে তাঁহার একটুকু ত্রুটি পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন। ফুল তাঁর খুব আদরের জিনিষ ছিল। বাগানে ফুল গাছ নিজ হাতে লাগাইতেন। তাহার অনেক গাছ আজও বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার স্মৃতি আমাদের প্রাণে জাগাইয়া তুলিতেছে। গাছে যখন সুন্দর ফুল ফুটিত একদৃষ্টে একাগ্রমনে তাহার পানে তাকাইয়া প্রায়ই তিনি গাহিতেন ;—

"ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখরে মায়ের হাসি
মা হাসে ফুলের ভিতরে তাই ফুল এত ভালবাসি।"

উৎসবের সময় পুষ্পাদি দ্বারা মন্দির সাজান তাঁহার এক বিশেষ কাজ ছিল—তিনি ইহাতে ভক্তগণের উপাসনার সাহায্য হইবে এই বলিয়া আগে উৎসাহিত হইতেন, এবং বলিতেন, ইহা হইতে তাঁহার আর উচ্চ উপাসনা নাই।

নিজের শরীর এবং পরিধেয় বস্ত্রাদির পরিস্কৃতি সম্বন্ধেও খুব মনোযোগ ছিল; কিন্তু তাহা লোক দেখাইবার জন্য নয়, প্রয়োজন বোধে। বাস্তবিক অহঙ্কার তাঁহার পবিত্র চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে নাই। সকলকে একভাবে দেখা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। এই জন্যই বালিয়াটির "দিগু" বাবুর ছেলে যে তাঁহার সঙ্গে মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেন এবং অন্যান্য বিষয়ে অমায়িক ব্যবহার করিতেন, সেই ভাবের তিনি খুব প্রশংসা করিতেন। সকল প্রকার লোকের সঙ্গেই তাঁহার বন্ধুতা ছিল। কিন্তু কেহই অন্যায়ের দিকে তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে নাই; বরং অনেককে তিনি ফিরাইয়া সৎপথে আনিয়াছেন। একবার একজন তাঁহাকে বিপথগামী করিতে যায়; সেইজন্য তিনি তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া প্রয়োজন ব্যতীত কিছুকাল তাঁহার সঙ্গে কোন কথা বলেন নাই।

স্কুলেও তিনি ভালবাসার পাত্র ছিলেন। প্রথম হইতে নিম্ন শ্রেণীর অধিকাংশ বালকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। রুগ্নাবস্থায় নৌকা হইতে বুড়ীগঙ্গাতীরে বেড়াইবার সময় কলেজ ও স্কুলের

বড় ছোট ছেলেরা তাঁহার শরীর দেখিয়া উদ্বিগ্ন বাক্যে জিজ্ঞাসা করিত, "আপনার কি হইয়াছে?" স্কুল এবং কলেজের শিক্ষকগণও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। যাঁদের নিকট পড়েন, তাঁদেরও কাহারো কাহারো ভালবাসা পাইয়াছেন। শিক্ষকদিগের সহিত সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিতেন—পড়াশুনা সম্বন্ধে কোন বিষয় না জানিয়া জানার ভাণ কখনও তিনি করিতেন না। তাঁহার ভালবাসার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি একদিন যাহাকে ভালবাসিয়াছেন, আজন্ম তাহার সঙ্গে ভালবাসা রাখিয়া গিয়াছেন। বিমলানন্দ বাবুর ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনে তাঁহার সঙ্গে দীনেশের বন্ধুতার কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। এতদ্ব্যতীত বাড়ীর দাস, দাসী, মুদী, দোকানদার, ব্যবসায়ী, সকলের সঙ্গেই তাঁহার সদ্ভাব ও সদ্ব্যবহার ছিল। ভৃত্যেরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভাল বাসিত, দোকানীরা তাঁহাকে খুব বিশ্বাস করিত, রোগের সময় সহানুভূতি দেখাইত এবং মৃত্যুর পর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন, ভাল বাসিতেন, তাই তাহারাও তাঁহার প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিত। জিনিষ কিনিতে গিয়া দোকানদারদের সঙ্গে তাঁহাকে গোল করিতে হইত না—তিনি লোক চিনিতেন, লোকেরাও তাঁহাকে চিনিত সুতরাং বিশ্বাসেই কাজ করিত—দর দাম করিয়া সময় কাটাইতে হইত না। তাঁহার মত ও বিশ্বাস এই ছিল যে, দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া অগ্রে জিনিষ পছন্দ,

করিতে হয়, তৎপর মনে মনে মূল্য ধরিয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার দর নিজের ঠিককরা দরের সঙ্গে যদিমিলে কি অল্প বেশ কম হয়, তবে তাহাই দিতে হয়। নচেৎ নিজে দর বলিয়া জিনিষ পাইলে সেই দরে খরিদ করিতে হয়—সস্তামহার্ঘের বিষয় ভাবিতে হয়না। এক দিবস ১।০ দর দেওয়া জিনিষ ৷৹০ আনাতে ক্রয় করা হইয়াছে দেখিয়া কেহ আপত্তি করাতে এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দোকানীদের অর্থঋণ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া প্রাণপণ যত্নে সত্বর তাহা পরিশোধ করিতেন। আবার কেহ কোন উপকার করিলে চিরদিন তাহা মনে রাখিতেন। পীড়ার সময় যাঁহারা সেবা করিতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতেন "বাঁচিলে এ ঋণ পরিশোধ করিবই--সকলের সেবা করিয়া ধন্য হইবই।" তাঁহার মুখে কেহ কখনও অপবিত্র ভাষা শ্রবণ করে নাই। যাহাদের মন অপবিত্র, সুতরাং যাহাদের ব্যবহার আচার অশুদ্ধ, তিনি তাহাদের সঙ্গে মিশিতেন না, চরিত্রবান লোক-দের সহবাস করিতেন। যখন ছোট ছিলেন, তখন তিনি "বাল্য-নীতি" সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সময় সময় সুন্দর সুন্দর রচনা পাঠ করিয়া সকলকে আমোদিত ও চমৎকৃত করিতেন। পরে যুবকদের "ধর্ম্মনীতিশিক্ষা" সভার সভ্য হইয়া তাহাতেও রচনাদি পাঠ করিয়া অন্তরের উৎসাহ প্রদর্শন করি-তেন। এ সকল রচনাতে তাঁহার হৃদয় নিহিত সরল ধর্ম্মভাব

অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইত। "প্রার্থনা" নামক যে একটী রচনা পাঠ করেন, তাহা তাহার অন্যতর একটী প্রমাণ। তাঁহার ধর্ম্মভাব আমাদের ধর্ম্মের বিপরীত—অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম বাহিরের, তাঁর ধর্ম্ম ভিতরের। ভিতরে ভিতরে তিনি মাকে বিশ্বাস এবং তাঁহার অসীম দয়ার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তাই তিনি কোন অবস্থায় অধীর অস্থির না হইয়া সর্ব্বদা সন্তৃপ্ত ও প্রফুল্ল থাকিতে পারিতেন। এবং এজন্যই আমরা কখনও তাঁহার সুন্দর প্রফুল্ল বদনে বিষাদের ছায়া দেখি নাই, অন্তরে ভাবনা আছে বলিয়া টের পাই নাই। জানেন আছি মায়ের কোলে, তাই সরল শিশুর ন্যায় সর্ব্বদা হাস্যমুখ, সোদ্যম উৎসাহ। মায়ের ভালবাসা এবং তাঁহার দয়ার উপর জীবন্ত বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে অন্যভাব দেখিয়া দুঃখের সহিত কত-বার আমাদের নিকট বলিয়াছেন, "এমন দয়াময় ঈশ্বরকে কেন লোক চিনে না, জানে না? মায়ের এত স্নেহ পাইয়াও, সর্ব্বদা তাঁহার স্নেহময় কোমল কোলে থাকিয়াও কেন লোক নাস্তিক হয়?" অল্প বয়সে উৎসবের সময় যে বার অভিনয়ে ধ্রুব সাজিয়া ছিলেন, সেই সময় হইতে হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্রুবের ন্যায় সরলশিশু বিশ্বাসী হইয়া রোগ ও মৃত্যুশয্যায় তাহা সকলকে দেখাইয়া গেলেন।

(স্বা) শ্রীশশিকান্ত মিত্র

তাঁহার বন্ধু শ্রীমান্ বিমলানন্দ নাগ এইরূপ লিখেন ;—

অল্প দিন হইল আমি ঢাকায় আসিয়াছি—এখনো সকল ব্রাহ্মদের সহিত পরিচয় হয় নাই। একদিন আমার একটী সমপাঠীর সহিত নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় একটী বালক অতি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "আপনি আজ কি সমাজে যাই-বেন না ?" প্রশ্নের মধ্য দিয়া তাহার হৃদয়ের যে আগ্রহ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমার বন্ধু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং সহজেই আমার হৃদয় এই বালকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে জানিলাম এই বালকের নামই দীনেশ। পরিচয় ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। অনেক সময়ই আমরা দুজনে মিলিয়া জীবনগত অনেক বিষয় আলোচনা করিতাম। এইরূপে দীনে-শের জীবনের অনেক ঘটনা আমি জানি যাহা হয় তো অন্য কেহ জানেন না। নিম্নে কয়েকটী ঘটনায় উল্লেখ করিতেছি।

দীনেশ পিতার অত্যন্ত বাধ্য সন্তান ছিলেন। তাহার বাধ্য-তার একটী বিশেষ গুণ ছিল যে নীরবে লোকে জানুক বা না জানুক সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সে প্রতি কার্য্যে পিতার বাধ্য থাকিতে ভালবাসিত। মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রম আছে, দীনেশের পিতাও দীনেশকে না বুঝিতে পারিয়া অনেক সময় এরূপ আদেশ করিয়াছেন যাহা না করিলেই ভাল হইত ; কিন্তু দীনেশকে এরূপ

অবস্থায়ও অনেক কাঁদিতে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু কখনও পিতার অবাধ্য হইতে দেখি নাই।

একদিন দীনেশ আমাকে বলিয়াছিল "আপনি আমাকে একটী বিষয়ে শাসন করিবেন।" সে বলিল, "দেখুন আমি পান খাইতে শিখিতেছি, আজ ভাবিয়া দেখিলাম ইহা আমার বড় অন্যায়। আমার পিতা এক সময় অত্যন্ত তামাক খাইতেন তাহা দেখিয়া আমার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তামাক খাইতে আরম্ভ করেন। পিতা ইহা জানিতে পারিয়া তিনি তামাক একেবারে ছাড়িয়া দেন। অত্যন্ত পান খাইতে আরম্ভ করেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও সঙ্গে সঙ্গে পান খাইতে আরম্ভ করিলেন। বাবা ইহা জানিতে পারিয়া পানও ছাড়িলেন। আর আমি দেখিতেছি, আমি এখন সেই পান খাইতে শিখিতেছি। আর যদি কখনো আমাকে পান খাইতে দেখেন, তবে শাসন করিবেন। কারণ পিতা যদি জানিতে পারেন আমি পান খাই, না জানি তাঁহার প্রাণে কত ব্যথা পাইবেন।" সে দিন হইতে দীনেশের সাহায্যের জন্য আমি পান পরিত্যাগ করি—এবং দীনেশকে তাহার পরে আমি কখনও পান খাইতে দেখি নাই।

বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর দূষণীয়তা দর্শন করিয়া দীনেশের পিতা একটী নূতন স্কুল স্থাপন করেন এক সময়ে অনেকেই অকারণে এই স্কুলের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন, এমন কি এই

স্কুলে যাহারা পড়ে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে এরূপ কথা বলিতেও ক্ষান্ত হন নাই। দীনেশ একদিন কথায় কথায় অত্যন্ত ভাবের সহিত আমাকে বলিয়াছিল "পিতার বাধ্য হইতে যাইয়া যদি আমার লেখা পড়া শিক্ষা না-ই হয়, যদি চিরকাল মূর্খই থাকি বা যদি সত্য সত্যই আমার সর্ব্বনাশ হয় তবেই বা আমার ক্ষতি কি? পিতৃ বাধ্য তো মানিলাম।" সেদিন দীনেশের নিকট আমি আশ্চর্য্য শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম।

দীনেশের জীবন সাত্বিক ভাবাপন্ন ছিল। তাহার সমস্ত জীবন যেন গদ্যময় ছিল। অসার কবিত্বের লেশমাত্রও ছিল না। তাহাকে যিনি প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছেন, তিনিই ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন। তাহার প্রার্থনা ভাবুকতাপূর্ণ ছিল না কিন্তু অতি সাত্বিক ভাবাপন্ন। অনেক দিন আমরা দুজনে নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিয়াছি এবং আমার যতদূর মনে পড়িতেছে, প্রতিদিনই এরূপ সাত্বিক ভাবের প্রার্থনা দ্বারা আমরা বিশেষ উপকৃত হইতাম। ঈশ্বরকে বর্ত্তমান ঈশ্বররূপে সম্বোধন করিতে সে অত্যন্ত ভালবাসিত। ১৮৯১ খৃঃঅব্দে ১৯শে সেপ্টে-ম্বর সে প্রার্থনা সম্বন্ধে একখানি রচনা পাঠ করে। প্রার্থনা সম্বন্ধে তাহার জীবনের অনেক সত্য সেই রচনাতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরসেবাতে দীনেশ যেমন পটু ছিল এরূপ আর আমি কোন

বালককে দেখি নাই। যাঁহারা তাহার জীবন-পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই তাহার পরসেবার কথা উল্লেখ না করিয়া পারেন না। দীনেশ আমার কনিষ্ঠ হইলেও আমার অসুস্থ অবস্থায় একেবারে মায়ের মত সেবা সুশ্রূষা করিত। আমার কেন? পল্লীতে যেখানেই সেবার প্রয়োজন হইত সেখানেই দীনেশ আনন্দের সহিত উপস্থিত থাকিত। এক সময় ঢাকাস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মন্মথ বাবু বিধান পল্লীতে আসিয়া সারা দিন থাকিয়া যান, দীনেশ তাঁহাকে এবং অন্যান্য সকলকে পরিবেশন ও অপর কার্য্যাদিতে এরূপ ভাবে সেবা করিয়াছিল যে মন্মথ বাবু ভাবপ্রণোদিত হইয়া আমার একটী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ঐ দেব সন্তানটী কে?"

দীনেশ এখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। পূর্ব্বেই আভাস প্রদান করিয়াছি যে দীনেশ নির্জ্জনে প্রার্থনা ভালবাসিত। একদিন আমি অসুস্থ, দীনেশ একাকী রমণার মাঠস্থ ঘোড়দৌড় গৃহে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। হঠাৎ কে যেন আসিয়া তার চোক চাপিয়া ধরিল। দীনেশ তাহার হাত ধরিয়া বুঝিতে পারিল যে হাতে বালা আছে, সুতরাং মনে করিল যে তাহার কোন আত্মীয়া আসিয়া থাকিবেন অথচ তাহার এরূপ ব্যবহার বুঝিতে না পারিয়া জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া দেখিতে পাইল এক পিশাচী সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে। দীনেশ দেখিয়াই সাতঙ্ক হৃদয়ে

পালাইবার জোগাড় করিতেছে, এমন সময় পিশাচী তাহার চাদর জড়াইয়া ধরিল। দীনেশ চাদর ফেলিয়া ত্রাসে এক দৌড়ে আসিয়া পল্লীতে উপস্থিত হইল। এবং ৩।৪ ঘণ্টা পরে যাইয়া দেখে তাহার চাদর সেই গৃহেই পড়িয়া রহিয়াছে। প্রলোভনের উপর দীনেশের এই জয়লাভ তাহার ভাবী জীবনে অত্যন্ত কার্য্যকারী হইয়াছিল।

দীনেশকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসিতাম। অনেক সময়েই জীবনগত ধর্ম্মবিষয়ে আমরা আলাপ করিতাম। সুতরাং ঈশ্বরও অনুগ্রহ করিয়া আমাদের দুজনকেই এক সময়ে এক সত্য বুঝিতে দিতেন। এই সময় আমি খৃষ্টান হওয়াতে যদিও সমাজগত পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তবুও আমার ধারণা বিশ্বাসগত কোন পার্থক্য উপস্থিত হইয়াছিল না। আমার খৃষ্টান হওয়ার এক মাস পরেই দীনেশ সপিতৃক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া যান। সেখানে Missionary Lorrain সাহেবের সহিত তাহার অনেক আলাপ হয়। আলাপের সময় Lorrain সাহেবকে দীনেশ বলিয়াছিল যে "আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে খৃষ্টই আমার পরিত্রাতা।" Lorrain সাহেব তাহার সহিত আলাপ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এবং তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, যে "আমি বিশ্বাস করি তোমার বন্ধু শীঘ্রই খৃষ্টের সাহসী সৈন্য ("valiant soldier") হইবে এবং আমি ইহার

জন্ত প্রার্থনা করিতেছি।" নিম্নে সেই পত্র হইতে কতটুকু অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

We talked chiefly upon each things as the above, and your friend said that since your conver sion he had begun to see that Jesus was indeed *the* Saviour he needed. I shall not forget to pray for you both that the Lord may bless whatever you may be led to say to him. I had some very interesting talks with him and enjoyed his com pany very much indeed, he seems an earnest young fellow and I believe will ere long be a valiant soldier of King Jesus.

(Sd.) J. Herber Lorrain.

দীনেশকে শেষ পর্য্যন্ত ইহার বিপরীত ভাবে আমি কোন কথা বলিতে শুনি নাই। আমার বিশ্বাস দীনেশ এখন খৃষ্টেতে সুখী।

শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা নিম্নলিখিত চিঠি লিখিয়াছেন ;—

দীনেশকে আমরা ছেলেবেলা হইতে দেখিয়াছি। আমাদের পরিবারের সহিত তাহার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমি তাহাকে,

অত্যন্ত ভালবাসিতাম,এবং আমাদের পরিবারের সকলেই তাহাকে খুব ভালবাসিত। তাহার স্বভাবটী বড়ই মিষ্ট ছিল, সর্ব্বদাই তাহার মুখে হাসি বর্ত্তমান ছিল, কদাচিৎ তাহাকে ম্লান থাকিতে দেখা যাইত। তাহার সেই স্বভাবের গুণে ছোট বড় সকলেরই ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার অন্তর বড় সরল এবং উদার ছিল, কোন প্রকার কুটিলতা ও নীচতা তাহাতে কখনই দেখিতে পাই নাই,কাহারও কোন বিষয়ে নীচতা দেখিলে অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিত। ধর্ম্মের প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাহার মৃত্যু সময়ের গভীর বিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়া গিয়াছে।

মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে দীনেশ আমাদের সঙ্গে একত্রে কিছু দিন বাস করিয়াছিল, তখনই তাহার প্রতি আমাদের প্রাণের টান আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যদিও দীনেশ আমাদের এক পরিবারভুক্ত ছিল না, তথাপিও তাহার স্বভাবের সরলতাগুণে তাহাকে কখনও আমরা পর ভাবিতে পারি নাই। আমাদের বাড়ী থাকিতেই তাহার জ্বরের সূত্রপাত হয়। সেই সময়ে তাহার সহিষ্ণুতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, এত দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া ছিল,কিন্তু কখনও কাহাকেও কোন বিষয়ে কষ্ট দেয় নাই। যখনই জিজ্ঞাসা করিতাম "দীনেশ কেমন লাগে" তখনই হাসি-মুখে উত্তর করিত। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য

আরাসহরে তাহার ভগ্নীর নিকট গিয়াছিল, যাইবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, সে আমাকে একজন ডাক্তারের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল যে "বাবার কাছে আমি যাহা খাইতে চাই তিনি তাহাই আমাকে খাইতে দেন, আমার যেন মনে হয়, তিনি স্নেহ-পরবশ হইয়া আমি যাহা চাই তাই খাইতে দেন, আমার পক্ষে কি সব জিনিষই খাওয়া ভাল তুমি সেই ডাক্তার বাবুকে একটু জিজ্ঞাসা কর" তাহার এই সময়ে এইরূপ কর্ত্তব্য জ্ঞান দেখিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল, কিন্তু তাহার এইরূপ কাতরোক্তিতে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। শেষ অবস্থায় আমি নিজে তাহাকে দেখি নাই, তাহার বড় ভগ্নীর নিকট হইতে তাহার সেই সময়ের অনেক কথা শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন যে "যখন যন্ত্রণায় বড় ছট্ ফট্ করিত,আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম যে দীনেশ তোমার কি বড় কষ্ট হইতেছে? তখনই সে বলিত, দিদি আমার কি আর কষ্ট, কত অন্ধ, আতুর, কুষ্ঠরোগী আজীবন কত কষ্ট পাইতেছে তাহাদের তুলনায় আমার এ কষ্ট কিছুই নয়"। তাহার এইরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং দয়ার কথা শুনিলে কার না চক্ষে জল আসে?

আমাদের প্রিয় দীনেশ অসময়ে অপরিণত বয়সে যে আমাদের ছাড়িয়া যাইবে তাহা আমরা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। দীনেশ

তাহার জীবনের কাজ সমাপ্ত করিয়া পরম পিতার কোলে গিয়াছে কিন্তু তাহার সেই স্বভাবের মধুরতা চিরদিন আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

(স্বা) সুবালা।

আমার কোন ভ্রাতুষ্পুত্রীর পত্র হইতে নিম্নলিখিত কথা কয়টী উদ্ধৃত করিলাম

বাস্তবিক দীনেশ স্বর্গের একটী ফুল ছিল, তাই এ মর্ত্তে না ফুটিতেই বিলীন হইয়া গেল ; এই কচি বয়সেই তাহার যেরূপ বিশ্বাস এবং মনের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছিল, এই প্রকার ছেলে বয়সে তাহা কথনই সম্ভবেনা ; এমন পবিত্রতাপূর্ণ-হৃদয় কি জানি সংসারের কুটিলতার কীটদংশনে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়, তাই বুঝি পিতা সেই কুসুমকলিটী না ফুটিতেই স্বীয় কোমল হস্তে টানিয়া লইলেন ; যাহা হউক, তাহার এই ইহজীবনের খেলা যে কয়দিন দেখিয়াছি সেই সময়কার কথা আজীবন ভুলিতে পারিব না। শারারিক নানাবিধ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যেও এই কচি বয়সে সেই পরমপিতার প্রতি তাহার এইরূপ অটল বিশ্বাস বড়ই আশ্চর্য্যজনক। প্রায় দুই বৎসর হইবে সে শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে ; তথাপি আমি একদিনও তাহার মুখে বিরক্তির ভাব দেখি নাই ; ইহা লঘু অন্তঃকরণের কর্ম্ম নয়। তাহার কেবল

যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছিল, তাহা নয়; নিজের পিতার প্রতিও তাহার অসাধারণ ভক্তি ছিল; পিতা যাহা বলিতেন, তাহাই শিরোধার্য্য মনে করিত। সে সম্বন্ধে একটী কথা লিখিতেছি, তাহার খাওয়ার প্রায় প্রত্যেক জিনিষেই অরুচি ছিল, তাহাতে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি খাইতে ইচ্ছা হয়?" তাহাতে সে বলিল "ডাল এবং তরকারী হইলে বোধ হয় কিছু খাইতে পারিব; তবে ইহাতে পিতা মহাশয়ের নিষেধ আছে।" তবু আমি বলিলাম "একদিন খাইয়া দেখনা ভাল লাগে কিনা?" তাহাতে সে বলিল "না, ইহাতে আমার ভ্রম হইতে পারে।" রোগের অবস্থায় এই দৃঢ় বিশ্বাস কত মহৎ অন্তঃকরণের কথা!

(স্বা) শ্রীকুসুমমালা দত্ত।

একজন প্রচারকপত্নী এইরূপ লিখেন;—

আহারাদি বিষয়ে কখনও কোনও স্বার্থপরতা দেখি নাই। অসুখের পূর্ব্বে যখন এখানে আহার করিত তখন সকলের আগে কখনও আহার করিতে চাহিতনা, বলিত যে আপনারা এতক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছেন, আপনাদের কত ক্ষুধা পাইয়াছে আমার তো আর তত ক্ষুধা পায় নাই, আপনি স্নান করিয়া খাইতে না আসা পর্য্যন্ত আমি কখনও খাইবনা—এবং কখনও খাইত না।

গরিব দুঃখীর প্রতি বিশেষ দয়া ছিল। সাধ্যানুসারে তাহাদের দুঃখমোচন করিতে চেষ্টা করিত। অন্যের দুঃখে বড়ই দুঃখিত হইত।

শ্রীগঙ্গাসুন্দরী রায়।

অন্য প্রচারকপত্নী লিখেন ;—

শ্রীমান দীনেশের যখন ১৯।২০ বৎসর বয়স, তখন আমাদের একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ অগ্নিদাহে দেহত্যাগ করেন। পুত্রশোকে অধীরা হইয়া আমি অনেক সময় ক্রন্দন করিতাম, তখন শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জন আমার পার্শ্বে বসিয়া আমাকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দান করিতেন। পরলোক যে নিত্যধাম, দ্বিজেন যে অমরলোকে আছেন,—সকলেই সেথানে যাইব, এই সকল কথা বলিতেন। পাড়ার নরনারীর প্রতি তাহাকে শ্রদ্ধান্বিত, এবং বালক বালিকার প্রতি প্রীতিমান দেখিয়াছি।

তাঁহাদের পরিবারে কোনও অশান্তির কারণ উপস্থিত হইলে, উহাতে যে পিতার মনে ক্লেশ হইতেছে, এই বলিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ কর্ম্মকার লিখেন ;—

ভায়ার বিনয় নম্র ব্যবহারে সর্ব্বদা অতি সুখী করিয়াছে। যখনই সাক্ষাৎ হইয়াছে তখনই ঈষৎ হাস্য বাক্যে ভায়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন।

অনেক স্থানে দেখা যায় পিতা জ্ঞানী, ধনী, মানী, বলিয়া সন্তানেরা মনে মনে অভিমান পোষণ করে, ভায়ার ব্যবহারে সে ভাব কদাচ ঘুণাক্ষরেও টের পাওয়া যায় নাই। বড় আশা, বড় অভিলাষ, তাহার দেখি নাই। সর্ব্বদাই নির্লিপ্ত ভাব। ফলতঃ চরিত্রের গঠন দেখিয়া অনেক সময় মনে আহ্লাদ হইয়াছে। ভায়ার অতি শৈশবাবস্থা ও মাতৃহীন সময়ও যেমন দেখিয়াছি, এই নবীন বয়সেও স্বভাবের সুমিষ্টতা তেমনি দেখিয়াছি। ভায়ার রুগ্নাবস্থার ব্যস্ততা দুইবার দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার smiling face, সুহাস্য বদন কখন মলিন দেখি নাই। এমন আপন বোধ আর কোথাও দেখি নাই।

(স্বা) শ্রীবৈদ্যনাথ কর্ম্মকার।

শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের মধ্যমা পুত্রবধূর চিঠির এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

শ্রীমান্ ভুতুকে আমি খুব ভালবাসিতাম সত্য কিন্তু তাহার জীবনের ঘটনা আমি বিশেষ কিছুই জানি না। তাহার সরলতা ও আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই তাহাকে ভালবাসিতাম। একবার আমাদের লক্ষ্মীবাজারের বাড়ীতে অসুখ হইয়া কতদিন ছিল তখন তাহার আশ্চর্য্য সহ্যগুণ আছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারি—একমাত্র সান্ত্বনা তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

সেবিকা, তরলা।

শিলং হইতে শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন ;—

শ্রীমান্ নিজের চরিত্রের গুণে সকলকেই বশ করিয়া রাখিয়াছিল, যে তাহার সঙ্গে দুই দিন আলাপ করিয়াছে, সেই তাহার চরিত্রের গুণে তাহার বশ হইয়াছে। এইরূপ বয়সে এইরূপ বিবেচনা অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়। তাহার চরিত্রের একটী বিশেষ গুণ ছিল অমায়িকতা, ইহাতে সকলেই তাহাকে এক বাক্যে প্রশংসা করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার অমায়িকতাতে আমাদের ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার নিতান্ত অনুগত হইয়াছিল।

বিনয় ও নম্রতাতেই তাহার চরিত্র গঠিত ছিল। এখানে শ্রীমান্ যে কয় মাস ছিল, তাহার মধ্যে এক দিন কাহারও সঙ্গে তাহার একটী মন্দ ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই নাই।

(স্বা) শ্রীসতীশচন্দ্র সেন।

শ্রীমান্ বৈকুণ্ঠ নাথ দাসের পত্র এই ;—

ঘটনাস্রোতে পড়িয়া আমি অনেক স্থানে গিয়াছি, অনেক পরিবারের সঙ্গে মিশিয়াছি এবং অনেক বালক বালিকাও দেখিয়াছি ; কিন্তু পরলোকগত দেবকুমার দীনেশরঞ্জনের ন্যায় বালক অতি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলে প্রাণে একটা সুবিমল সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব হইত। সাধারণতঃ যে বয়সে বালক বালিকারা নানাবিধ চাপল্য প্রকাশ করিয়া গুরুজনের নিকট তিরস্কৃত হয়, দীনেশরঞ্জন সেই বয়সে ধর্ম্মোপার্জ্জনে যত্নশীল ছিলেন। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের বাটীস্থ দেবালয়ে, দীনেশরঞ্জন যখন চক্ষু মুদিয়া উপাসনা করিতে বসিতেন, তখন তাঁহার মুখে এক অভিনব স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইত। আমি সঙ্গোপনে সেই ভাব লক্ষ্য করিয়া বড়ই উপকৃত ও কৃতার্থ হইতাম। তিনি বয়সে যদিও বালক ছিলেন, তথাপি অনেক বিষয়ে তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতাম।

দীনেশরঞ্জন যে কেবল পড়া শুনা, উপাসনা, এবং শিষ্টাচারেই উত্তম ছিলেন, এমন নহে; পরদুঃখকাতরতাও তাঁহার প্রাণে যৎপরোনাস্তি প্রবল ছিল। অপরের দুঃখ দেখিলে, কাহারও মুখ কোন কারণে বিষণ্ণ দেখিলে, দীনেশরঞ্জনের সেই সুবিশাল আয়ত নেত্র সহজেই অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিত। ঢাকা বিধান পল্লীর নিকটে একটী দুঃখী বৃদ্ধ মুসলমান ভিখারী বাস করিত। বালক দীনেশ সময় ও সুবিধা পাইলেই তাহার কাছে ছুটিয়া যাইতেন। এবং ব্যথিত অন্তরে তাহার দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিতেন। তিনি অগ্রজের ন্যায় আমাকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং অনেক সময় প্রাণের কথা সরল ভাবে আমার কাছে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। ১৮৮৮ শালে যখন আমি বিধানপল্লীস্থ ভক্তিভাজন পিতৃস্থানীয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে বাস করিতাম, তখন নানা কারণে আমার মুখ প্রায়ই বিষণ্ণ থাকিত। সেই বিষণ্ণতা আর কাহারো প্রাণে লাগুক আর নাই লাগুক সর্ব্বাগ্রে দীনেশ রঞ্জনের প্রাণে লাগিয়াছিল। কয়েকদিন আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন প্রদোষ সময়ে বালক দীনেশ আমার বিষণ্ণ-তার কারণ জানিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন। ছোট ভাই বড় ভাইকে যেমন অনুরোধ করে, তেমনি ভাবে অনুরোধ করিয়া বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বালকের সরলতায় যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ হইলাম। আমার প্রাণের ভিতর

যে যন্ত্রণা ছিল, তাহা তাহার ন্যায় অল্প বয়স্ক বালকের নিকট অবোধ্য ছিল। তথাপি তাহাকে আমি সরল ভাবে দুই একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারি নাই। সেই "দুই একটা" কথাতেই যেন বালক আমার সকল দুঃখের ইতিহাস বুঝিয়া লইলেন এবং ব্যথার ব্যথীর ন্যায় কত সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। সেই ঘটনার পর প্রায় দশ বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা আজও আমার প্রাণে উজ্জ্বলরূপে জাগরূক রহিয়াছে।

লোকে বলে দীনেশরঞ্জন ইহলোকে নাই। কিন্তু কেন জানি আমার প্রাণ তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে চায় না। আমার মনে হয় সেই দেবশিশু যেন এখনো আমাদের কাছে কাছেই রহিয়াছেন। তাঁহার জীবনকাহিনী প্রচারিত হইতেছে শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আশা করি, এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক বালক যুবক, এমন কি বয়স্ক ব্যক্তিগণও কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপকৃত হইবেন। ইতি

দীন

(স্বা) শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দাস।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেনের ইংরাজী চিঠির সার এই ;—

পরিত্রাণের জন্য প্রিয় দীনেশের ব্যাকুলতা ছিল। আমি যখন তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়াছি, তখনই তাঁহার পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়াছি। ভায়া বিমলানন্দের কথায় একবার তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, খৃষ্টসম্বন্ধে নববিধানের মতই ঠিক এবং মানবপরিত্রাণের জন্য ভগবান যাহা করিয়াছেন তাহার উপযোগী।

শ্রীমান্ পরেশরঞ্জন রায় এইরূপ ভাব ব্যক্ত করেন ;—

* * ভুতুর চরিত্র বড় নির্ম্মল ছিল, বড় পবিত্র ছিল। নির্ম্মল পবিত্র জিনিস্ মায়ের বড় আদরের সামগ্রী। তাই মা তাঁহার এই আদরের জিনিস্‌টিকে তাঁহার কোলে তুলিয়া লইলেন। নীরবে প্রাণে প্রাণে সে মাকে বড় ভালবাসিত। অনেকে তাহা জানিত না—অনেকে তাহা টের পাইত না। আমি তাহা টের পাইয়াছিলাম। সে বাহ্যাড়ম্বর প্রিয় ছিল না। মনে মনে যাহা করিত বাহিরে কখনও তাহা প্রকাশ পাইতে দিত না। তাই মায়ের প্রতি তাহার যে কত ভালবাসা ছিল বাহিরে আপাতদৃষ্টিতে কেহ তাহা টের পাইত না। আমি একদিনের একটি কথায় ইহা

স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। গত বৎসর কুমিল্লার ঘাটে নৌকায় একদিন তাহার অত্যন্ত মাথা ব্যথা হয়। আমি তাহার মাথায় Lavender water দিতে ছিলাম। সে চুপে চুপে আমাকে বলিয়াছিল "মেজ দাদা, যে ভয়ানক মাথা ব্যথা হইয়াছে Lavenderএ তাহার কি করিতে পারে? মায়ের হাত ছাড়া আর ঔষধ নাই। তাই চুপ করিয়া আছি।" যথার্থই সে মায়ের মুখ পানে চাহিয়া সকল সময়ই চুপ করিয়া থাকিত। তাই এ ভয়ানক রোগ যন্ত্রণার মধ্যে কেহ কখন তাহাকে অস্থির ও চঞ্চল হইতে দেখে নাই। তার সেই পুণ্যবলে আজ সে আমাদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া, আমাদের পশ্চাতে ফেলিয়া তাহার মায়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। মায়ের কোলে তাহার অমরাত্মা চির সুখ শান্তিতে বাস করুক। তাহার হতভাগা ভাইয়ের এই প্রার্থনা।

তাহার সুপবিত্র জীবনের কথা লিখিব কি? সে সুগন্ধি ফুলের মত সংসার বনের এক কোণে ফুটিয়া নীরবে ফুলের ন্যায় সৌরভ বিস্তার করিয়া চলিয়া গেল। সে যাহার কাছে গিয়াছে সেই-সেই সৌরভে মুগ্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমি একজন। তাই আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। মা আমায় কৃপা করিয়া এই বল বিধান করুন। আমি যেন নীরবে তেমনি করিয়া তাহাকে আমার জীবনের সমক্ষে ধরিয়া, তাহার মত মাকে

ভালবাসিয়া অন্তে মায়েরই কোলে তাহার সনে পুনর্মিলিত হইতে পারি।

তাহার জীবনখানা ভালবাসার প্রতিমূর্ত্তি ছিল। যাহার সহিত তাহার আলাপ হইত তাহারই প্রতি তাহার ভালবাসার সঞ্চার হইত। আমাদের পাড়ার ছেলে মেয়ে সকলেই ইহার সাক্ষী। ছোট শিশু প্রশান্ত ভাল করিয়া কথাও বলিতে পারে না, সেও ভুতুর প্রতি সুমিষ্ট ভালবাসা প্রকাশ করিত। তিন মাস মাত্র সে কলেজে পড়িয়াছিল। কিন্তু প্রফেসারদের মধ্যে কে যে তাহাকে চিনিতেন না, তাহা জানি না। গত বৎসর একদিন তাহার সঙ্গে কলেজে গিয়াছিলাম.দেখি, সকল Professorই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—আ! তোমার চেহারা এমন হইয়া গিয়াছে! ভগবান তোমাকে শীঘ্র আরোগ্য দান করুন এই প্রার্থনা। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি এ সংবাদে ঢাকার অনেকেই কাঁদিবে।

এ পৃথিবীতে সে সকল থেকে বেশী ভালবাসিত বাবাকে। বাবার প্রতি তার যেরূপ ভালবাসা ছিল তেমন করিয়া কেহই বুঝি বাবাকে ভালবাসিতে পারে না। তাহার মুখে ভয়ানক অরুচি হইয়াছিল। কিছুই খাইতে ভাল বাসিত না, কিছু খাইতে চাহিত না। এমন কি যদি তাহার খাবার ভার তাহার নিজের উপর থাকিত, তবে সে ইহার আরো অনেক আগেই এ পৃথিবী

হইতে বিদায় লইত। এত অরুচির মধ্যেও সে কেবল বাবার প্রতি চাহিয়া, তাঁহার সন্তোষের জন্য, নিয়মিত রূপে তিনি যাহা খাইতে বলিতেন তাহাই খাইত। সে বাবাকে এত ভাল বাসিত যে তাঁহার প্রতি আমাদের কোন অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া কত সময়ে নীরবে কাঁদিয়াছে। হায়! যদি জানিতাম সে আমাদের ছাড়িয়া এত শীঘ্র পলাইবে, তাহা হইলে কি কথন তাহার মনে এত কষ্ট দিতাম!

বাবার প্রতি এত ভালবাসা হইতেই সে যীশুকে বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিত। যীশুকে ভালবাসিয়াই সে আবার ক্রমে ক্রমে মায়ের প্রতি অত্যন্ত ভালবাসার টানে আবদ্ধ হইতেছিল। সে এক দিন বলিয়াছিল, যীশু যেমন পিতার ইচ্ছার জন্য পিতাকে ভাল বাসিতেন, সেই রকম মা চান বলিয়া মাকে না ভালবাসিলে জীবনের কিছুই হইবে না। যীশু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া জীবনের সার জানিতেন, যিনি কেবল পিতাকে পৃথিবীতে পরিচিত করিবার জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, পৃথিবীর মানুষ আজ তাঁহাকেই পিতার আসন প্রদান করে ইহাতে তাহার কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। সে কিছুদিন মরিস্ সাহেবের কাছে Bible পড়িতে যাইত। কিছুদিন পরে হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলে "তাঁরা ঈশ্বরকে অপমান করিতে শিখিয়াছেন, বলেন

যীশুকে পরিত্রাণের ভার দিয়া ঈশ্বর পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে তোমরা পবিত্রাত্মা বলিয়া গ্রহণ কর। কেন আমাদের ঈশ্বর কি আর কাজ করিতে পারেন না, যে অপরের হাতে কার্য্যভার প্রদান করিবেন? তাই আর যাইতে ইচ্ছা হয় না।” তাহার খ্রীষ্টীয় বন্ধুদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে কেহ যদি পৌত্তলিকদের নিন্দা করিতেন, তখন সে বড় জোরের সহিত বলিত, আগে নিজেদের সাম্‌লাও পরে উহাদের নিন্দা করিও। তোমরাই পৌত্তলিকদিগহইতে কম কিসে? এমনি ভাবে একথা বলিত যে তাঁহারা আর কিছু উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন, অথচ তাহার উপর অসন্তুষ্টও হইতেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময় সুন্দর জ্যোৎস্নায় বসিয়া ঢাকার নদী-পারের সেই বড় বাড়ীটার নদীর দিকের খোলা ছাদে বসিয়া উর্দ্ধমুখে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে “তোমারে প্রাণের আশা কহিব”, এই গানটী গাইতেছিল। আমি তাহার পাশের দিকে একটা ভাঙ্গা দরজার উপর বসিয়া তাহার সেই ব্যাকুলতাপূর্ণ ভাব দেখিয়া অবাক্ ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। একদৃষ্টে চাঁদের দিকে চাহিয়া ব্যাকুলভাবে বার বার কেবল গাইতেছিল—“শেষ হয়ে গেলে তুলে নিও কোলে, বিরাম কোথা আর পাইব?” শুনিতে শুনিতে অবিরল ধারায় আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমিও অনেক দিন অনেক বার ঐ গানটী গাহিয়াছি

কিন্তু এমন ব্যাকুল ভাব কখন আমার হয় নাই। তখনই বুঝিতে পারিলাম, মায়ের কোলে চলিয়া যাইবার জন্য তাহার কত ব্যাকুলতা! আহা! তাহার সেই ব্যাকুলতাপূর্ণ গান যেন এখনও আমার কাণে বাজিতেছে।

শ্রীমানের দ্বিতীয় পত্র হইতে নিম্ন ভাগটুকু উদ্ধৃত করিলাম ;—

একবার (বোধ হয় ১৮৮৮ কি ৮৯ সনে অর্থাৎ যখন Messrs St. Dolmas, Lorraine প্রভৃতি ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে ছিলেন তখন) যখন আমরা সকলে ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে গিয়াছিলাম, তখন ভুতু Lorraine সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া বিমলবাবুর এক খানা চিঠি তাঁহাকে দিয়াছিল। সেই চিঠি পড়িয়া Lorraine সাহেব খুব আদরের সহিত ভুতুকে গ্রহণ করিয়া অনেকক্ষণ ভুতুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখী হইয়াছিলেন। সমস্ত কথাবার্ত্তা আমার মনে নাই, কেবল ভাবটুকু মাত্র মনে আছে তাহা এই—"ঈশ্বর আমাদের পিতা, আমরা তাঁহার সন্তান। সন্তানের কর্ত্তব্য পিতার বাধ্য হওয়া। ঈশ্বর পিতা হইয়া সর্ব্বদা আমাদেরে সঙ্গে রাখিয়া সৎকার্য্য করিতে বলিতেছেন। এই কথা অনুসরণ করিয়া চলিলেই তাঁহার বাধ্য হওয়া হয়। কিন্তু

সাধারণ মানুষ নিজের দোষেই সেই কথা শুনিতে না পাইয়া তাঁহার অবাধ্য হয়। একবার যখন এইরূপে সে তাঁহার অবাধ্য হইতে আরম্ভ করে, তখন আর সে সেই কথার অনুসরণ করিতে পারে না; ক্রমে ক্রমে আরো অবাধ্য হইতে থাকে। আমিও এইরূপে যখন ক্রমে ক্রমে পিতার অবাধ্য হইতেছিলাম তখন সৌভাগ্যক্রমে যীশুর সহিত আমার পরিচয় হয়; তাঁহার বাধ্যতা দেখিয়া আমিও কেন বাধ্য সন্তান হইতে পারিবনা এই কথা আমার মনে হয়। সেই অবধি আমি অনেক বিষয়ে পিতার কথা শুনিতে চেষ্টা করি এবং শুনিলে সেই রকম চলিতেও চেষ্টা করি। এইরূপে আমি দেখিতেছি আমার জীবন অনেকটা ভালর দিকে চলিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি যে যীশু এ বিষয়ে আমার পথপ্রদর্শক। তিনিই যেন আমাকে অবাধ্যতা ও নানা প্রকার অন্যায় কার্য্য হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমার সহায়তা করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই জন্যই বুঝি তোমরা তাঁহাকে তোমাদের পরিত্রাতা বলিয়া মান।" অনেক্ষণ পর্য্যন্ত Lorraine এর সঙ্গে ভুতুর এ বিষয়ে নানা প্রকার আলাপ হইয়াছিল ইহা হইতেই বিশ্বাস হইয়াছিল যে ভুতু বুঝি ভাল খ্রীষ্টান হইবে। সে যে অন্তরে অন্তরে প্রকৃত খ্রীষ্টান হইয়াছিল Lorraine তাহার কিছুই বোধ হয় বুঝিতে

পারে নাই। কারণ কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেলে Lorraine সাহেব Christ এর কাছে ভুতুর ও আমার জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিল। ভুতু সেখান হইতে বাড়ী আসিবার সময় আমাকে বলিয়াছিল "আমরা যেমন Christ কে চিনি, বুঝি ও গ্রহণ করি, ইহারা Christian হইয়াও সে রকম পারেনা।"

শ্রীমতী বিনোদমনির পত্রে এইরূপ লিখা আছে ;—

শ্রীমান্ দীনেশের জীবনের কথা আমি যাহা জানি তাহা লিখিয়া দিতে আপনি আমাকে লিখিয়াছেন। তাহার সুন্দর পবিত্র জীবনের কথা আমি আর কি লিখিব, বাবা ?

তবে তাহার চরিত্রের মধ্যে আমার নিকট যাহা বড় ভাল লাগিত, বড় সুন্দর,বড় পবিত্র লাগিত তাহা লিখিতেছি।

তাহার পবিত্র জীবনে আমি রাগ কখনও দেখি নাই, বিশেষ এই অসুখের সময় যখন আপনি সময় সময় তাহাকে মন্দ বলিয়াছেন তখনও সে হাসিমুখে সব সহ্য করিয়াছে। কখনও রাগ হয় নাই। ধৈর্য্যের একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত তাহার জীবনে দেখিয়াছি। এমন যে আর কখনও দেখিব তাহা মনে হয় না। একদিন অসুখের সময় তাহার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভুতু বড় কষ্ট হইতেছে ? সে তখনই একটী

সুন্দর হাসি দিয়া বলিল, দিদি আমার আর কি কষ্ট! অন্ধ আতুর কুষ্ঠ রোগীদের যে ভয়ানক কষ্ট তাহার নিকট ত আমার এই কষ্ট কিছুই নয়। ধর্ম্মভাব যে লুক্কায়িত ভাবে তাহার জীবনে কাজ করিতেছিল এবং তাহাকে উন্নত করিতেছিল তাহা আমি দুই তিন দিন বড় সুন্দর দেখিয়াছি। এই অসুখের সময় মাঝে মাঝে দেখিতাম সে সন্ধ্যার সময় অন্ধকার ঘরটীতে দুই হাত জোড় করিয়া ব্যাকুলতার সহিত সঙ্গীত করিত; তাহা দেখিয়া মনে হইত যেন ভগবানের সহিত তাহার আত্মার মিলন হইয়াছে, এবং সঙ্গীত দ্বারা তাঁহার সহিত মন খুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে। ভালবাসা তাহার হৃদয়ের ভূষণ ছিল, যাহাকে দেখিত এবং যে তাহাকে দেখিত কেহই ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। পরের উপকার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিত। আমাকে এক-দিন বলিয়াছিল যে, ভগবান যদি দিন দেন, আমাকে সুস্থ করেন তবে পরের সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব। তাহার সে আকাঙ্ক্ষা আর ইহসংসারে পূর্ণ হইল না। আমি আশা করি তাহার পবিত্র আত্মা সকলের সেবা করিয়া ধন্য হইবে। আমি যদিও পূর্ব্বে তাহার জীবনের বিশেষ কোনও ঘটনা অত নিরীক্ষণ করিয়া দেখি নাই, কিন্তু শেষটা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে কেন জানি মনে হইত, এত গুলি সদ্‌গুণ যাহার আছে সেকি কখনও বাঁচিবে? পিতার প্রতি যে কি

চমৎকার ভক্তি তাহার ছিল তাহা আমি ক্ষুদ্র লিখনীতে লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাকে দেখাইয়া গিয়াছে। এত যে কষ্ট পাইয়াছে তবুও মুখ ফুটিয়া একবার বলে নাই যে কষ্ট পাইতেছে। পাছে বাবা শুনেন, পাছে বাবার মনে কষ্ট হয়। খাওয়া সম্বন্ধেও যে ঠিক এই রকম দেখিয়াছি, "বাবার মনে পাছে কষ্ট হয় তাই দিদি এইগুলি খাই," প্রত্যেক কথাতেই দীনেশ এইরূপ কথা বলিত।

ঢাকাস্থ নববিধান সমাজের শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়গণ হইতে নিম্নলিখিত চিঠি পাইয়াছি ;—

শ্রীমান্ দীনেশের চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ আমি অবগত নহি। কারণ কোন সময়েই অধিক কাল তাহার সঙ্গে একত্র বাস করি নাই। মাঝে মাঝে যখন দেখিয়াছি তাহার চরিত্রের লাবণ্যে তাহাকে ভাল বাসিতে বাধ্য হইয়াছি। তাহার স্বভাবের মধ্যে এইটী অনুভব করিয়াছি,—ভালবস্তুর প্রতি তাহার একটী আকর্ষণ ছিল। কেবল তাহা নয়,ভাল বিষয়ের প্রতিও তাহার মনের টান ছিল। এক সময়ের ঘটনা এখনও স্মরণ আছে। উৎসবাদিতে দীনেশ যখন স্বহস্ত লিখিত রচনা প্রকাশ্য সভাতে পাঠ করিত, তখনই আমার মনে এই ইচ্ছা হইত যে এই রচনাটী

কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কাগজে প্রকাশিত হয়। ইহাতে দীনেশের সমবয়স্ক ছেলেদের বিশেষ উপকার হইবে। যে বৎসর দীনেশ রোগে আক্রান্ত হয় তাহারই একটু পূর্ব্বে ভাদ্র মাসে ঢাকা সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ছেলেদের উৎসবের দিন প্রাতঃকালীন উপাসনার ভার আমার উপর ছিল। উপাসনান্তে ছেলেদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে বিষয় উপদেশ হইয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে দীনেশ সেই বিষয় বিশেষ ভাবে বুঝিবার জন্য সভার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিল। এবার শেষ অবস্থায় ও যখন চুনারে একত্র ছিলাম, তখন তিন বৎসর পূর্ব্বে যে যে ভাল বিষয় তাহার মনে লাগিয়াছিল পুনরায় আমাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করে। আমি উহাতে খুব আশ্চর্য্য বোধ করিলাম।

বিষয়টী এই :—মানুষের আত্মা কোনরূপ শস্যবীজের ন্যায়। যেরূপ ভূমিতে সেই বীজ রোপণ করা যায়, সেইরূপ ফল প্রসব করে। অর্থাৎ সংসারে মানবাত্মা প্রবেশ করিলে, কাম ক্রোধ অহংকার স্বার্থ ইত্যাদি ফল প্রকাশ পাইয়া থাকে, আর ব্রহ্মভূমিতে মানবাত্মা রোপিত হইলে বিশ্বাস, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এবার পুনরায় আমাকে দীনেশ এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে আমার মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে বাহিরে কিছু প্রকাশ না পাইলেও ভাল বিষয়ে তাহার আকর্ষণ

ছিল; ভাল বিষয় স্মরণ রাখা মনুষ্যের একটী শুভ লক্ষণ।

দীনেশের সঙ্গে এবার কয়েকমাস একত্র বাস করিয়া অনেক বিষয়ে উপকৃত হইয়াছি। ইহাতে আনন্দের সহিত বলিতে পারি, তাঁহার জীবনে বিশেষ কিছু উচ্চ ভাব ছিল। এক সময় তাঁর নিজ হাতের বাঁধা একখানা ডায়েরি তাঁহারই নিকট দেখিয়া আমি বলিয়াছিলাম তুমি এই ছোট বই দিয়া কি করিবে? দীনেশ আমাকে বলিলেন, আপনার দরকার হইলে আপনি নিতে পারেন। সে অবস্থায় উভয়েই লজ্জিত হইলাম। মাঝে মাঝে যাহা দেখিয়াছি তাহা তাহার ভাল দিক্। মানুষের যে মন্দ দিক্ থাকে তাহা আমার চক্ষে পড়ে নাই। এ সব দেখিয়া আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করি, স্নেহের দীনেশ স্বর্গবাসীদের সঙ্গে একত্র হইয়া শান্তি লাভ করিতেছেন। ইহাও বিশ্বাস করি, একদিন তাঁহার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইতে পারিব। নববিধানের শ্রীহরি আমাদের সহায় হউন এই প্রার্থনা করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

(স্বা) শ্রীদী[illegible]নাথ।

শ্রীমানের সম্বন্ধে আমার চিত্তে অতি উচ্চভাব মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার বিনীত ও শান্ত স্বভাব আমি সর্ব্বদা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। তিনি নিতান্ত অনুগত ছিলেন, কোন বিষয়ে তাঁহার

অবাধ্যতা প্রকাশ পায় নাই। আমাদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে কোন দিন উচ্চ কথা শুনিতে পাই নাই। যখনই দেখা হইয়াছে, খুব বিনীত ভাবে আলাপ প্রসঙ্গ করিয়াছেন। স্বাভাবিক বিনীত ও নম্র ব্যবহার সর্ব্বদাই দেখিয়াছি ইহাই তাঁহার জীবনের বিশেষ ভূষণ।

(স্বা) শ্রীচন্দ্রমোহন কর্ম্মকার।

শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের চরিত্রে আমি দুইটী বিষয় বিশেষ শিক্ষণীয় বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথমটী তাহার দীনতা। প্রথমতঃ যখন তাহার দীনভাব আমার অন্তরকে স্পর্শ করে তখন অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিলাম যে, শ্রীমান্‌কে যে দীনেশরঞ্জন নামটী প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা অনেক পরিমাণে তাহার চরিত্রে সার্থক দেখা যায়। শ্রীমান্ একটী সুশিক্ষিত সম্মানিত ও ভাল অবস্থাপন্ন পিতার পুত্র; এই ভাব তাহার অন্তরে যে নিদ্রিতাবস্থাপন্ন ছিল তাহা নহে। অথচ ইহা লইয়া অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকগণ যেরূপ অহঙ্কারী ও অভিমানী হইয়া থাকে শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের সেরূপ ভাব কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। বরং পিতা সুশিক্ষিত উচ্চ পদাভিষিক্ত ও বহু লোকের মান্যাস্পদ হইলেও পুত্রগণ শিক্ষা ও চরিত্র দ্বারা যাবৎ না আপনাদের উপযুক্ততা প্রদর্শন করিতে

পারেন, তাবৎ তাঁহাদের যেরূপ বিনীত ও দীন ভাবাপন্ন থাকা আবশ্যক, তাহার অন্তরে এই ভাবই পরিস্ফুট দেখা গিয়াছে।

দ্বিতীয়টী শ্রীমানের ধৈর্য্য। ইংরেজী ভাষাতে পীড়িত ব্যক্তিকে Patient অথবা ধীর বলা হয়। কিন্তু উৎকট পীড়া হইলে অথবা বহুদিন রুগ্ন থাকিলে মানুষ সচবাচর ক্ষণরাগী ও নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠে। রোগীর মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকে বলিয়া তাহার নিকট কিছুই ভাল লাগে না। শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের মধ্যে এই-রূপ অস্থিরতা প্রায় দেখা যায় নাই। শ্রীমান্ প্রায় আড়াই বৎসর সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় পীড়িত ছিল, ইহার মধ্যে আমি যখন যখন তাহার নিকটে অবস্থিতি করিয়াছি, কোন সময়ে রোগ জন্য তাহাকে উদ্বিগ্ন দেখি নাই। ফলতঃ রোগের অবস্থায় শ্রীমান্ দীনেশরঞ্জনের ন্যায় অ[illegible] আর কাহাকেও patient অথবা স্থির ধীর দেখি নাই। শ্রীমান্ প্রথমবারে আরাতে অব-স্থিতি কালে তাহার সঙ্গে এক গৃহে প্রায় একমাস কাল অবস্থিতি করি, তৎপর তথা হইতে একত্র কলিকাতাতে আসি এবং শ্রীমান্ ঢাকাতে অবস্থিতি কালেও অনেক সময় তাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়াছি; কিন্তু কোন সময়েই তাহাকে রোগ জন্য অথবা অন্য কারণে বিশেষ উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইতে দেখি নাই।

(স্বা) মহিমচন্দ্র সেন।

স্বর্গারোহণ

অর্থাৎ

কুমারদেব-শ্রীমান্ দীনেশ-চরিত।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা ;
এ সমূদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।"

ব্রঃ—সঃ—২০০ সং।

কলিকাতা।

কলিকাতা

২৬ নং স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানির দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমান্ দীনেশ যখন নিতান্ত শিশু ছিলেন তখনই তাঁহার দীনতা ও বৈরাগ্যের ভাব আমার অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার বাল্যরূপটী আমার বড় প্রিয় ছিল। বিশ্বাসী ধ্রুবের সম্বন্ধে আমার মনে যে ছবিটী উপস্থিত হয়, শ্রীমান্ দীনেশের মূর্ত্তিতে তাহার সাদৃশ্য দেখিয়াছি। দীনেশের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে প্রীতির ভাবটী বেশ বিকাশ পাইতেছিল। তিনি নববিধানের আশ্রিত পরিবার গুলিকে আপনার মনে করিতেন। অনেক ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমার দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণের পূর্ব্বে আমরা তাহার এনাম সেনাম রাখিবার কল্পনা করিতেছিলাম। শ্রীমান্ দীনেশ অযাচিত রূপে আসিয়া বলিলেন, উহার নাম রাখুন "প্রশান্ত কুমার।" শ্রীমান্ দীনেশের এই প্রস্তাব আমাদের সকলের সন্তোষজনক হইল। আমরা অমনি বলিলাম আচ্ছা বেশ হইয়াছে, এই নাম রাখাই ঠিক। শ্রীমান্ দীনেশের প্রীতিপূর্ণ হৃদয় হইতেই এই ধ্রুব বাক্য আসিয়াছিল।

(স্বা) শ্রীদুর্গানাথ রায়।

সকল কার্য্যে, সকল বিষয়ে দীনেশরঞ্জন সুরুচি ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছে। তাহার শয্যা, অধ্যয়নস্থান, গ্রন্থরক্ষা, বেশভূষা ও ব্যবহার্য্য বস্তু সকল যথা নির্দ্দিষ্টরূপে রক্ষা করার মধ্যে সর্ব্বদাই শৃঙ্খলা ও উৎকৃষ্ট রুচি প্রকাশ পাইত।

দীনেশ কখন কঠোর কর্কশ ভাষা বা ভাব প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এজন্য সুকুমারমতি মধুর প্রকৃতি বালক বালিকারা তাহাকে ভালবাসিত।

স্বীয় পিতার প্রতি তাহাকে কখন বিন্দুমাত্র অনুরাগ বা ভক্তি-হীন দেখা যায় নাই। পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ও তাঁহার সেবায় বা বাক্যপালনে ও সুখ-সংবর্দ্ধনে দীনেশ অতি যত্নবান ছিল। রোগের সময়েও পিতার বা অসন্তোষ ঘটে এজন্য ইচ্ছা সত্বেও ঔষধ পথ্যে কখন দীনেশ পিতৃ ইচ্ছা অতিক্রম করে নাই। দীনেশ যেরূপ দীর্ঘকাল উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া রোগ-প্রভাবে জীর্ণ-শীর্ণ ও শক্তিহীন হইয়াছিল, বারম্বার তাহার যেরূপ ক্ষুধামান্দ্য ও অরুচি উপস্থিত হইয়াছে, যদি ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা তাহার চরিত্রের প্রধান উপাদান না হইত, তবে নিশ্চয়ই সে অতি উত্ত্যক্ত স্বভাব এবং ক্ষণরাগী হইয়া পড়িত। কিন্তু কোন বন্ধুবান্ধব, কোন চিকিৎসক, কোন সেবাকারী বন্ধু তাহাকে পীড়িতাবস্থায় কখন সেরূপ বিকৃত ভাব প্রকাশ করিতে দেখেন নাই। বরং সকলের নিকট কোমল মধুর ভাবে সকল বিষয়ে মনের ভাব শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াছে। এমন একটী যুবকের এরূপ উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় এরূপ ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা কি আশ্চর্য্যজনক নহে? (স্বা) শ্রীঈশানচন্দ্র সেন।

শ্রীমান্ এক দিবস কোন একটী বালিকার সহিত অশিষ্টজনোচিত ব্যবহার করিয়া বড় অনুতপ্ত হন। পরে কোন শ্রদ্ধেয় প্রচারক নিকট গমন করেন। প্রচারক মহাশয় সে বিষয়টী সম্বন্ধে এইরূপ লিখেন ;—

"একদিবস অপরাহ্ণে আমি বসিয়া আছি এমন সময় শ্রীমান্ সভয়ে আমার নিকটে আসিয়া কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমি কি হইয়াছে, কেন আসিয়াছ, বার বার জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'আমি বড় অন্যায় করিয়াছি।' আমি বলিলাম 'কি করিয়াছ?' তাহাতে কোন উত্তর না করিয়া তেমনি ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন আমি বলিলাম, 'তুমি মুখে বলিতে না পারিলে, কাগজে লিখিয়া দেও।' তৎপর কাগজ পেন্‌শিল লইয়া লিখিয়া দিলেন এবং বলিলেনঃ—

'আমি এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়া বড় অপরাধ করিয়াছি; আমাকে যেরূপ দণ্ড দিতে হয়, দিন।' আমি তৎপর শ্রীমান্‌কে লইয়া মন্দিরে যাই ও উভয়ে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি।"

But I generally knew him well-behaved meek gentle and conscientious.

(Sd) Sasi Bhusan Mallik.

The only thing I noticed all along was his good temper and affectionate tenderness.

(Sd) Banga Chandra Roy.

সমাপ্ত।